চলচ্চিত্রের ঘর বাহির

সোমেন ঘোষ

প্রতিভাস
কলিকাতা-৭০০০০২

"So oft have I invok'd thee for my muse,
And found such fair assistance in my verse,
As very alien pen hath got my use,
And under thee their poesy disperse.
Thine eyes, that taught the dumb on high to sing,
And heavy ignorance aloft to fly,
Have added feathers to the learned's wing,
And given grace a double majesty.
Yet be most proud of that which I compile,
Whose influence is thine, and born of thee :
In other works thou dost but mend the style,
And art with thy sweet grace graced be ;
But thou art all my art, and dost advance,
As high as learning my rude ignorance."

—Willium Shakespeare-
Sonnet—LXXVIII

যাঁর অনন্ত স্নেহ আর আবহমান অনুপ্রেরণায় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রথম
আলো দেখেছিলাম, আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় পিতা স্বর্গত
পান্নালাল ঘোষকে

"এদিকে তাকালে পরে, খুঁজে পাবে বাণীর নিভৃতে
আমার তন্মাত্র তুমি, করেছি যা উৎসর্গ তোমারে :
ধূলিই ধূলির প্রাপ্য, তাই শুধু মিলিবে ধূলিতে ;
আমার একান্ত আত্মা গচ্ছিত তোমার অধিকারে।"

অবিনাশ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দু' চার কথা

বর্তমান' গ্রন্থের প্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা আজকের নয়, বহুদিনের। প্রায় একযুগ আগেই বইটা বের করার একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন স্বয়ং আমার বাবা। নানা অসুবিধায় সে সময়ে কাজটা হ'য়ে ওঠেনি। তার পরেও কয়েকজন সক্রিয় কৌতূহল দেখিয়েছিলেন, কিন্তু জানিনা কোন্ অজ্ঞাত কারণে তাঁরা সময়মতো অন্তর্হিত হলেন। অবশেষে তরুণ বন্ধুস্থানীয় শ্রীবীজেশ সাহা বইটা প্রকাশের একান্ত উৎসাহ দেখালে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তাঁর রুচিশীল অভিপ্রায়ের জন্যই শেষ পর্যন্ত বইটা বেরুল। প্রসঙ্গতঃ একজনের নাম উল্লেখ না করলে বিবেকবোধে পীড়িত হব। আমার অনুজপ্রতিম, বন্ধু, শিল্পরসিক, চলচ্চিত্র সমালোচক ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও নিগূঢ় ভালোবাসা না পেলে হয়তো বইটা বর্তমান চেহারাই নিত না। প্রুফ দেখবার ব্যাপারেও তাঁর সাহায্য ও অসীম ধৈর্য স্মরণ করি। এই বইয়ের আলোকচিত্রগুলি তাঁরই সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গত কয়েক বছর বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র বিষয়ে বেশ কয়েকটা বই বেরিয়েছে। কিন্তু কোনো গ্রন্থেই সিনেমার শিল্পশরীর এবং তত্ত্বগত ধারাবাহিক আলোচনা তেমন চোখে পড়েনি। সেদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থ

সম্ভবতঃ কিছুটা ব্যতিক্রমও বটে। গ্রন্থে মোট তিরিশটা প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কোনো স্পষ্ট পর্বে বিভক্ত না হলেও রসিক ও বিদগ্ধ পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন যে চরিত্রগত দিক থেকে বইটিতে দুটি বিভাগ প্রতীয়মান। প্রথম ষোলাটি প্রবন্ধে মূলতঃ চলচ্চিত্রের শিল্প কাঠামোর প্রকরণগত আলোচনা স্থান পেয়েছে। আর সিনেমার শিল্প শরীরকে ঘিরে যে সব তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদ গ'ড়ে উঠেছে, তার ঐতিহাসিক আলোচনায় বাকী প্রবন্ধগুলি নিয়োজিত। সব লেখাতেই মোটামুটি ঐতিহাসিক কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। তবু অনবধানবশতঃ কিছু কালানৌচিত্ত দোষ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সচেতন থাকা সত্ত্বেও হয়তো কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকেই গেল। সহিষ্ণু পাঠকের ক্ষমার ওপর নির্ভরশীল রইলাম।

প্রবন্ধগুলি গত বিশ বছরের ব্যবধানে নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে তাই প্রয়োজনবোধে একটু আধটু পরিমার্জনা করেছি। এক অসীম ভালোলাগার টানে সিনেমার প্রতি কৈশোর থেকে যে প্রবল প্রেম জন্মেছিল, সেই অনুভূতি প্রকাশের তাগিদেই নিবন্ধগুলি লিখেছিলাম। মনন ও আবেগের যুগ্ম মিলনে লেখাগুলি কতোটা সার্থক হয়েছে, সে বিচার প্রকৃত রসিক হৃদয়বান পাঠকের ওপর ছেড়ে দিলাম।

সোমেন ঘোষ

কলকাতা

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

সিনেমার ভাষা ও শিল্পতত্ত্ব

[এই রচনাটিকে সিনেমার ভাষা ও শিল্পতত্ত্বের ভূমিকা বলাই ঠিক হোতো। বলা যায়, প্রবন্ধটিতে সাধারণ পাঠকের কাছে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যের সাহায্যে খানিকটা তত্ত্বের কথা বলা গেল। তবু ভাষা শব্দটি নিয়ে রচনার নামকরণ করা হয়েছে এইজন্য যে সিনেমার তত্ত্ব প্রসঙ্গে ভাষার আলোচনা কখনোই বাদ যেতে পারে না। সিনেমার শিল্প স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ভাষার আলোচনা অনিবার্য।]

একালের কলাসমালোচকরা, যাঁরা সিনেমার শিল্প স্বকীয়তা সম্পর্কে দর্শক সাধারণের মূঢ়তার প্রতি রুষ্ট এবং সময়ে সময়ে উদাসীন করুণা প্রকাশ ক'রে থাকেন, তাঁদের দুঃখবোধের কোনো কারণ নেই। কারণ একালের মনস্বী নাট্যকার বার্ণাড শ' যিনি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কাল কাটিয়ে গেছেন তিনিও চলচ্চিত্র বুঝতেন না। বৈদগ্ধ্য যাঁর কলমের গোড়ায়, যিনি আধুনিক ও পুরা-কালের ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যখন তখন অতুলনীয় ব্যাখ্যা দিতে পারতেন, তিনিও বিশ শতকের কাল সীমায় প্রকাশিত এই সিনেমার নাড়ি টিপে এর শিল্পতত্ত্ব পুরোপুরি বোঝেন নি। আসলে চলচ্চিত্রের নন্দনবিদরা সিনেমার নিজস্ব ভাষার যে বিস্তৃত সম্ভাব্যতার সন্ধান পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে শ' সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। হয়তো এ'কথায় অনেক মননশীল ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হবেন, কিন্তু কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তার বহু প্রমাণ রয়ে গেছে। অথচ একটা আশ্চর্য ব্যাপার স্মরণীয় যে আইজেনস্টাইনের বিশ্ববিশ্রুত ছবি Battleship Potemkin যখন বাজেয়াপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল তখন তিনি নির্মম সমালোচনায় সরকারকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব করেছিলেন। মনে হয় তিনি সিনেম্যাটিক কোনো কারণে এটা করেন নি। আসলে ছবিটার অন্তর্নিহিত স্পিরিটই তাঁকে ছবিটার শিল্পত্ব ঘোষণায় সোচ্চার করেছিল। এই উক্তির স্বপক্ষে একটা ঘটনা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। তাতেই বোঝা যাবে যে' শ সিনেমার ব্যাকরণ বুঝতে চেষ্টা করেননি বলেই নানা সময়ে অনেক পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেছেন। ১৯৩৭ সালে একটি সাক্ষাৎকারে একজন শ' কে প্রশ্ন করেছিলেন :

"Do you suggest that the screen has not a dramatic technique of its own, differing from that of the stage ?" শ' তার উত্তরে বলেছিলেন : "I don't suggest. I tell you flatly and violently that there is not difference whatever. The dramatic techinque is precisely the same."১ আসলে তিনি মনে করতেন যে মঞ্চের ওপর নাটকীয় কাহিনীর যে গতিবেগ রক্ষা করা হয়, চলচ্চিত্রের পর্দায়ও কাহিনীকে অনুরূপ নাটকীয় রীতিতে চলতে হবে। আসলে চলচ্চিত্রের Visual ও নাটকের Visual-এর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য আছে, যা দুটি ভিন্ন শিল্প মাধ্যমের স্বতন্ত্র প্রকাশরূপ, এটা শ' স্বীকার করেন নি। শ'-এর 'পিগমেলিয়ন' নাটকটির চলচ্চিত্ররূপে ছবির শুরুতেই কয়েকটি লাইন পর্দায় প্রতিফলিত হয়েছিল : Pygmalion was a mythological character who dabbed in sculpture. He made a statue of his ideal woman, Galatea. It was so beautiful that he prayed the gods to give it life. His wish was granted. Bernard Shaw, in his famous play, gives a modern interpretation of this theme. এই প্রস্তাবটি কেবল সংগীতমুখর ছবিটির বহু অদীক্ষিত দর্শকদের নোতুন সন্ধান দেয়নি, পরন্তু নাটকের মূল ঘটনাকেন্দ্রিক আকর্ষণ অধ্যাপক হিগন্‌স্‌ ও এলিজার পারস্পরিক রোমান্টিক সম্পর্কেও নোতুন ভাবে ইঙ্গিতবাহী করেছে। ১৯৩৮ সালে যখন নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয় তখন ছবির প্রযোজক গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল শ'কে নানাভাবে নাটকটির চলচ্চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তনের জন্য রাজি করিয়েছিলেন। নাটকটির চলচ্চিত্রায়ণে যে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছিল তাতে মোট ১৪টি নোতুন দৃশ্যসজ্জা ছিল যেগুলো বিশেষতই চলচ্চিত্রের জন্য রচিত এবং নাটকের ক্ষেত্রে যা অসম্ভব ছিল। সুতরাং একালেও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁরা শিল্পমনস্কতার দোহাই দিয়ে সিনেমার স্বকীয়তা সম্বন্ধে অপাঙ্গ ইঙ্গিত করেন এবং এর শিল্প ব্যাকরণ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে চান, তাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করাই শ্রেয়। তাঁদের জন্য কিছু বাড়তি করুণা রইল।

এবার দেখা যাক শিল্পরূপে চলচ্চিত্র কতোটা সার্থক ও অন্যান্য শিল্প শাখার সঙ্গে ভিন্নতায় তার শ্রেষ্ঠত্ব কি প্রক্রিয়ায় স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। "The film is a fictional medium, but it is not novel ; it is a dramatic

medium, but is not a drama."[২] সমালোচকের এই কথাটা অন্যান্য শিল্প শাখা ও সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মূলগত পার্থক্যটাকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। ঔপন্যাসিক তাঁর স্বকীয় অধিকারে নিজের অন্তর্দৃষ্টির মহৎ শক্তিতে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে অবস্থান করতে পারেন। উপন্যাসের বিস্তৃত ক্রমবিকাশ হ'ল উপন্যাসের মধ্যকার অন্তর্দৃষ্টিজাত প্রণালীর বিবর্তন যা চরিত্রের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তুলে ধরে। আমরা যদি 'রবিনসন ক্রুসো' বা 'মল ফ্ল্যাণ্ডার্সের' কোনো পরিচ্ছেদের সঙ্গে 'মাদাম বোভারী' অথবা মার্সেল প্রুস্ত বা জেমস্ জয়েসের কোনো উপন্যাসের পরিচ্ছেদের তুলনামূলক আলোচনা করি তবে দেখা যাবে যে মূল্যবান ভাবে সবকটি রচনার সাহিত্যিক আচরণ পরিবর্তিত হয়েছে, বিশেষত চরিত্রের বস্তুগত উপস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে যাকে সাহিত্যিক সংজ্ঞায় Objective representation বলা হয়। আর এ ব্যাপারটা ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে চরিত্রের আভ্যন্তরীণ ভাব ভঙ্গির মানসিক পর্যায়কে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

চলচ্চিত্রের নন্দন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেক শিল্পবিদ চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর সময় সীমা নির্ধারণ করে বলেছিলেন যে একটা ছবি কখনোই দর্শককে নব্বই থেকে একশ মিনিটের বেশী সময় আটক রাখবে না। এই প্রদত্ত একশ মিনিটের সম্যক আকর্ষণই দর্শকের থেকে সিনেমা আদায় ক'রে নেবে। উপন্যাসের সঙ্গে এখানেও সিনেমার একটা স্থান-কাল সম্পর্কিত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে আছে। একটা উপন্যাস পড়তে পাঠকের হয়তো দশ থেকে কুড়ি ঘণ্টা লেগে যেতে পারে। রোলাঁ, তলস্তয়, জেমস্‌জয়েসের কোনো কোনো রচনা পাঠে উল্লিখিত সময় লাগা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু চলচ্চিত্রে ঐ উপন্যাসের রূপায়ণে দর্শক দু'ঘণ্টা, খুব বেশী হলে আড়াই ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে ঐ উপন্যাসের ভাববস্তু পর্দায় প্রতিফলিত দেখতে পাবেন। সিনেমার এই সীমিত সময়সীমা একে বিশ্বের সব শিল্প মাধ্যম থেকে পৃথক করেছে। অবশ্য দীর্ঘবিলম্বিত সময়ের ছবিও নির্মিত হয়েছে যেখানে চলচ্চিত্রের প্রচলিত সময়পর্বের অনেক বেশী সময় ব্যয়িত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে রুশ পরিচালক সার্গেই বন্দেরচুক তলস্তয়ের এপিক উপন্যাস 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' অবলম্বনে আট ঘণ্টার একটি ছবি নির্মাণ করেছেন। আসলে চলচ্চিত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠায় যে ব্যাপারটি একে বিশ্বের অগণিত মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করেছে তাহলো এর কাহিনীর দিক। "What finally saved the movies was the introduction of

narrative."[৩] কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। একালে বিশ্বের নানা দেশে চলচ্চিত্রের নানা অভাবনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার আখড়ায় বিভিন্ন প্রগতিশীল স্রষ্টারা কাহিনীর কাঠামো ছেড়ে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকল্প তৈরী ক'রে তাকে একত্রে সংগ্রথিত এক একটি অনুপম ছবি করে গড়ে তুলছেন। সেখানে কেবল অসংখ্য দৃশ্যের পারম্পর্যে নির্মিত হচ্ছে মানুষের জীবনায়নের অখণ্ড রূপ! কিন্তু এত করেও গল্প চলচ্চিত্রের সঙ্গ ছাড়তে পারছে না। এখনও সবদেশে নিটোল গল্প বাদ দিয়ে অনেক ছবিই দর্শকদের বিরক্তি কুড়োচ্ছে। বস্তুতঃ পর পর সাজানো ঘটনাকেন্দ্রিক ছকে বাঁধা গল্প ছাড়া চলচ্চিত্রের পর্দায় অন্যকিছু পর্যবেক্ষণে এখনও দর্শকদের বিশেষ অনীহা। অবশ্য প্রতীচ্যে ব্যাপারটা যতো তুচ্ছ, এদেশে সেটা ভীষণভাবে বৃহৎ আকার ধারণ করে। সুস্থ, সুন্দর, বক্তব্যবাহী দৃশ্যসজ্জা দেখতে এদেশের দর্শকরা এখনও তৈরী হননি। আসলে তাঁরা এখনও সেভাবে দীক্ষিত হন নি। তাই ছবিতে গল্প না পেলেই তাঁরা প্রলয় কাণ্ড বাধান। অবশ্য সিনেমাশিল্প এখনও এমন পর্যায়ে পৌছয় নি যেখানে কোনো কাহিনী বা ঘটনাস্রোত নয় কেবল cinema for cinema's sake এই সংজ্ঞায় স্বকীয় মাধ্যমে সে একটা সময়ের বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম। যদিও ওদেশে নানাভাবে নানা শিল্পী বিভিন্ন কোণ থেকে, বিভিন্ন তাৎপর্যে চলচ্চিত্রের বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রক্রিয়াটাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একক একটি ভঙ্গিতে রূপ দেবার চেষ্টা করে চলেছেন। আমাদের বিশ্বাস একদিন সিনেমা সবকিছু পরিত্যাগ ক'রে নিজের শারীরিক ও মানসিক ধর্মে সম্পূর্ণ অভিনব শিল্প মাধ্যমে নিজের রূপ প্রকাশ করবে। কিন্তু তার আগে নিত্য পরীক্ষমাণ আধুনিক চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ ও শিল্প তাৎপর্যের অবগতির জন্য একালের দর্শককে একটু পরিশ্রমী, একটু অনুসন্ধানী হ'তে হবে। নচেৎ প্রভূত শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও যথার্থ অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হয়েও তিনি সিনেমার বিশ্লেষণে নির্বোধের মতো উক্তি ক'রে বসবেন।

'If the cinema is an art who is the artist'?[৪] চলচ্চিত্রের শিল্প ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন জাগা খুব স্বাভাবিক। চলচ্চিত্র এমনই এক শিল্প প্রক্রিয়া যেখানে বহু মানুষের সমবায়ে একটা পূর্ণায়তন রূপ গড়ে ওঠে। এই দিক থেকে একে অনেকে যৌথ শিল্প বলে চালাতে চেয়েছেন। কিন্তু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে যে শিল্প কখনো যৌথ হয় না। শিল্পের প্রকাশই একক মানুষের উপলব্ধির অভিজ্ঞান। সিনেমাকে যাঁরা বস্তুগত দিক থেকে যৌথ শিল্প

বলে স্বীকার করেন তাঁদের অজান্তেই কোনো শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রতিপাদ্য হয় না। সিনেমা যৌথ শিল্প হলে বিশ্বের কোনো শিল্পই শিল্প নয়, এ যুক্তি স্থাপন করা যায়। চিত্রকলায় যেমন রঙ, তুলি, ক্যানভাস ও অন্যান্য উপকরণ, ভাস্কর্যের যেমন নিজস্ব যন্ত্রপাতি, তেমনি চলচ্চিত্রেও ক্যামেরা, রূপসজ্জা, আলোক নিয়ন্ত্রণ, প্রক্ষেপণ, রাসায়নিক মিশ্রণ—সবই সিনেমার মূল স্রষ্টাকে বিশেষ বিশেষ কতকগুলো উপাদান দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু একটা ছবির ভালো মন্দ নির্ভর করে স্বয়ং স্রষ্টা অর্থাৎ পরিচালকের ওপর। ছবির আলোচনায় কেউ ক্যামেরাম্যান বা শব্দযন্ত্রী বা আলোকনিয়ন্ত্রণকারীকে দোষারোপ করে না, যতোটা করে পরিচালককে। সুতরাং চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ নির্ভরশীল পরিচালকের বোধের ওপর। সব বিভাগের সহযোগিতায় যে ব্যাপারটা গড়ে ওঠে তার মূল উদ্ভাবনটা স্বয়ং পরিচালকের একক মস্তিষ্ক প্রসূত। অতএব একে যৌথ শিল্প বললে পরিচালকের শিল্প দায়িত্বকে অস্বীকার করা হয়। একটা ছবিতে পরিচালক তাঁর নিজস্ব ধ্যান ধারণা, শিল্প প্রত্যয়কে তাঁর সহযোগী কর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। এই সঞ্চারণ শক্তি ও তার নিয়ন্ত্রণের গুণাগুণের ওপরই একটা ছবির শিল্পোৎকর্ষ সম্ভাবিত থাকে।

একালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা অনুরূপ বৈজ্ঞানিক মাধ্যম শিল্প রূপে স্বীকৃতি পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সেটি হ'ল টেলিভিশন। কিন্তু বিশেষ ভাবেই সেটা সম্ভব নয়। যদিও বর্তমানে চলচ্চিত্রের সঙ্গে টেলিভিশনের যে নিকট সম্পর্ক, তেমনটি অন্য কোনো শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তবু সিনেমা ও টেলিভিশনের মধ্যে শিল্পগত পার্থক্যও যথেষ্ট। প্রামাণিক কোনো ঘটনার বিবরণ বাদে বলা যায় যে টেলিভিশনের কাহিনী প্রদর্শন অনেকটাই ছবি সংবলিত রেডিওর নাটক। প্রকারান্তরে রেডিওর ভঙ্গিতেই টেলিভিশন গল্পকে চিত্রিত ক'রে দর্শকদের সামনে তুলে ধরে। এই সঙ্গে আর একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে যে মৌলিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সর্বদা সিনেমাকে একটা জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যমের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। ফলতঃ পরিচালক অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা তাঁকে শিল্পের সৃজনশীল ব্যাপারটার দিকে নিয়ত খেয়াল রাখতে হয়েছে। ঐতিহাসিক আবিষ্কার স্বরূপ ১৯২৭-এর শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতি (Advent of sound), ১৯৩৫-এর সাফল্যমণ্ডিত রঙের ব্যবহার এবং ১৯৫০-এ চওড়া পর্দার আবির্ভাব (wide Screen) —এই সমস্ত ক্রমোন্নতি-গুলো এক এক ক'রে চলচ্চিত্রে পরিচালকের ভূমিকাকে নোতুন সংজ্ঞায় চিহ্নিত

করেছে। তখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকারের মতো চলচ্চিত্রের পরিচালক সিনেমার এত বৈজ্ঞানিক আশীর্বাদ অর্জন ক'রে কতোটা একক স্রষ্টার মর্যাদা পাবেন। সাহিত্যের স্রষ্টার মতো তাঁর ভূমিকা একটা ছবি গড়ার ক্ষেত্রে কতোটা সুদূর প্রসারী? এ জিজ্ঞাসা একালের শিল্পমহলেও কৌতূহলে বিধৃত হয়ে আছে। এক কালে, অর্থাৎ সিনেমার শিল্প মর্যাদা যখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, যখন কেবল ব্যবসাগত ভাবে সিনেমাকে দেখা হ'ত, জনসাধারণের কাছে যখন তা ছিল কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের একটা বড় রকমের ক্ষেত্র, তখন নায়ক নায়িকার কদরে এক একটা ছবির মান নির্ধারিত হ'ত। ছবির সাফল্য ও উৎকর্ষের কেন্দ্রে বিরাজ করতো স্বনামধন্য নায়ক নায়িকাদের নাম। গত কয়েক দশক ধরে সিনেমার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা স্বয়ং পরিচালকের নামকে কেন্দ্র করেই। একালের চলচ্চিত্র, স্রষ্টার ভাবনা প্রসূত শিল্প মনীষার পরিচায়ক। পরিচালকই এখন সিনেমা শিল্পের মুখ্য স্রষ্টা, শিল্প নিয়ন্ত্রক। চিরকালই ব্যাপারটা তাই। কিন্তু সিনেমার প্রথমদিকে পরিচালকের শিল্প মর্যাদা প্রযোজক ও সিনেমার মূল নির্মাণ প্রকল্পের কঠোর শাসনে অনেকটা নজর বন্দী ছিল। ছবির পরিচালককে সিনেমার 'গ্রন্থকার' অথবা 'প্রধান স্রষ্টা' রূপে দেখা চলচ্চিত্রের শিল্প প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষেত্রে সংশয়ের কারণ ছিল। কেননা অনেক বিখ্যাত শিল্পোন্নত ছবিই অনেক ক্লাসিক সাহিত্যের আশ্রয়ে চিত্রিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে মূল সাহিত্যের উৎকর্ষ অপেক্ষা পর্দায় প্রতিফলিত তার চলচ্চিত্ররূপে, দুয়ের মধ্যে কার দাবি বেশী, সে প্রশ্ন শিল্পবিদ্‌দের কাছে প্রকট ছিল। কিন্তু ইদানীং কালের কিছু বিস্ময়কর ছবি এ কথা প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে কোনো উৎকৃষ্ট সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রেও পরিচালকের ভূমিকা সাহিত্যের লেখকের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্রিটিশ পরিচালক টনি রিচার্ডসন যখন 'টম জোনস্' ছবি নির্মাণ করেন তখন হেনরী ফিল্‌ডিং অপেক্ষা রিচার্ডসনের আধিপত্যই ছবিতে বিদ্যমান ছিল। রিচার্ডসন কেবল একটা বিশিষ্ট শতকের বিশিষ্ট সাহিত্যের কাঠামোটি গ্রহণ করেছেন। চলচ্চিত্রের পর্দায় তিনি ফিল্‌ডিংয়ের কাহিনীর যে রূপ দান করেছেন সেখানে খুব বেশীমাত্রায় স্বয়ং পরিচালক বিরাজ করছেন, ঔপন্যাসিক নন। যেমুহূর্তে একটা উপন্যাস প্রথম শ্রেণীর এক শিল্পীর রূপান্তরী বিবেকের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের পর্দায় রূপ পরিগ্রহ করে, সেখানে তখন মূল সাহিত্যের লেখকের শিল্পগুণ অপেক্ষা স্রষ্টার দাবিই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে মহৎ

সাহিত্যের আশ্রয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রে মূলের যে পুনর্বিন্যাস তাতে সাহিত্যিকের অবদানটাও কম নয়। অথচ এটাও বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা অবলম্বনে নিম্ন শ্রেণীর ছবিও তৈরী হয়েছে. আবার অকিঞ্চিৎকর রচনাকে কেন্দ্র করে মহৎ চলচ্চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ এখানে প্রকারান্তরে প্রধান রচয়িতাররূপে ছবির পরিচালকের দায়িত্ব ও শিল্পচিন্তার সূত্রটাই প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়।

একালের চলচ্চিত্রের শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যায় নন্দনবিদ্ যখন বলেন "the movies like other arts, must make personal statements in order to make masterpieces"[৫] তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি সিনেমার পরিচালককে সিনেমার একমাত্র রচয়িতা রূপে গণ্য করতে উৎসাহী। ত্রিশ দশকে এবং যুদ্ধের বছর গুলিতে ফরাসী চলচ্চিত্র জগতে কবি জ্যাক প্রিভেত অসংখ্য ছবির চিত্রনাট্য করেছিলেন, যেখানে তিনি ছবি গড়ার ক্ষেত্রে কেবল দক্ষ কারিগরের ভূমিকাই পালন করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁকে তাঁর চিত্রনাট্যের খুঁটিনাটি বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষার কাজে নিয়োগ করেছিলেন সেইসব ছবির প্রযোজক মহল। অথচ স্মরণীয়ভাবে যে সব ছবি জ্যাকের স্থায়ী সহকর্মী মার্সেল কারণে এবং তাঁর ভাই পিয়ের প্রিভেতের পরিচালনায় গড়ে উঠেছিল সেখানে বিশেষভাবেই তাঁদের 'ব্যক্তি চিন্তার' প্রতিফলন ঘটেছিল সিনেমার নিজস্ব ঢঙে। আসলে একটা ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে স্রষ্টার শিল্প স্বাধীনতা না থাকলে সেখানে পরিচালকের একক শিল্পসত্তার প্রতিফলনের কোনো অবকাশ থাকে না। অন্যান্য শিল্প শাখার মতো মহৎ চলচ্চিত্র যা যথার্থ শিল্প পরিগনিত হবার যোগ্য সেখানে স্রষ্টার একান্ত নিজস্বতার সাক্ষর থাকতে বাধ্য। এবং সেখানেই তা নোতুন ভাবে আর এক শিল্পরূপ গ্রহণ করে। ডেভিড লীন যখন ডিকেন্সের বিখ্যাত উপন্যাস 'অলিভার টুইস্ট' চলচ্চিত্রে রূপ দেন, তখন একদিকে যেমন ডিকেন্সের রচনার একটা ভূমিকা থেকে যায়, অনুরূপ ভাবে পরিচালক লীনের উপস্থাপনার মৌলিকতাও ভীষণ ভাবে ছবিটাকে সম্পূর্ণ এক নোতুন শিল্পের জগতে পৌঁছে দেয়। সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে মূল্যবান বিবৃতির এই অভিনব চলমান রূপ নির্ধারণে সিনেমায় পরিচালকের স্থান ঔপন্যাসিকের সমান। কিন্তু এক্ষেত্রে ডেভিড লীনের ছবিটাকে ডিকেন্সের সাহিত্যের একটা সংস্করণ বলে মনে করলে ভুল হবে। ডিকেন্সের রচনায় লিখিত বিবরণ যে মুহূর্তে ক্যামেরার যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সিনেমার নানান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে একটা নোতুন রূপ পেল—তখনই তার

নোতুন চরিত্র গড়ে উঠল। তাকে তখন উপন্যাস বলা যাবে না, নাট্যরূপ বলা যাবে না, সে তখন সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প, নাটক সব ছাড়িয়ে এক স্বতন্ত্র শিল্পরূপ—চলচ্চিত্র। মাধ্যমগত এই স্বকীয়তা স্বীকার ক'রে নিলে চলচ্চিত্রের শিল্পধারণায় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না।

আজ চলচ্চিত্র এমন স্তর অতিক্রম করেছে যে কাব্য, নাটক, সংগীত, চিত্র, শব্দ ও শ্রুতি, সবকিছুকে যে আত্মসাৎ ক'রে নিজের ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে। সিনেমা থেকে তাই পৃথক ভাবে সহযোগী উপাদানগুলোর মাহাত্ম্য বিশ্লেষণে অনেক ক্ষেত্রে মূল চলচ্চিত্রের শিল্প প্রক্রিয়া উপেক্ষিত হয়। সামগ্রিক ভাবে একটা ছবি সার্থক হ'ল কি না, সেটা বিচার করলেই এ শিল্পের গোটা চরিত্রটা স্পষ্ট হয়ে যায়। একালে আমরা এমনও অনেক ছবি দেখেছি যে ছবির প্রায় সংলাপই গানের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। এখানে ছবির কাহিনী গ্রন্থনাও চলচ্চিত্রের পর্দায় গানের চরণের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ ছবির পাত্র-পাত্রীরা গদ্যসংলাপের পরিবর্তে গানের মধ্যে দিয়ে তাদের বক্তব্য রেখেছে। কিন্তু এখানেও সিনেমার Visuality অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য গুণ নষ্ট হয় নি। কারণ সর্বোপরি কাজ করেছে পরিচালকের শিল্পমনস্কতা। ফরাসী পরিচালক জ্যাক দেমীর 'The Umbrellas of cherbourg' ছবিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পরিচালক দেমী বিশেষ ভাবেই সিনেমার দৃশ্যগত ব্যাকরণের সঙ্গে তাঁর গল্পটিকে সুগ্রথিত করেছেন। অনেক ছবিতে অনেক রোমান্টিক দৃশ্য বিন্যাসে কবিতার চরণের মতো চিত্রবর্ণনা লাভ করা যায়। ছবি দেখতে দেখতে কবিতার চিত্রকল্পের কথা মনে পড়ে যায়। ক্লদ লেলুশের ফরাসী ছবি 'ম্যান এ্যাণ্ড এ্যান ওম্যান'—এর একটি দৃশ্য আছে যেখানে একটা কুকুর শীতের অপরাহ্নে সমুদ্রতীরে উল্লাসের সঙ্গে ছোটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, অদূরে তার প্রভু সেই স্বর্ণ-কিরণোজ্জ্বল বালুকাবেলায় শ্লথ গতিতে বেড়াচ্ছেন। এই সমগ্র দৃশ্য পর্বটিকে পরিচালক এক প্রেমিক ও প্রেমিকার ভালোলাগার অনুষঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সমগ্র পরিবেশটাই একটা কবিতার বর্ণনার মতো। এখানের ইমেজ মূল গল্পকে বিশেষভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় নি, কিন্তু ছবিতে এ দৃশ্যাংশটি উপমার কাজ করেছে এবং তৎকালীন স্থান ও পাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক উদঘাটন করেছে। একটা ছবির শেষ দৃশ্যে আমরা দেখেছি নায়ক তার পারিপার্শ্বিকের নৈরাশ্যময় অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ায় দ্বিধাগ্রস্ত। ক্যামেরা নায়ক ও পার্শ্ববর্তী মাঠের টেনিস খেলার মূকাভিনয় থেকে ক্রমে ওপরে উঠে যায়।

সিনেমায় ক্রেনের সাহায্যে গৃহীত এই দৃশ্যটিতে যে গতিময়তা তা আর অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে প্রকাশ পাবার উপায় নেই। আন্তনিওনি তাঁর 'ব্লোপ-আপ ছবির এই শেষ দৃশ্যে যে চিত্রধর্মিতার সঙ্গে সাংগীতিক তাৎপর্যকে ক্রেমে ধরেছেন তা অনবদ্য। অন্যশিল্পে এটি দুর্লভ।

মার্ক ডনস্কয়ের 'গোর্কী ট্রিলজির' প্রথম ছবি···My childhood—এর শেষ দৃশ্যে এ্যালেক্‌সি (গোর্কী) গ্রাম ছেড়ে 'পৃথিবীর পাঠশালায়' নোতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে একাই বেরিয়ে পড়েছে। বেড়া দেওয়া রাস্তা সুদূরে মিলিয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায় দর্শকরা কিশোর এ্যালেক্‌সির চলে যাওয়া দেখে। অবলীক্ ফ্রেমে সমস্ত দৃশ্যটি কাব্যিক ব্যাঞ্জনায় অসাধারণ কারুণ্য সঞ্চার করে। এ দৃশ্যসজ্জা অন্য কোনো শিল্পরীতিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রের নিজস্ব গতির ছন্দে এ দৃশ্য মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নেয়। সিনেমার এই চলমানতাই এর শিল্পস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছে, একে দান করেছে সর্বোচ্চ-মহিমা। মানুষের বিজ্ঞান বুদ্ধি, কলাবুদ্ধি তাবৎ প্রকরণকে একত্রিত করে যেদিন চলচ্চিত্র নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই তার শিল্পচারিত্র্য একটা তত্ত্বের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কলাবিদ্, চলচ্চিত্রকার, সমালোচকরা সিনেমার সেই তত্ত্বের বস্তুগত ও ভাবগত অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অনেকভাবে এর ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সব ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক আলোচনার প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে পাত্র ভেদে সিনেমার শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নানাজন নানামত পোষণ করলেও চলচ্চিত্রের শিল্পস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সকলের ভাষাই একই ব্যাপারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সিনেমার সূচনা থেকেই একে 'চিত্রিত সাহিত্য' (Illustrated Literature) এই সংজ্ঞায় ভেবে আসা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। ইতালীয় কবি, দার্শনিক ও চলচ্চিত্রকার পাওলো পাসোলিনি চলচ্চিত্রের ভাষাকে বলেছেন im-segni অর্থাৎ image signs, ইতালীর অপর পরিচালক সিনেমায় বিবৃত কাহিনীর ব্যাখ্যার পদ্ধতিকে বলেছেন 'novels in image' অর্থাৎ অসংখ্য খণ্ড খণ্ড চিত্রকল্পের সমাহারে বিবৃত উপন্যাস। বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক ফেলিনির মতে সমস্ত ব্যাপারটা হল just parking yourself in front of reality অন্য পক্ষে বিশ্ববিশ্রুত সুইডিশ পরিচালক বার্গম্যান জোর দিয়েছেন যে সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। চলচ্চিত্র অনেকটা সংগীতের মতো। The irrational dimention of a Literary work, the germ of its existence, is often untranslatable

into visual terms—and it, in turn, destroy the special, irrational dimension cf the film.[৬] এই ব্যাখ্যায় বার্গম্যান চলচ্চিত্রের জন্য নির্মিত পাণ্ডুলিপিকেও একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার বলে মনে করেন, তিনি জানেন যে পাণ্ডুলিপির খসড়াই তাঁকে মূল বস্তুতে উপনীত হতে সাহায্য করবে, অর্থাৎ তাঁর ভাষায় ব্যাপারটা একধরনের 'অবিশ্বস্ত উপকরণ' হয়েও সিনেমার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তিনি বলেন এটা 'a kind of notaticn which would enable me to put on paper all the shades and tones of my vision'.

'অবিশ্বস্ত উপকরণ' বলার পিছনে একটি মাত্র কারণ রয়েছে। পরিচালকের লিখিত পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ চিত্রনাট্য ও ছবির মধ্যে পার্থক্য একটু থেকেই যায়। তার কারণ চলচ্চিত্রের সমগ্র ব্যাপারটাই যেহেতু এক জটিল যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। পরিচালক ঠিক যে চোখে যতটুকু পরিমাণে যে দৃশ্যটি লেখার পাতায় বিধৃত করেছিলেন চলচ্চিত্রের পর্দায় হুবহু ডিগ্রি অনুযায়ী ততোটা ফুটে ওঠে না। ক্যামেরা সঞ্চালন, সম্পাদনা, আলোকসম্পাত, শব্দ-প্রয়োগ ও সর্বোপরি ল্যাবরেটরির রাসায়নিক সংমিশ্রনে মূল ব্যাপারটার অনেকটা পরিবর্তিত হ'য়ে যায়। তবু সচেতন পরিচালকের ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য ও পর্দায় প্রতিফলিত শিল্পরূপের ব্যবধানটা কেবল অবশ্যম্ভাবী বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা একমাত্র স্বয়ং পরিচালকের মানসেই বিরাজ করে। দর্শক সাধারণের উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য ঘটায় না। ফরাসী চিত্রপরিচালক একালের অন্যতম বহু আলোচিত স্রষ্টা জঁ্যা লুক গদার তাঁর ছবি করার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চিত্রনাট্য করেন না। তিনি নিজে বহু স্থানে বিবৃতি দিয়েছেন যে ছবিতে বর্ণিতব্য ঘটনাস্থলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং ছবির পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে শুটিং শুরু না করা পর্যন্ত তিনি তাঁর ছবির সংলাপও লেখেন না। অর্থাৎ সমগ্র শিল্পসংগঠনটাই তাৎক্ষনিক। গদারের মতে ছবির এই সংলাপ রচনা ব্যাপারটাই চলচ্চিত্রের প্রধান সাহিত্য সংক্রান্ত উপাদান ও কাজ। সিনেমার ভাষা সম্বন্ধে বিবৃত এইসব নানা মতের কেন্দ্রে বিরাজিত যে স্পষ্ট প্রতীয়মান 'প্যারাডক্স' রয়েছে সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরেই ফরাসী সমালোচক আলেকজান্দার আসত্রুক্ একটি প্রবন্ধে নোতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে তৎকালীন অনেক সমালোচকের মতো আসত্রুকও পরবর্তীকালে পরিচালক হয়েছিলেন। তিনি বিশেষ নামকরণ করেছিলেন

La camera stylo, অর্থাৎ The camera pen সেটি বর্তমানকালে একটি শিল্পদলিল রূপে পরিগণিত। তাঁর ভাষায় I call this new age of the cinema of La camera stylo. This metaphor has a very precise sense. It means that the cinema will free itself, little by little from the tyrany of the visual, from the image for the sake of image, from the immediate anecdote, from the concrete, in order to become a method of writing as supple and subtle as our ordinary written language.

এই সূত্রেই ঐতিহাসিক দিক থেকে একটা উদাহরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এরও বহু আগে ১৯১৬ সালে মারিনে এবং ফিউচারিস্টরা পুস্তিকাকারে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে অন্যসব শিল্প থেকে চলচ্চিত্রের মুক্তি দাবী করেছিলেন। আর এটা তখন বিশের দশকের আবর্তমান আভাগার্দীয় শিল্প আন্দোলনেরও বিষয় ছিল যা মূলতঃ এক্সপ্রেসনিষ্ট ও সুররিয়ালিষ্ট কবি ও চিত্রকরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে পুদভ্‌কিন্‌ আইজেনস্টাইন ও অন্যান্য চলচ্চিত্রকাররা 'মণ্টাজ' প্রক্রিয়াটির ওপর আরো গুরুত্ব আরোপ করে চলচ্চিত্রগত ভাষাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, যেখানে বলা হল চলচ্চিত্রের এক একটি দৃশ্য-কল্পনা সাহিত্যের শব্দের সমান, সিনেমার সিকোয়েন্স হ'ল সাহিত্যের বাক্যাংশের সদৃশ, কাট্‌ ব্যবহৃত হবে বাক্যের কমা চিহ্নের স্বরূপ এবং চিত্রকল্পের সাদৃশ্য কল্পিত হবে সাহিত্যের উপমা বা অলংকার প্রকাশের ক্ষেত্রে।

কিন্তু এত সত্বেও ১৯৩০-এর পর্বে কোনো কোনো সমালোচক স্বতন্ত্র এবং শক্তি-শালী স্বাধীন শিল্প মাধ্যম হিসেবে সিনেমাকে ভালো চোখে দেখলেন না, এবং চলচ্চিত্রের পরিচালককে সৃজনশীল মুখ্য ভূমিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করলেন, উপরন্তু 'মণ্টাজ' প্রক্রিয়ার মর্ম সম্বন্ধে সংশয় জ্ঞাপন করে ঘোষণা করলেন চলচ্চিত্র হল 'mechanically superb and intellectually contemptible'[৭] এই শেষোক্ত অপব্যাখ্যাও সিনেমার শিল্পস্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাকে কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি। কেননা অন্যান্য শিল্পের মতো চলচ্চিত্রেরও যে নিজস্ব একটা ভাষা ও ব্যাকরণ আছে, যা বিশ্বের অপর সকল মাধ্যম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অভিনব, সেটা যেকোনো উৎকৃষ্ট ছবিতেই স্বপ্রকাশ। সুতরাং শিক্ষার তকমাধারী বিজ্ঞদের অবজ্ঞায় এর বস্তুগত কোনো ক্ষতি হবে না, হয়তো ভাবগত প্রবহমানতা কিঞ্চিৎ শ্লথ হতে পারে। তাই নানাভাবে, নানা দেশে চলচ্চিত্রের

শিল্প প্রক্রিয়ার প্রয়োগ দিকটার সম্বন্ধে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এদেশে তার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি। এখনও ভারতবর্ষে তেমন ভাবে 'বয়স্ক ছবি' অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানপূর্ণ বাস্তব ছবি খুব একটা তৈরী হয় না। উপরন্তু চলচ্চিত্রের যথার্থ শিল্পস্বীকৃতিও এদেশে এখনও সঠিক ভাবে ঘটেনি। তাই বর্তমান আলোচনার সীমিত শিল্পবুদ্ধিতে চলচ্চিত্রের শিল্পতাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। যদি অন্ততঃ শতকরা একজনও এ দ্বারা সিনেমার শিল্প প্রকরণের প্রতি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হন, তবে জানবো আমারা অনেকটা এগিয়েছি। কেননা—

> আপনি তো জানেন, শুধু আপনিই জানেন, কী আনন্দ
> এখনও মূর্খের শূন্য অট্টহাসি, নিন্দুকের ক্ষিপ্র
> জিহ্বাকে সে তুচ্ছ করে নিতান্তই অনায়াসে ; তীব্র
> দুঃখের মুহূর্তে আজও কী পরম প্রত্যয়ের শান্তি
> শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখে ;

১। Film and Filming—February 1959

২। The Cinema 1950—Roger Manvell Page—47

৩। The Liveliest Art—Arthui Knight, Page—23

৪। Cinema Eye ; Cinema Ear—John Russl Taylor, Page—9

৫। Art, Affluence and Alienation—Roy Mc Mullen Page—235

৬। Four ScreenPlays of Ingmar Bergman—Simon and Schuster, New York, 1960 PP—XVII—XVIII

৭। A Grammar of the film—Raymond spottiswood, University of California Press Berkeley 1950 Page—311

চিত্রনাট্য

স্ক্রিপ্‌ট্, সিনারিও ইত্যাদি সংজ্ঞায় চলচ্চিত্রের জন্য লিখিত নাট্যরূপকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বাংলায় বলা হয় চিত্রনাট্য। অনেকের ধারণা যে, যে কোনো গল্পের নাট্যরূপই সিনেমার ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যরূপে গণ্য হয়, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। চিত্রনাট্যের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। সিনেমার এই চিত্রনাট্যের এমন কতকগুলো টেকনিক আছে, কতকগুলো রীতি আছে যার সঙ্গে সাধারণ নাট্যরূপের তফাৎ অনেক। সাধারণ নাট্যরূপে বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর সংলাপ থাকে। সেই সঙ্গে থাকে সেটের কিছু বর্ণনা যার মধ্যে নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। প্রসঙ্গতঃ মঞ্চের আলোক সম্পাত, মঞ্চের পারিপার্শ্বিক বস্তুসামগ্রী অর্থাৎ 'স্টেজপ্রপার্টি' ইত্যাদির বর্ণনা থাকে। কিন্তু সিনেমার লিখিত নাট্যরূপে চরিত্রের মূল সংলাপের সংগে আনুসঙ্গিক অনেক ডিটেল্‌সের বর্ণনা থাকে যেমন, স্থান-কালগত অবস্থান, ক্যামেরার গতি, পাত্র-পাত্রীদের চলাফেরার খণ্ড খণ্ড ইংগিত, বিশেষ বিশেষ শব্দকল্প, ইত্যাদি। অনেকে অনেক পন্থায় চিত্রনাট্য লেখেন। কেউ কেউ শুধু বিভিন্ন দৃশ্যের বিভাজন ক'রে চরিত্রদের সংলাপকে কেবল লিপিবদ্ধ করে রাখেন, শুটিংএর সময় বাকি ডিটেল্‌সটুকু সম্পন্ন হয়। অনেকে সংলাপের পাশে পাশে ছোট ছোট স্কেচের মাধ্যমে ক্যামেরার গতির ইংগিতটুকুও লিখে রাখেন, দৃশ্যের কৌণিক অবস্থান, চরিত্রের বিভিন্ন শরীরী অংশের কতটুকু দৃশ্যের মধ্যে থাকবে, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণে সামগ্রিক পটভূমির কতখানি অংশ ধরা দেবে ইত্যাদি সব বর্ণনা চিত্রনাট্যের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। যদিও চিত্রনাট্য সম্পর্কিত কোনো কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ নেই। চলচ্চিত্রের আধুনিকতায় একালে চিত্রনাট্য রচনার রীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রখ্যাত রুশ পরিচালক আইজেনষ্টাইন চিত্রনাট্য সম্পর্কে কতকগুলো রীতির কথা বলেছিলেন যাকে অবলম্বন ক'রে চলচ্চিত্রের স্বকীয় ব্যাকরণ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে দুজন পরিচালক চিত্রনাট্যের সংগে খণ্ড খণ্ড স্কেচের আকারে পুরো শুটিং-এর ব্যাপারটাকে লিখে রাখেন। এই স্কেচগুলি ফিল্মের আকারে আঁকা হয়।

সত্যজিত রায় ও পূর্ণেন্দু পত্রী এঁরা দুজনেই ঐ ছোট ছোট স্কেচের মাধ্যমে

আগে থেকেই পুরো দৃশ্যটাকে মনে মনে কল্পনা করে রাখেন। বলা বাহুল্য এই রীতি চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর। চলচ্চিত্রের জন্মলগ্ন থেকে এই 'চিত্রনাট্য' ব্যাপারটির একটা অভিনব ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চলচ্চিত্রের গোড়ার দিকে চিত্রনাট্যে বস্তুটা ছিল অনেকাংশে সাহিত্য নির্ভর। এবং এখানে কোনোরকমে গল্পের একটা নাট্যরূপকে বজায় রাখাই পরিচালকদের লক্ষ্য ছিল। কালের বিবর্তনে 'সিনেমা' ব্যাপারটা যখন একটা স্বতন্ত্র শিল্পমূল্যে স্বীকৃত হল তখন জন্ম নিল এক নোতুন চিত্রভাষা যা পরবর্তীকালে 'চিত্রনাট্য' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে ক্লোজ-আপের বিবর্তনের সংগে সংগে এই চিত্রনাট্যেও রীতি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, একালে চিত্রনাট্য রচনা এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে উৎকৃষ্ট চিত্রনাট্যের একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য-মূল্য স্বীকৃত হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ সাম্প্রতিককালে বহু উৎকৃষ্ট চিত্রনাট্য আলাদা গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোর একটা ভিন্নতর শিল্পমূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। যেহেতু ক্যামেরাই সিনেমার প্রাথমিক এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপকরণ তাই স্বাভাবিকভাবে চিত্রনাট্যের মধ্যে ক্যামেরার বিবিধ মুভমেন্টের ইংগিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। আর একেই মূলতঃ সিনেমার ভাষায় 'ট্রিটমেণ্ট' বলে অভিহিত করা হয়। চিত্রনাট্য পাঠে যাঁরা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত তাঁরা অনায়াসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত চিত্রনাট্য পড়ে নিজে নিজেই পুরো ছবিটার একটা দৃশ্যক্রম কল্পনা করে নিতে পারেন। যদিও তাঁদের এই Visualisation এর সঙ্গে উক্ত ছবির দৃশ্যগঠন হয়তো পুরোপুরি নাও মিলতে পারে, আবার কোথাও সমধর্মীতাও অস্বাভাবিক নয়। চিত্রনাট্যের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এর ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত অনুশীলন। চিত্রনাট্যে একটি ঘটনা কখনো অনন্তকাল ধরে বর্ণিত হয় না। খণ্ড খণ্ড চিত্রকল্পে, দৃশ্যবিভাজনে, শব্দ ও সংগীতের যুগ্ম মিলনে এর মধ্যে এমন কিছু আভাস থাকে যাকে সম্পাদনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রের পর্দায় একটা অখণ্ড রূপ দান করা হয়। তখনই একটি চিত্রনাট্য সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। ফ্রেমের মধ্যে কখনো একটি মুখমণ্ডল, কখনো কেবল চোখ দুটি, কোথাও একটি ঘরের বিশেষ কৌনিক অবস্থান, আসবাব-পত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ, হয়তো পরমুহূর্তেই ঘর থেকে একেবারে উদার আকাশের নীচে, তারপরেই হয়তো জনাকীর্ণ রাস্তায় অগণিত মানুষের মুখের মিছিলে দৃশ্যের উপস্থিতি। এসবই লিখিতভাবে চিত্রনাট্যে পরপর সন্নিবদ্ধ থাকে। চলচ্চিত্রের পর্দায় সিনেমার বিধিবদ্ধ গতির সন্নিপাতে দর্শকরা তার থেকে একটা বিশেষ ধারাবাহিকতার

ইংগিত পান। আবার অতি হাল আমলে অনেক স্রষ্টা চিত্রনাট্যের এই বিবর্তনটিকেও ভেঙে দিচ্ছেন. তার বদলে তৈরী করছেন এক আশ্চর্য নোতুন চলচ্চিত্র ভাষা। প্রথমাবধিই বিজ্ঞান-নির্ভর শিল্প রূপে আত্মপ্রকাশ করার ফলেই সিনেমার ব্যাকরণে নিত্য নোতুন এইসব রীতির জন্ম হচ্ছে। কেউ কেউ আবার চিত্রনাট্যকে 'চলচ্চিত্রনাট্য' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মনে হয় 'চিত্রনাট্য' শব্দটিই যুক্তিযুক্ত। অনেক সাহিত্য রচনার মধ্যে অনেক সময় চলচ্চিত্রোপযোগী অনেক বর্ণনা থাকে। সেই সব বর্ণনা অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে সেখানে সিনেমার খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মতো অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে চিত্রনাট্যে যেমন অনেক ঘটনা ও স্থানকালের টুকরো টুকরো অংশ ডিটেল্‌সে বর্ণিত হয়। অনেক সাহিত্য রচনা খুঁজলে ঠিক সেই ধরণের দৃশ্যকল্পও বার ক'রে নেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম এবং একালের কমলকুমার মজুমদারের রচনায় এই জাতীয় চলচ্চিত্রানুগ অংশবিশেষ অনেক ছড়িয়ে আছে। চিত্রনাট্য রচনায় লেখকের কল্পনা এবং বাস্তবতা দুটোই অপরিহার্য. চিত্রনাট্য লিখতে বসে তাঁকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে স্থানকালের অবস্থা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পাত্র-পাত্রীর আচরণ সম্পর্কিত গতিবিধি, কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়, সর্বোপরি সিনেমার ধর্ম অনুযায়ী বিবিধ উপকরণের সূক্ষ্ম নির্বাচন। অর্থাৎ এক একটি খণ্ড দৃশ্যের মধ্যে কতটুকু থাকবে, কোনটা বাদ যাবে, দৃশ্যের প্রথম ও শেষ কিভাবে হবে, একটি দৃশ্যক্রম থেকে অপর একটি দৃশ্যক্রমে উপস্থিত হবার প্রাক্‌কালে তার যৌক্তিকতা, বাস্তবতা যাতে রক্ষিত হয় লক্ষ্য রাখতে হবে। চলচ্চিত্র একটি যৌথ শিল্পমাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও চিত্রনাট্যের কাঠামোর উপরই একটি ছবির পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যকল্পনা গড়ে ওঠে। দুর্বল চিত্রনাট্য হলে তার চলচ্চিত্ররূপও দুর্বল হয়ে পড়ে। চিত্রনাট্যে অতিশয়োক্তির কোন স্থান নেই। চিত্রনাট্যের ভাষাই হল ক্যামেরার ভাষা। ক্যামেরায় যতটুকু ধরা পড়ে, চিত্রনাট্যে তার অধিক বর্ণনার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কেবল শব্দ প্রয়োগ ও সংগীত চিত্রনাট্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রে একটি বিশিষ্ট মাত্রা আরোপ করে। বহু উৎকৃষ্ট ছবির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ভিন্ন ব্যক্তি দেখা গেছে। আবার পরিচালক নিজেও বহু ক্ষেত্রে নিজের ছবির চিত্রনাট্য লেখেন। মনে হয় স্বয়ং পরিচালক যদি নিজের ছবির চিত্রনাট্য লেখেন তবে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আরো প্রত্যক্ষ হয়। কারণ তিনি নিজের কল্পনায় যে সিকোয়েন্সটিকে লিপিবদ্ধ করেন, অপরের রচনা অবলম্বন করে ঠিক সেই অনুপাতে দৃশ্যের কম্পোজিশনটা গড়ে ওঠে না। সাহিত্যের রচনায় বাক্য

গঠনে যেমন রচয়িতা পূর্ণচ্ছেদ, অল্পযতি, বিরামচিহ্ন ইত্যাদি ব্যাকরণ প্রয়োগ করেন চিত্রনাট্যেও এই জাতীয় ব্যাপার আছে যেগুলি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। কাট, জাম্পকাট, ইন্টার কাট, মিক্স বা ডিজল্ভ, ফেড আউট, ফেডইন ইত্যাদি নানা রীতিতে একটি চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ ছবির শরীরটিকে গঠন করে দেয়। আধুনিক কালের কোনো কোনো পরিচালক চিত্রনাট্য সম্পর্কে কোনোরূপ পূর্বলিখিত বা পূর্বপরিকল্পিত কোনো নির্দিষ্ট রীতিকে অবলম্বন করেন না। অর্থাৎ শুটিং-এর সময়ে যা করার ঠিক করেন। এমনকি অনেকে নির্দিষ্ট সংলাপও লিখে রাখার পক্ষপাতী নন।

'I go away by myself. for half an hour or so before we begin shooting বলেছেন আন্তনিওনি। ব্রেসঁর কথা—'I arrive in the morning knowing what I intend to do during the day, but not how I intend do it , অবার গোদার বলেন— 'I have an idea at the back of my mind, and I develop it with my actors ; although we work from a written text, the dialogue may only be put down on paper a few minutes before we start filming' চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে চিত্রনাট্য সম্পর্কে পৃথিবীর এই বিখ্যাত তিন পরিচালকের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য থেকে বোঝা যাছে যে সিনেমা ব্যাপারটা ক্রমশঃ শিল্পীর আরো করায়ত্ত হতে চলেছে। সিনেমার জন্মলগ্নের পর বেশ কিছুকাল একটা ছবি সম্পূর্ণ হতে পরিচালকের অনেক অসুবিধা ও সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে। দীর্ঘকালাশ্রিত চর্চা ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় একালে সিনেমা মাধ্যমটিতে পরিচালকরা অনেক নোতুন উপকরণ যোগ করেছেন, ফলে চলচ্চিত্রের স্বরূপটিতে একটি নোতুন মাত্রা আরোপিত হয়েছে। সুতরাং এ অনুমান নিশ্চয়ই অসংগত নয় যে কোনো এক সুদূর ভবিষ্যতে ঔপন্যাসিকের কলমের মতোই যে কোনো স্রষ্টা চলচ্চিত্র মাধ্যমের ব্যাবহারে সক্ষম হবেন। তখন সিনেমার প্রয়োজনে লিখিত কোনো 'চিত্রনাট্য' ধরনের বস্তু আদৌ থাকবে কি না তাও ভেবে দেখা যেতে পারে।

চলচ্চিত্র ঃ প্রকাশভঙ্গি ও কাহিনীর টেকনিক্

গল্প বলা ও গল্পশোনার আগ্রহ মানুষের আদিম প্রবৃত্তির অন্যতম বিষয়। পৃথিবীর সভ্যতার আদিম পর্যায়, গুহাবাসী মানুষ, প্রাচীন উপজাতিগোষ্ঠী দিনান্তে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, জলন্ত আগুনের সামনে পরস্পরকে নিজেদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিত। তদের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় আধুনিক গল্পকথনের চারুত্ব না থাকলেও রোমাঞ্চ, শিহরণ, আশ্চর্যের অভাব ছিল না। মানুষের এই গল্প বলার ভঙ্গি যুগ-যুগান্তে নোতুনভাবে অঙ্গসজ্জা পেয়েছে, অভিনব আকারে মানুষের বোধের অভিজ্ঞতায় তার প্রাত্যহিক জীবনচর্যা। টানাপোড়েনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে একীভূত হয়ে গেছে।

গল্প কথনের এই অভিনবত্ব কেবলমাত্র সাহিত্য বা ভাস্কর্য চিত্রকলাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। শিল্পের অন্যান্য শাখাতেও এর ক্রমবিবর্তন সুষ্ঠুরূপে বিদ্যমান। প্রাচীন গুহাচিত্র ও ক্রমঅন্বিত ভাস্কর্যসমূহে গল্পকথনের যে রীতি প্রচলিত ছিল, মূলতঃ তাকে অবলম্বন করেই সাহিত্য বা শিল্পের অন্যান্য শাখার কাহিনী বর্ণনার ভঙ্গিটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। পরে শিল্পীর আভ্যন্তরীণ মূর্ত-বিমূর্ত ভাবকল্পনার আত্যন্তিক প্রকাশ ব্যগ্রতায় সেই গল্পকথন এক আশ্চর্য অভিনব আঙ্গিকে লাবণ্য-মণ্ডিত হয়।

এই শতাব্দীর অন্যতম শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রের মধ্যেও এই গল্পকথনের রূপটি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। আদিতে, আবিষ্কারের প্রথমাবস্থায় পরপর ঘটনাক্রম বর্ণনার যে রীতিকে আমরা লক্ষ্য করেছি, বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। উপরন্তু চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে সুবিহিত 'চিত্রনাট্য' ব্যাপারটির নানা ব্যাপ্তির ফলে সিনেমার গল্প উপস্থাপনে একটা নোতুন টেকনিক্ নির্দিষ্ট রীতি হিসেবে দেখা দিয়েছে। একালে চলচ্চিত্রের সমগ্র দেহে ও মনে প্রচলিত রীতির বাইরে এসে অভিনব কিছু করার প্রয়াস বদ্ধমূল হচ্ছে। চলচ্চিত্র এমনই একটি শিল্পমাধ্যম, যেখানে পৃথিবীর সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া পুঞ্জীভূত। এবং এরই ফলে, চলচ্চিত্রের পক্ষে শিল্পাঙ্গিকের যে কতো রূপ প্রতিষ্ঠাপিত করার যে সব সহজ রীতি বিদ্যমান পৃথিবীর অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে তার অভাব একান্ত ভাবে লক্ষণীয়।

কাহিনীর উপস্থাপন, ঘটনাক্রমের পারস্পরিক আনন্তর্য রক্ষায় ও তাকে একটি সুষ্ঠু পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ায় চলচ্চিত্রে যে বিষয়গুলি মুখ্য, তারমধ্যে 'ক্যামেরা' ও 'সম্পাদনার' কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কেননা বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বহু নিটোল-সুন্দর কাহিনীও চলচ্চিত্রের গ্রন্থনা ও সম্পাদনার অভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। বিখ্যাত পরিচালক পুদভ্‌কিন চলচ্চিত্রে সম্পাদনাকেই অন্যতম রীতি বলে ভূষিত করেছেন। এবং বর্তমানে চলচ্চিত্র যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট আকারে বোঝা গেছে যে, সম্পাদনার চাকত্ব ভিন্ন একটি ছবি শিল্পসুষমায় সার্থক হতে পারে না। চলচ্চিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধে এই যে এই মাধ্যমে প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ বা উত্তম পুরুষ সমস্ত ভাবেই কাহিনীর উপস্থাপনা করা সম্ভব। অনেক পরিচালক আছেন যাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যামেরাকে চরিত্ররূপে ব্যবহার করে সমগ্র কাহিনীর বিবৃতি দিতে চান। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ স্মরণে আসছে যে এই রীতিতে কতগুলি বিশেষ সীমাবদ্ধতার জন্য পরিচালক ওরসন্ ওয়েলস 'দি হার্ট অফ্‌ ডার্কনেস' ছবিটি তোলার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

চলচ্চিত্রের আবেদন সব সময়ে দৃষ্টিবাহী বলে, এর কাহিনীগ্রন্থনে যে আনন্দ (দ্রষ্টার ও স্রষ্টার) তার রসাস্বাদন অন্য কোনো শিল্পরীতিতে একান্ত দুর্লভ। একটি সুখপাঠ্য গল্প পঠনকালে পাঠককে যতোটা কল্পনাশ্রয়ী হতে হয়, চলচ্চিত্র স্রষ্টা (পরিচালক) সেই কাহিনী বিবৃতিতে পাঠকের সেই কল্পনাকে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য উপস্থাপনায় মনোরম করে তোলেন।

কাহিনী উপস্থাপনে চলচ্চিত্রের রীতি একালে যে রূপ পেয়েছে, কয়েকটি বিশিষ্ট ছবির আলোচনায় আমরা তার অভিনবত্ব লক্ষ্য করতে পারবো। টমাস টেনী পরিচালিত হাঙ্গেরিয়ান ছবি 'লেজেণ্ড অন্ দি ট্রেন'-এ সমগ্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে পাঁচজন শ্রমিকের গল্পকথনের মধ্য দিয়ে। কোনো এক সোমবারে তারা তাদের নির্ধারিত ট্রেন ধরতে দেরী করে। যখন তারা ট্রেনের কামরায় পৌছায়, দেখে কোথাও কোনো বসার স্থান নেই। অথচ দীর্ঘ পথ অতিক্রমণের কষ্ট তাদের মনে অস্বস্তির সঞ্চার করে। উপায় না দেখে তারা এক একটি গল্প বলতে শুরু করে—শর্ত, একটি গল্পের বিনিময়ে একটি বসার স্থান। ছবির শেষে দেখা যায় সেই পাঁচজন শ্রমিকই ট্রেনের কামরায় নিজেদের বসার স্থান করে নিয়েছেন। কারখানার এই পাঁচজন শ্রমিকের এই পাঁচটি সুসম্পন্ন ক্ষুদ্র উপাখ্যান

বর্ণিত হয়েছে, তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবন অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে। পরিচালক সব গল্পেই 'ফ্ল্যাসব্যাক' রীতি ব্যবহার করেছেন।

বার্গম্যানের 'দি সেভেন্থ সীল' ছবির কাহিনী গ্রন্থনে এক অদ্ভুত রূপ পরিলক্ষিত হয়। প্লেগ-মহামারীতে আক্রান্ত মধ্যযুগের সুইডেনের একস্থানে এই কাহিনীর বিস্তৃতি। কাহিনীর নায়ক অ্যান্টোনিয়াস এক পরিশ্রান্ত যোদ্ধা, সে সহকারীসহ 'ধর্মযুদ্ধ' শেষে গৃহাভিমুখী। জীবনসত্যের অন্বেষণে যোদ্ধার অনুসন্ধিৎসা তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে—অথচ দুঃখ, হতাশা, মর্ম্মান্তিক দুর্দশা ছাড়া সমগ্র পথে তিনি অন্য কিছুর চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছেন না। কেবলমাত্র পথে পরিভ্রমণরত তিনজন আমুদে যাত্রাদলের মানুষের মধ্যে তিনি যথার্থ আনন্দ, শান্তি, ও শুভ লক্ষণের পরিচয় পেলেন। তাঁর যাত্রাপথেই মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে যার সঙ্গে যোদ্ধা দাবা খেলায় মত্ত হয়েছেন। মৃত্যু এ ছবিতে একটি বিশিষ্ট চরিত্ররূপে আবির্ভূত। খেলায় পরাজিত যোদ্ধা বারবার মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলায় আগ্রহী হয়েছেন, নিজের ভ্রান্তি, জীবনের সত্য খোঁজার ব্যগ্রতায় মৃত্যুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন। ছবির শেষে আমরা দেখি যে যোদ্ধা ও তাঁর বাকী সঙ্গীগণ এক দুর্যোগের মধ্যে 'মৃত্যু'র জালে জড়িয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর হাত ধরে অন্ধকারে কোন্ এক অজানা রাজ্যের পথে চলে যায়। মৃত্যুকে ছবির মধ্যে সশরীরে উপাস্থাপন করে মানুষের জীবন অনুসন্ধিৎসা ও মৃত্যু চেতনার এই যে রূপকে পরিচালক একটা গল্পের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, এই রীতি চলচ্চিত্রে অভিনব সন্দেহ নেই।

রোমান পোলানস্কি পরিচালিত বিখ্যাত পোলিশ্ চিত্র 'নাইফ্ ইন্ দি ওয়াটার'-এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে মাত্র তিনটি চরিত্রকে ঘিরে। শুধু তাই নয়, একটা নৌকার ওপরে স্বামী-স্ত্রী ও জনৈক পথিক সঙ্গীকে কেন্দ্র করে কাহিনীর গ্রন্থনে যে নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে,—তাতে প্রকৃত শিল্প অভিধায় চলচ্চিত্রের শিল্প সম্ভাবনা সুদূর বিস্তৃত হয়েছে। মূল গল্পের শুরু রৌদ্র উদ্ভাসিত নদীর জলে চলমান নৌকার ওপরে—গল্পের শেষও হয় ঘাটে প্রত্যাবর্তনরত সেই নৌকাকে কেন্দ্র করে। কেবল শুরুতে চরিত্রের উপস্থিতি ছিল তিনটি—শেষে আমরা দেখি কেবলমাত্র স্ত্রী একা নৌকায় করে ফিরছে, স্বামী ঘাটে অপেক্ষমান ও পথিক সঙ্গী ফেরার মাঝ পথেই অনুপস্থিত। ছবিটির বিজ্ঞাপনে এক জায়গায় বলা হয়েছিল "The film does not have a moral. The story of the conflict between passengers of the yacht is told as to bring in

the evolution of the characters and not the consequences of the events" অর্থাৎ সিনেমার স্বকীয় মাধ্যমে মূল ঘটনার প্রকাশ ভঙ্গিটাই আসল—এইটাই সিনেমার নিজস্ব টেকনিক্।

চলচ্চিত্রের কাহিনীকথন যে কতো বিচিত্র ও অসাধারণ প্রক্রিয়ায় একটা ঘটনা বা ঘটনাক্রমকে বর্ণনা দিতে সক্ষম তার প্রমাণ ষাট দশকে নির্মিত ফরাসী পরিচালক রবার্ট এনরিকোর 'দি ইন্‌সিডেন্ট এ্যাট দি আউল ক্রিক'। স্বল্প দৈর্ঘের এই ছবিটি আমাদের মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত একটি মানুষের জীবনের শেষ কয়েকটি মিনিটের অনুভূতি ও চিন্তার রাজ্যে নিয়ে গেছে। ফাঁসীর পাটাতনে দণ্ডায়মান মানুষটির মনের বহুমুখী গতির মধ্যে পরিচালক এত সাবলীল ও আশ্চর্য নৈপুণ্যে প্রবেশ করেছেন যে তাতে চরম বিস্মিত হ'তে হয়। আমরা প্রথমেই দেখি লোকটির ফাঁসী হ'ল এক টিলার ওপরে তৈরী সাঁকোর ওপর থেকে। হাত ও পায়ে দড়িবাঁধা অবস্থায় লোকটিকে জলের তলায় তলিয়ে যেতে দেখি আমরা। ক্রমশঃ দেখা যায়, সে তার হাতের বন্ধন কোনোপ্রকারে শিথিল ক'রে জলের ওপরে ভেসে ওঠে। ওপরে অপেক্ষমান রক্ষীরা তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করতে থাকে। সে আবার তলিয়ে যায় জলের তলায়। নিপুণভাবে সাঁতার কেটে, স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, ডাঙায় উঠে সে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী অভি-মুখে ছুটতে থাকে। বন-জঙ্গল পেরিয়ে যখন সে গৃহে পৌছায়, তার স্ত্রী তাকে আলিঙ্গনের জন্য দুবাহু প্রসারিত করে। যে মুহূর্তে তার হাতের সঙ্গে স্ত্রীর হাতের স্পর্শ লাগে আমরা দেখি সেই সাঁকোর ওপর দণ্ডায়মান রক্ষীগণ লোকটিকে গলায় ফাঁস দিয়ে ওপর থেকে হঠাৎ ঝুলিয়ে দেয়। এতক্ষণ আমরা, দর্শকগণ লোকটির যে কার্যবিধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলাম তা একান্তভাবেই তার কল্পনার জগতের এক আশ্চর্যরূপ। ছবির শেষে লোকটির প্রকৃত মৃত্যুতে দর্শকগণ সত্যিই বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ছবিটি এখানেই শেষ হয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে, স্মৃতিবেদনা, বর্তমান ঘটমান-জগৎ, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এ সবই আধুনিককালে চলচ্চিত্রে অত্যন্ত সাবলীলভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে, অথচ মূল কাহিনীকথন থেকে সে ভ্রষ্ট হয় না। যতদূর স্মরণে আসছে বাংলাদেশে 'মেঘ' নামে এই ধরনের একটি ছবি নির্মাণ করেছিলেন উৎপল দত্ত। সমগ্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল একজনের চিন্তাকে কেন্দ্র ক'রে। অথচ বাস্তবে যা ঘটেনি তাকেই কেন্দ্র ক'রে সমগ্র ছবিতে দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে এইবার এই ধরনের একটি কাহিনী লেখা হবে। ছবির নায়কের মুখে আমরা শুনেছিলাম ''এইবার

লিখব দি স্টোরী. অফ এ পারফেক্ট মার্ডার"। অথচ খুনের ঘটনাটিকে নিয়েই ছবিটির কাহিনীর বিস্তার।

বস্তুতঃ যে শিল্প সম্ভাবনা চলচ্চিত্র মাধ্যমের মধ্যে তার জন্মসূত্রেই নিহিত ছিল, তাকে কেন্দ্র ক'রে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, মূর্ত-বিমূর্ত, চেতন-অচেতন, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে কোনো ভাবের, যে কোনো ঘটনাক্রমকে সাজাবার ক্ষমতা আজ চলচ্চিত্রের সহজলভ্য। আর এই রীতিতে 'সম্পাদনাই' হ'লো সিনেমার একমাত্র কৌশল।

চলচ্চিত্র : দৃশ্য-দৃশ্যান্তর

চলচ্চিত্রে আমরা একটি বিষয় অত্যন্ত সহজ ভাবে উপলব্ধি করেছি যে, কোনো ছবি তোলার সময় বিশৃঙ্খলভাবেও Shot নেওয়া যায়, এবং দৃশ্যগুলিকে পুনরায় এক নতুন আনন্তর্যে পুণঃস্থাপন করা যায়, যা মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্বিত। অবশ্য 'বিশৃঙ্খল' বলতে এখানে অর্থহীন এলোমেলো দৃশ্য সংযোজনের কথা বলা হয় নি, পরন্তু এখানে চলচ্চিত্রটি যে ঘটনাকে চিত্রিত করতে চলেছে, তার ক্রমান্বয় অনুশাসন ব্যতিরেকে ছবি তোলার কথাই বলা হচ্ছে। একটি উপন্যাস বা গল্পে যেমন বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে একটি যোগ লক্ষিত হয়, চলচ্চিত্র যে হুবহু সেই ভাবেই ঘটনা উপস্থাপন করবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উপন্যাসে যেটি শেষে পেয়েছি, চলচ্চিত্রে সেটিকে হয়তো সর্বপ্রথম দেখানো যেতে পারে। এখানেই চলচ্চিত্রের নিজস্ব বিধিগত কলাকৌশল প্রয়োগের যথার্থতা। বিশেষতঃ এখানে সম্পাদনাই চলচ্চিত্রের একমাত্র বড় অবলম্বন। আবার এইভাবে যেমন আমরা অপ্রয়োজনীয় স্থানগত পরিবর্তনকে বিভিন্ন চিত্রকল্পের স্বার্থে উপেক্ষা করতে পারি, তেমনি কালগত বিভিন্নতাকেও চলচ্চিত্রের স্বার্থে বাতিল করতে পারি।

ধরা যাক একটি মানুষ একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রলো ও অতিক্রম ক'রলো। আমরা তাকে ঘরের একটি প্রান্তের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখি। এখন সে যদি একটি দৃশ্যের সম্পূর্ণ সময় জুড়ে ঘর অতিক্রম করে ও তারপর অপর একটি ঘরে প্রবেশ করে—চলচ্চিত্রে তা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও বিরক্তিকর লাগে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে একটি ক্ষুদ্র বিষয়কেও ছবিতে অনেকসময় দীর্ঘক্ষণ উপ-স্থাপিত রাখতে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ চলচ্চিত্রের কালগত ব্যবধান অত্যন্ত সীমিত বলেই লোকটিকে প্রথমে একটি ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখেই পরমুহূর্তে তাকে অন্য একটি ঘরে প্রবেশ করতে দেখা আমাদের অযৌক্তিক নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ঘর অতিক্রান্তের মধ্যবর্তী সময়টুকু চলচ্চিত্রে মাত্র দুটি উপস্থাপনায়ই বোঝানো সম্ভব। এবং এখানে মূল ছন্দ বজায় রেখে এই ব্যাপারটি চলচ্চিত্রের গতিকে ত্বরান্বিত করে। উপরন্তু চলচ্চিত্র একটি স্থান ও কালের ক্লান্তিকর পরিবর্তনকে বর্জন করতে সক্ষম। অনুরূপ ভাবে ধরা যাক একটি মানুষ শয়ন করতে যাচ্ছে।

লোকটি শয্যার নিকটে গেল। এখানে Long Shot অথবা Mid Shot-এর সমাপ্তির মাধ্যমে cut ক'রে পার্শ্ববর্তী একটি চেয়ারের ক্লোজাপ নেওয়া হ'ল, যার চলচ্চিত্রগত ভাষা হবে Camera ends the L S. or M. S. and cut to C. U. of a beside chair. পরিধেয় বস্ত্রের বিভিন্ন খণ্ডাংশ চেয়ারে দৃশ্য-কোণ বহির্ভূত একটি মানুষের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। অতঃপর একটি হাত শয্যার পরিচ্ছদে টান দিল। শয্যার পার্শ্ববর্তী আলো: একটি হাত এখন দৃশ্যের ফ্রেমের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং আলো নেভালো। আমরা যা ঘটল তা পরিষ্কার বুঝলাম। এখানে কার্যকারণ সম্পর্কিত গতির সমগ্রতা যথাযথ উপলব্ধি করা গেল বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও কার্যবিধির দীর্ঘস্থায়িত্বকে—গতির অপ্রয়োজনীয় অংশকে বর্জন ক'রে সংক্ষিপ্ত করা হ'ল। চলচ্চিত্রে দেখাবার সময় বিভিন্ন Shot-এ কেবলমাত্র লোকটি বিছানার নিকট গেল, পরিধেয় বস্ত্র চেয়ারে উপস্থাপন করলো, চাদর টানল, আলো নেভালো; এই পর্যন্ত দেখলেই যথেষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন Shotএ প্রতিটি কার্যের সময় সংক্ষেপই চলচ্চিত্রের গতির নিয়ামক।

এই ধরনের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ক্যামেরার গমনাগমন হয়ত যাঁরা অতি অল্প ছবি দেখেন তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট উপলব্ধির বিষয় নাও হতে পারে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে দর্শকরা, যাঁরা গ্রিফিথের চলচ্চিত্রে নতুন বিষয় বিন্যাসের পরিমিত ব্যবহারের ফলশ্রুতিকে প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের কাছে তা তখন সহজ উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় নি।

চলচ্চিত্রে সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে, আমরা কোনো বিশেষ মুহূর্তের ওপর স্থিত হতে পারি, তার ওপর দীর্ঘক্ষণ বিচরণ করতে পারি এবং অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনে উক্ত সময়কে পুনর্বার উপস্থাপন করতে পারি। উক্ত বিষয়ের বিশুদ্ধ নিদর্শন পাওয়া যায় আইজেনস্টাইনের October ছবিতে। অস্থায়ী শাসকের আদেশে নিভানদীর ব্রীজ দু'ভাগ করার দৃশ্য এস্থলে স্মরণযোগ্য। ব্রীজ উঠে গেল, মেসিনগানের গুলি ব্রীজ অতিক্রম-প্রয়াসী একদল জনতাকে বাধা দিচ্ছে, ব্রীজ উঠছে, একটি মৃত ঘোড়া অপরদিকের স্তম্ভদণ্ডের প্রান্ত ভাগে ঝুলছে, অপরপ্রান্তে একটি নারীর প্রবাহিত-প্রায় চুলের রাশি দোদুল্যমান। এখানে দুটি অংশ: তাদের মর্মস্পর্শী রূপকল্পগুলি উত্থিত হয়েছে—অসহ্য, অবিরাম। তাদের গতির পুণরুক্তি ঘটেছে বারংবার, যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘোড়া ও মৃতদেহের পতন ঘটছে এবং এই চিত্রকল্পের বারবার একত্রীকরণ ঘটেছে (Montage) সহসা অপরিবর্তনীয় পৃথকীকরণের সম্পূর্ণতার জন্য। এখানে

রূপকল্পগুলির পুণরুক্তি ঘটেছে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে গঠিত আঙ্গিকে, যা যুগপৎ ভাবে সুবর্ণিত রূপ ও নির্মিতির মাধ্যমে উক্তদৃশ্যটির আধেয় বস্তুসমূহকে কাব্যিক আবেগময়তার পর্যায়ে উন্নীত করতে ব্যাপৃত।

আরও নীরস দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে হিচ্‌ককের 'The Lodger' ছবিতে, যেখানে গুপ্তঘাতক সোনালী কেশ বিশিষ্ট নর্তকীদের এলোমেলো ভাবে আঘাত করছে এবং ছুরিকার দ্বারা জনৈক নর্তকীকে হত্যার আগে হত্যাশালার আলো উল্টে দিল। এখানে ক্লোজ-আপে একটি হাত প্রথমে দেখা গেল; হাতটি আলো নেভাচ্ছে এবং তারপরেব আলো লণ্ড্‌ভণ্ড প্রসারিত ও দৃশ্যমান। আলো নেভাতে যতটুকু সময় লাগে এখানে তদপেক্ষা অধিকক্ষণ আলো নেভাবার ঘটনাটি উপস্থাপনা করা হয়েছে। এ স্থলে হত্যার ঘটনাটিকে অতিনাট্যিক ব্যঞ্জনায় উন্নীত করার প্রয়াসেই ঐ সময়টুকুকে একাধিকবার প্রতীয়মান করা হয়েছে। বাস্তব জগতের সময় ও চলচ্চিত্রে প্রতিভাসিত সময়ের পার্থক্য এইটুকু যে চলচ্চিত্রে সময়ের যে বিকাশকে দেখানো হয় তা একান্তভাবে চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তৈরী। এখানে সময় স্বয়ং নমনীয় এবং এর যথেচ্ছ গঠন আমাদের স্বকীয় প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল।

রঙ্গমঞ্চ দীর্ঘ বছরের কালক্ষেপণকে সঙ্কুচিত করতে পাবে পর্দা উত্তোলন ও অবনমনের দশ মিনিটের অবকাশে, অথবা Stageএর এক অংশে আলো নিভিয়ে অপর একটি অংশে আলো প্রজ্বলিত করেও রঙ্গমঞ্চে সময় অতিক্রান্ত হবার ঘটনা দেখানো হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রে বিরামচিহ্ন সন্নিবেশের অত্যন্ত সহজ প্রকৃষ্ট উপায় আছে। যেমন ফেড আউট (F. O) ফেড ইন (F. I), অর্থাৎ একটি দৃশ্যের ক্রমিক অদৃশ্য হওয়া এবং অন্ধকারের বুক থেকে এর ক্রমিক উপস্থিতি। দৃশ্যের এই ধরনের বিলীন হওয়া ও তার পুণরাবির্ভাব ন্যূনতম আধমিনিটের অনধিক যে কোনো গতিতে দেখানো হয়। এ ছাড়াও আছে Mix অথবা (lap dissolve), অর্থাৎ একটি দৃশ্য সমগ্রের মন্থর মিশ্রণ ও অপর একটি নতুন দৃশ্যে তার সূচনা। যেখানে একটি দৃশ্যকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার প্রয়োজন, সে স্থলে চলচ্চিত্রকার যত দ্রুত সম্ভব তদনুসারে দৃশ্যটিকে বিলোপ করতে পারেন, দৃশ্যটিকে বিদীর্ণ করতে পারেন অপর এক নতুন দৃশ্যের আত্মপ্রকাশে, যেখানে ঐ নতুন দৃশ্যটি উপস্থিত হচ্ছে ফ্রেমের পার্শ্ব, উপরিভাগ অথবা নিম্ন ভাগ থেকে।

প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে যে, চলচ্চিত্রের দর্শকগণ বর্তমানে পর্দায়

প্রতিফলিত সময়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হ'য়ে গেছে যে, এখন আর ঘটনার পর্যায়ক্রমের ক্ষেত্রে সতর্ক সুনির্মিতি ছাড়া বিরামচিহ্ন সন্নিবেশের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। এই ব্যাপারটি টনী রিচার্ডসন পরিচালিত 'Tom Jones' ছবির সর্বত্র অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয়েছে যেখানে চলচ্চিত্রগত অভিনব রীতি আখ্যানের ঘটনাগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। চলচ্চিত্রে আবার অনেক সময় 'Flash-back' পদ্ধতির মাধ্যমেও দৃশ্য দৃশ্যান্তরের সময় অতিবাহনের ব্যাপার দেখানো হয়।

দৃশ্যভেদে সময় অতিক্রান্তের অতি চমৎকার ও সুষ্ঠু নিদর্শন পাওয়া যাবে অজয় করের 'কাঁচকাটা হীরে' ছবিটির একটি অংশে। চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন মাত্র তিনটি দৃশ্যের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় অতিবাহনের এক উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। ছবির নায়ক সুব্রত (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে অন্তরঙ্গ বন্ধু শচীনের (শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়) বাড়ীতে দেখা করতে গেছে। শচীনকে বাড়ী ফেরার পথেই সে গাড়ীতে তুলে নেয়। বাড়ীতে তখন শচীনের মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। বিভিন্ন কথার পর প্রসঙ্গক্রমে শচীনের ভগ্নীর অনুপস্থিতির সম্বন্ধে নায়ক প্রশ্ন ক'রে জানতে পারে যে, শচীনের ভগ্নী অফিস থেকে তখনও ফেরেনি। হঠাৎ তখন বাইরে Impatient কড়া নাড়ার শব্দ। শচীনের বোন এসেছে ভেবে নায়ক তাকে চমক্ দেওয়ার জন্য দরজা খুলে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। দরজার সমনে ভীড়করা শচীনের পাড়ার একদল ছোট ছেলে খেলার প্রাঙ্গণ থেকে নায়ককে তার সুবৃহৎ গাড়ী অন্য কোথাও সরিয়ে রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছে। নায়ক তখন ছেলেদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে,—"গাড়ীটা কোথায় রাখা যায় বলতো" এই কথাটি বলে ছেলেদের হাতের ফুটবলটি বহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করে। দর্শকের চোখ সমগ্র Screen জুড়ে বলটির গতির সঙ্গে যথাক্রমে ওপরে ও নীচে নামতে থাকে। ঠিক এই মুহূর্তেই বলটি মাটি স্পর্শের পূর্বেই দৃশ্যের ও প্রসঙ্গের আমূল পরিবর্তন ঘটে। আমরা দেখতে পাই ক্যামেরা এক বিস্তৃত নদীর পাড় থেকে ধীরে ধীরে pan ক'রে (from L to R) নায়ক ও তৎপার্শ্ববর্তী উপবিষ্টা এক স্ত্রীলোকের প্রতি নিবদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য এই স্ত্রীলোকটি শচীনের বোন উমা এবং আমরা উভয়ের সংক্ষিপ্ত সংলাপে যা শুনি তার মাধ্যমে তারা উভয়ে যে একে অপরের কাছে অত্যন্ত নিবিড়তর হ'য়ে পড়েছে (হৃদয় ও মনের দিক দিয়ে) তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে

পারি। অথচ মাত্র তিনটি দৃশ্য : নায়কের শচীনের বাড়ী যাওয়া, ঊর্ধ্বে বল নিক্ষেপ করা ও নদীর নির্জন তীরে তাদের পরস্পরকে (নায়ক ও নায়িকা) একান্ত কাছাকাছি দেখানোর মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্যকার তিনটি দীর্ঘ বিলম্বিত ঘটনার সময়ানুক্রমকে অত্যন্ত সীমিত অথচ চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে আরোপিত দৃশ্যভেদে মনোরম ক'রে তুলেছেন। জনৈক ইংরেজ সমালোচক চলচ্চিত্রে দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরের আলোচনায় বলেছেন, "All, in fac‘ that 'montage' means 'editing,' the arrangements of sh ts." ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় একস্থানে লিখেছেন, "অনেকদিনের ঘটনা কয়েক মিনিটে দ্রুত বর্ণনার হলিউডী নাম 'মনতাজ'—একটার ওপর আর একটা হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ে।" অর্থাৎ একই দৃশ্যে পরপর বিভিন্ন চিত্রকল্পের পরস্পর একত্রীকরণ। এক্ষেত্রে দৃশ্য পরিবর্তনের প্রয়োজন আশু নয়। কারণ দৃশ্যের ক্রমিক সূচনার (F. I) মাধ্যমে একটি দৃশ্যের ক্রমিক উপস্থাপনার পর, তারই ওপর Double exposure, Super-imposition এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যাংশ সমগ্র Screen জুড়ে গায়ে গায়ে বিচরণ করতে থাকে।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর যাতায়াতের ক্ষেত্রে অনেকে Dissolve এর পক্ষপাতী আবার কেউ Cut এর মাধ্যমেও অন্য দৃশ্য সংস্থানে গমন করেন। Dissolve এর পর অপর একটি দৃশ্য আরম্ভে যে সময় অতিবাহিত হয় Cut তদপেক্ষা দ্রুত ভিন্ন দৃশ্য পটভূমিকায় উপস্থিত হ'তে পারে। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্বপ্ননিয়ে' ছবির সূচনায় Cut এর মাধ্যমে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। ছবির তিনটি মুখ্য চরিত্র—মনিদা (চারুপ্রকাশ ঘোষ) বিজন (অরুণ মুখোপাধ্যায়) ও সুধীর (রবি ঘোষ) কয়েকটি ছুটির দিন উপভোগের অভিলাষে শহরের ঘর্মক্লিন্ন, যান্ত্রিক পরিবেশ ছেড়ে 'মণিদা'দের স্বগ্রাম 'তেলেনাপোতা'র অভিমুখে রওনা হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন Shot-এ অভিযানের জন্য চরিত্রত্রয়ের তোড়জোড়, রাস্তায় অপেক্ষমান ট্যাক্সি, ট্যাক্সির দ্রুতগতি, রাস্তায় ছুটন্ত বস্তুসমূহ (গাড়ীর গতির সমপর্যায়ে) পড়ন্ত বেলায় গ্রামের পথে অগ্রসরমান মন্থর গতি গরুর গাড়ীর মধ্যে মণিদা, বিজন ও সুধীরকে দেখানো হয়েছে। শহর থেকে কোনো গ্রামে পৌঁছতে বাস্তবে যে সময়টুকু লাগে ছবিতে তদপেক্ষা অনেক কম সময়ে বিষয়টিকে অভিব্যক্ত করা হয়েছে এবং এখানে Mix, Dissolve, F. O, F. I-এর পরিবর্তে cut এর প্রয়োগ অধিক সার্থক। প্রসঙ্গত একই কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত মৃণাল সেনের হিন্দীচিত্র

'খণ্ডহর'-এর সূচনা দৃশ্য স্মরণযোগ্য।

অনেক ছবির দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে অনেক সময় আশ্চর্য গতি লক্ষ করা যায়। এগিল হোমসেন পরিচালিত একটি সুইডিশ ছবি 'The time of Desire'এ এই ধরণের একটি চমৎকার Sequence আছে। একটি লোক জঙ্গলের ডোবায় স্নানরতা দুটি স্ত্রীলোকের গতিবিধিকে অতি সন্তর্পণে লক্ষ্য রাখছে। ক্যামেরা লোকটির ঘূর্ণায়মান চোখের একটি বড় ক্লোজ-আপ্ নিল যা একটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বিলিয়ার্ড বলে পরিণত হ'ল। এবং এর পরই ক্যামেরা বিলিয়ার্ড বল থেকে পিছনে সরে এসে একটি বিলিয়ার্ড খেলার কক্ষকে আমাদের সামনে প্রতিভাসিত করলো যেখানে দেখা গেল পূর্বোক্ত লোকটি তার সঙ্গীদের কাছে তার প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে।

এইভাবে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে গমন করার যে সুবিধা চলচ্চিত্রের মধ্যে বিদ্যমান, অন্যকোন শিল্প আঙ্গিকে তা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে যখন আমরা কোনো ঘটনা বা কাহিনীর ক্রমাগ্রসরতা অনুধাবন করি সেখানে আমাদের উপলব্ধির প্রধান সহায়ক হয় লেখকের বিবৃতি ও প্রসঙ্গের মধ্যকার সূক্ষ্ম অন্বয়। কিন্তু চলচ্চিত্রে যখন এক দীর্ঘ-বিলম্বিত কাহিনী বা ঘটনাকে প্রতিফলিত হ'তে দেখি তখন উক্ত দীর্ঘ বিস্তারিত ঘটনাটি চলচ্চিত্রে বেশ কয়েকটি সুষ্ঠু দৃশ্য-পারম্পর্যে বিভক্ত হ'য়ে এক নবরূপ লাভ করে। অবশ্য এক্ষেত্রে সর্বদাই চলচ্চিত্রকারকে ঘটনার পারম্পর্যের সঙ্গে অন্বিত পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্যমান ছবির মধ্যকার অবিচ্ছিন্নতা (conti-nuity) রক্ষা করতে হয়। ঘটনা বিবৃতির সময় এমন কোনো অসংলগ্ন দৃশ্য সংযোজন উচিত নয়, যা মূল বিষয় উপলব্ধির পরিপন্থী। কিন্তু এত সত্ত্বেও কোনো ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক যেমন তাকে বিভিন্ন Details এ রূপ দেন, সেই একই ঘটনাকে বর্ণনার (Portray) সময় পরিচালক লেখকের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনাকে অতিক্রম করেও অত্যন্ত কম সময়ে এক ঘনপিনদ্ধ রূপ নির্মিতি গঠন করেন এবং যা লেখককৃত দীর্ঘায়িত কথনের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম ও উন্নত হয়। (Subtle and more artistic)। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, রবীন্দ্র-নাথের 'নষ্টনীড়' (চারুলতা)। 'নষ্টনীড়' গল্পের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের সর্বশেষ কয়েকটি পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ভূপতির গৃহ থেকে অমলের আকস্মিক চলে যাওয়ার পর চারুর মনে অমলের প্রতি প্রেমজনিত যে অসীম বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তজ্জনিত চারুর আচার ব্যবহারে ভূপতির যে সন্দেহ ও হৃদয়ে

ব্যথার উদ্ভব, তাকে রূপ দিয়েছেন এইভাবে : "থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলই এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চারু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল। একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্যভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বেদনা কোনোমতে ছাড়িল না।" এবং গল্পের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে, মৈশুরের একটি কাগজের সম্পাদকরূপে ভূপতি যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত, সেইস্থানে আমরা দেখি চারু বলছে : "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেও না।" এরপর একেবারে শেষ পংক্তির মধ্যে ভূপতি বলছে : "না, সে আমি পারিব না।" এর পরের বর্ণনা এইরূপ : "মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুষ্ক সাদা হইয়া গেল, চারু মুঠো করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল। তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, 'চলো চারু আমার সঙ্গেই চলো।' চারু বলিল, 'না থাক'। মূল গল্প এইখানেই শেষ হয়েছে। অথচ 'চারুলতা' ছবির শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি চারু ঘরের মধ্যে খাটের ওপর উপুড় হ'য়ে অমলের রেখে যাওয়া চিঠি নিয়ে কাঁদছে। (M. C. Shot) বাইরে অনতি-দূরে ভূপতি তা লক্ষ্য করে। এর পরেই ভূপতির ঘোড়ার গাড়ী সেই বিষন্ন ভোরে কুয়াশাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম ক'রে চলে যায়, গাড়ীর মধ্যে close-up-এ অশ্রুমোচনরত ভূপতি, cut ক'রে দরজায় ভূপতির করাঘাত শোনা যায়, চারু দরজা খুলে ভেতরে আসতে বলে, এবং এর পরই চারু ও ভূপতিকে Long shot-এ এবং বাড়ীর চাকরকে চায়ের কাপ হাতে Freeze এর মাধ্যমে দেখানো হয়। নেপথ্যে শোনা যায় : "চারু তোমার বড় একা লাগে না।" ছবি এই খানেই শেষ। রবীন্দ্রনাথ ভূপতির মনোবেদনাকে যথাক্রমে অষ্টাদশ ও বিংশ পরিচ্ছেদে যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, তার চেয়ে অনেক কম অভি-ব্যক্তিতে মাত্র দু'তিনটি সৌন্দর্য সুষমামণ্ডিত দৃশ্য ভেদে পরিচালক আরও সুষ্ঠু-ভাবে দৃশ্যটি প্রতিফলিত করেছেন। এইখানেই চলচ্চিত্রের মনোরম দৃশ্য উপস্থাপনের একান্ত উপযোগিতা আর এইখানেই শিল্পরূপে চলচ্চিত্রের চরমতম স্বীকৃতি।

চলচ্চিত্রের ক্যামেরা ঃ নন্দন ও বক্তব্যের প্রকাশ

সব শিল্পেই শিল্পীর একাগ্রতা বক্তব্য উপস্থাপনের অভিনবত্ব। যিনি চিত্রকর, একটি তুলির আভাসে তিনি তাঁর মনের ভাবকে ছন্দায়িত করেন ক্যানভাসে। যিনি গায়ক, যিনি ভাস্কর তাঁদেরও লক্ষ্য এক — মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন। চলচ্চিত্রে বিষয়বস্তুকে প্রতিমায়িত করবার, তার রূপকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করবার একমাত্র অবলম্বন ক্যামেরা। তুলি, ব্রাস, পেনসিল ইত্যাদি ছাড়া যেমন ছবি আঁকা যায় না, উপযুক্ত সরঞ্জাম না থাকলে যেমন মূর্তি গড়া যায় না, চলচ্চিত্রেও তেমনি ক্যামেরাকে বাদ দিয়ে কোনো রূপ নির্মিতি সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রের একটি নির্দিষ্ট ফ্রেম আছে। চলচ্চিত্রকার সেই সীমায়িত গণ্ডীর মধ্যে অবিস্মরণীয় খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত গড়ে তোলেন যা একটি পরিপূর্ণ বক্তব্যবাহী শিল্পরূপের জন্ম দেয়। কারণ কথাটা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিরকাল মনে রাখতে হবে যে ' The film is after all, a collection of camera-angles consciously selected and purposely limited within the frame. ,

এবং এক্ষেত্রে একটি ছবির নান্দনিক অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে একমাত্র পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। আর তার বক্তব্য রূপায়ণে তাঁকে সাহায্য করেন ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, শিল্প নির্দেশক ইত্যাদি কলাকুশলীগণ। কিন্তু একটি দৃশ্য উপস্থাপনায় ক্যামেরা বস্তু বা চরিত্র থকে কতোটা দূরত্বে স্থাপিত হবে তার সবকিছু নির্ভর করে পরিচালকের ওপর। এবং এস্থলে প্রতিটি দৃশ্য গ্রহণের সময় প্রতিটি দৃশ্যকেই টেলিফটো শট, লঙ শট, মিড শট, ক্লোজ আপ, মাইক্রোসকোপিক শট, ট্র্যাকিং শট, জুম শট ইত্যাদি নানান চলচ্চিত্রিক অভিধায় বিভক্ত ক'রে রাখা হয়। তাই একটি ছবি নির্মাণের প্রাথমিক অবস্থাতেই চিত্রনাট্যের প্রয়োজন হয় এবং ঐ চিত্রনাট্যের মধ্যেই সর্বপ্রকার দৃশ্য-বিভাজন করা থাকে। কোনো দৃশ্য গ্রহণের প্রাক্কালে ক্যামেরাকে হয় Tilt অর্থাৎ ওপরে এবং নিচে সরতে হয় অথবা pan অর্থাৎ বাঁ দিক থেকে ডানপাশে বা ডানদিক থেকে বাঁ পাশে চলতে হবে, আবার কোথাও ক্রেনের সাহায্যে দ্রুত গতিতে ছুটে চলতে হয় বা Track

অর্থাৎ চাকাচালিত যন্ত্রের ওপরে থাকাকালীন এগোতো বা পিছোতে হবে। মোটামুটি উল্লিখিত ক্রিয়াগুলো চলচ্চিত্র নির্মাণের গতি সম্পর্কিত প্রাথমিক মূল্যবান যান্ত্রিক বিধি। এই বিধি স্বতন্ত্র ব্যবহারে প্রত্যেক স্রষ্টার স্বকীয় শিল্পধারা গড়ে ওঠে। কিন্তু ক্যামেরার ব্যবহারিক জ্ঞানে এই বিধি, যা বিশেষভাবেই সিনেমার নিজস্ব শিল্পসূত্র তাকে অস্বীকার বা লঙ্ঘন করে একটি দৃশ্যও চিত্রায়িত সম্ভব নয়। সুতরাং ক্যামেরা যে চলচ্চিত্রের জন্মসূত্রেই এই শিল্পের জনকের ভূমিকা নিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সংশয়ই থাকতে পারে না। এখন এই ক্যামেরা ও এর ক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক বৈভব চলচ্চিত্রের নন্দনে কি অবদানে স্মরণীয় তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

একটি ছবির বক্তব্য প্রতিপাদনের ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্র শিল্পে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণের ওপর সব নির্ভর করে। চলচ্চিত্রশিল্পে দর্শক আর ক্যামেরার গতির মধ্যে একটা হৃদ্যতা গড়ে ওঠা তাই একান্ত প্রয়োজন। এ শিল্পে দর্শক একস্থানে উপবিষ্ট থাকেন—ক্যামেরাই তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যায়। নিপুণ চলচ্চিত্রকারের হাতে ক্যামেরা চিত্রকরের তুলির মতোই ব্যবহৃত হতে পারে। দর্শকগণ স্থানান্তরে না গিয়েও ক্যামেরার গতির অনুকূলে না দেখা অগম্য স্থানের রোমাঞ্চ অনুভূতি পেতে পারেন। পরিচালকের মনের কোঠায় একটি কাহিনী যে রূপ নেয়, ক্যামেরাও ঠিক সেইভাবে বস্তুকে দেখে এবং পরিচালকের ইঙ্গিত অনুযায়ী দর্শকদের সেই কাহিনীর সঙ্গে একাত্মতা ঘটিয়ে দেয়। চলচ্চিত্রে ক্যামেরা কখনো দর্শক, কখনো কাহিনীকার, কখনো উত্তমপুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃশ্যবিন্যাসের (composition) মাধ্যমে অনেক জটিল, মনস্তত্ত্বমূলক মুহূর্ত চলচ্চিত্রে দর্শকদের চরম পুলকিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মুরনোর 'The Last Laugh' ছবিটির কথা উল্লেখ করা যায়। ছবিটি একটি নির্বাক জার্মান চিত্রের অবিস্মরণীয় শিল্পনিদর্শন রূপে সিনেমার ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। ছবিটিকে জার্মানক্লাসিক চলচ্চিত্রের অন্যতম রূপে গণ্য করা হয়। ছবিটি গড়ে উঠেছে একটি বড় হোটেলের দ্বাররক্ষার বেদনা, হতাশা, আনন্দকে ঘিরে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরিচালক কোনো Title যুক্ত না করেও অনায়াসে তাঁর গল্পকে অভিনব ভাবে বলে গেলেন। Title না থাকাতেও উক্ত দ্বাররক্ষার

বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে দর্শকদের অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠার পথে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। এখানে ক্যামেরার অসাধারণ দৃশ্যবিন্যাস মূল ঘটনাটিকে দর্শকদের কাছে অনুপম ভাবে উপস্থিত করেছে। ছবিটিতে ক্যামেরার কাজ বহুলাংশে Subjective.

চলচ্চিত্র যেহেতু খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ও মুহূর্তের ব্যঞ্জনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তাই চলচ্চিত্রে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, তার স্থিতি ও গতি নিয়ন্ত্রিত হয় পরিচালকের সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে। এ ছাড়া ছবিতে যে চরিত্রকে পরিচালক চিত্রিত করেন, তার বিভিন্ন অনুভূতি, বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ (Action)—এর মুড বোঝাতে অনেক সময় ক্যামেরার ফোকাসিং—এর তারতম্যও ঘটানো হয়। প্রেম, বেদনা, বোঝাতে সফট ফোকাস, নিকটের মানুষ দূরের প্রতিপন্ন করার জন্য ডিফারেনশিয়াল ফোকাস ও দুটি বিভিন্ন মুড বা দুটি পৃথক চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বকে একসঙ্গে একই ফ্রেমে সমান গুরুত্বে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে ডীপ ফোকাস ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যের কোনো বস্তু ও চরিত্রের কাজের বর্ণনার সঙ্গে চলচ্চিত্রের এই ডীপ ফোকাসের একটা সাদৃশ্য দেখানো যায়। লেখক যেখানে অনেক সময় একই সঙ্গে পাঠকবর্গকে তাঁর ঈপ্সিত দুটি মুখ্য চরিত্রের দ্বন্দ্বমূলক কাজের বর্ণনা চিত্রের সঙ্গে একাত্ম করতে চাইছেন, সেই পর্যায়ের লিখিত বর্ণনা অর্থাৎ verbal Image তাকে অনেকসময় একই দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রের ফ্রেমে ধরা যায় এবং এক্ষেত্রে একমাত্র ডীপ ফোকাসেই এটি সবচেয়ে বেশী উপযুক্তভাবে দেখানো সম্ভব। খুব একটা সহজ উদাহরণ উল্লেখ করলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের একস্থানে বর্ণনা দিয়েছেন "নির্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন ঝিন করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়ায় ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া একজন যুবা পুরুষ নভেল পড়িতেছেন, এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য দেখিতেছেন।"

(দ্বিতীয় খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

এই বর্ণনাটিকে চলচ্চিত্রে ক্যামেরার Deep Focus—এ হুবহু চিত্রিত

করা যায়। অরূপ গুহঠাকুরতা পরিচালিত বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ছবি 'বেনারসী'তে এই ধরনের একটি দৃশ্যবিন্যাস আছে যেখানে বাঈজী বেনারসী এক অবসর মুহূর্তে তার ঘরের জানলা দিয়ে পাশের বাড়ীতে ক্রীড়ারত এক মা ও শিশুর দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ক্যামেরা একটু উপরের এ্যাঙ্গেল থেকে একই ফ্রেমে ও সমান ফোকাসের মাধ্যে (Deep ফোকাস) বেনারসী ও ঐ মা ও ছেলেকে নিবদ্ধ করেছে। বেনারসীর অতৃপ্ত নারী হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে এই একটি শট কম্পোজিশনের মাধ্যমে প্রতিভাসিত হয়েছে। প্রথম প্রথম পরিচালকগণ সফট ফোকাসের মাধ্যমে রমণীয় মুখচ্ছবির লাবণ্যকে বেশীমাত্রায় ফুটিয়ে তুলতেন। এখন সফট ফোকাস ব্যবহৃত হয় রোমান্টিক চরিত্র বা ধর্মমূলক পবিত্র কাহিনীর প্রধান প্রধান চরিত্রেব অলৌকিক দ্যুতি প্রস্ফুটনে।

প্রয়োজনে ক্যামেরা এক বা একাধিক অন্তর্বর্তী দৃশ্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত সঞ্চরণ করতে পারে। সত্যজিৎ রায়ের দেবী ছবিতে একটি পর্যায়-ক্রম (Seauence) আছে, তার শেষে দ্যাখা যায় তরুণী স্ত্রী দয়া প্রবাসে—পাঠরত তার স্বামীর কথা চিন্তা করছে। দয়ার মুখ বিস্তীর্ণ জলরাশির একটি দৃশ্যে মিশে (Dissolve) যায়, ক্যামেরা জলের ওপর প্যান করে কিছুদূরে একটি পালতোলা নৌকার প্রতি নিবদ্ধ হয়, এর পর কাট-এর মাধ্যমে ঠিক পরবর্তী দৃশ্যেই দ্যাখা যায় দয়ার স্বামী উমাপ্রসাদ ঐ নৌকায় করে দয়াকে দ্যাখার জন্য আসছে।

রুশ পরিচালকগণ মন্টাজের বিখ্যাত যুগে ক্যামেরার গতিকে যতোটা পারতেন এড়িয়ে চলতেন। কেননা, কথিত আছে, তাঁরা দর্শকদের ক্যামেরার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করার পক্ষপাতী ছিলেন। কেননা সেই যুগে ক্যামেরার অবাধ বিচরণ সহজসাধ্য নিয়মিত ব্যাপার ছিল না। আজকের যুগে চলচ্চিত্রে ক্যামেরার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্রুতগতি সম্ভব এবং দর্শকগণও ক্যামেরার অদ্ভুত সচলতাকে সহজসাধ্য রূপে মেনে নিয়েছেন এবং যেখানে এর ব্যতিক্রম ঘটে সেইখানেই দর্শকদের মনে একটি কৃত্রিম ধারণার জন্ম হয়, যেমন জাপানী পরিচালক ওজু'র (Ozu) Late Autumn ও ইটালীয় পরিচালক ভিসকন্তির 'The Leopard' এই দুটি ছবির নাম উল্লেখ করা যায়, যেখানে ক্যামেরার স্বচ্ছন্দ গতিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে।

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে মন্থর ও শ্লথ গতিতে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার মাধ্যমে পরিচালকের বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি ছবির শিল্পগত মুডও যে তৈরী হতে পারে, সেকথা স্বীকার্য।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যের পরিবর্তনে ক্যামেরার সচল দৃষ্টিকোণ (continuous movement) অনেক ক্ষেত্রে ছবিতে আবেগধর্মী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে যা সাধারণতঃ কাট্‌-এর মাধ্যমে সবসময় অনুভূত হয় না। মার্সেল কামু পরিচালিত পুরস্কারপ্রাপ্ত ফরাসী চিত্র 'Black Orpheus'—এর একেবারে শেষ পর্বে ক্যামেরা যখন প্রেমিক-প্রেমিকার বিষণ্ণ নৈতিকতা, পাহাড়ের ঢালে তাদের মৃত্যুর মুহূর্তকে ছেড়ে ওপরের দিকে ধীরে ধীরে pan করে তখন রিও অঞ্চলের আকাশ পর্বত সমুদ্র ছবির সমগ্র ফ্রেমে সেইস্থানের নিত্য সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছে। আন্তোনিওনির বিশ্বখ্যাত ছবি avventura—এর প্রথম পর্বে, ক্যামেরা একটি দ্বীপে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া একটি মেয়ের সন্ধানে কতকগুলি দ্রুত চলমান মানুষের বহু উর্দ্ধে সরে যায়—আবার ছবির শেষ দিকে আমরা অবিশ্বস্ত প্রেমিক ও বিশ্বাসলুপ্ত বিষণ্ণ প্রেমিকার ওপর থেকে অন্যত্র দৃষ্টি রাখি—মানুষের শক্তিসামার, তার দুর্বলতার অনুশীলনে পর্দার বুকে যখন পুনরায় চোখ রাখি, দেখা যায় বরফে আবৃত পাহাড়, একটি নির্জন টিলার ওপরে ছুটে এসে কৌণিক ভাবে নায়ক ও নায়িকা উপবেশন করে। এই সব ক্ষেত্রেই অবিচ্ছিন্ন Panning এর প্রতিটি পর্যায়ক্রমে এই উপলব্ধিই দর্শকদের দিয়েছে যে Here is this there is that-so different,, yet they belong to the same world. এখানে panning যে ব্যঞ্জনা এনেছে ক্যামেরার কাট্‌-এ তা দুর্লভ।

আবার বিভিন্ন উঁচু ও নীচু থেকে ক্যামেরার কৌণিক উপস্থাপনা ও উপযুক্ত দৃশ্য গ্রহণ যে ছবিতে কতো গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে তার অনেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ বহু শিল্প সম্পন্ন ছবিতে ছড়িয়ে আছে। কেবল কৌণিক উপস্থাপনা নয়, অনেক ক্ষেত্রে বহু উঁচু ও নীচু দূরত্বে গৃহীত দৃশ্যসজ্জা ছবিতে অসাধারণ মুহূর্ত গড়ে তুলতে পারে। একটি সুন্দর উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। সার্ত্রের বিখ্যাত নাটক 'Altona'-র সুন্দর চলচ্চিত্ররূপ ডি সিকার 'The condemned of Altona-র শেষ দৃশ্য পর্বটি

অপূর্ব ব্যঞ্জনায় চিহ্নিত হয়ে আছে। ক্যান্সার রোগাক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী পিতা ও উন্মত্ত মস্তিষ্ক পুত্র নিজেদের দীর্ঘ দিনের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে, উভয়েই চরম উত্তেজনায় পৌঁছে নিজেদের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মানসিক বিকৃত পুত্র তার ধনী পিতার কথায় ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে নিজে পিতাকে জড়িয়ে ধরে দেড়শো ফিট উঁচু একটি জাহাজের ক্রেনের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করে। এখানে ক্যামেরা এই মর্মান্তিক দৃশ্যটিকে পিতা ও পুত্রের দুর্ঘটনার মূল উৎস স্থান থেকে ফ্রেমে আবদ্ধ করেছে। দেড়শো ফিট উঁচু ক্রেন থেকে যথাযথ-ভাবে গৃহীত এই দৃশ্যে নীচের জাহাজ-ঘাটার মানুষগুলোর চলমান দৃশ্যকল্প (Image) ঠিক physical reality তে যতোখানি নিগূঢ় দৃষ্টি গ্রাহ্যতায় ধরা পড়ে, এই সুউচ্চ ক্রেন শটে তার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেনি। উপরন্তু দৃশ্যের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অর্থাৎ মৃদু মৃদু বৃষ্টি ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী একটি জাহাজ-ঘাটার ওপরে দুটি মৃতদেহ পড়ে আছে। নীচে কয়েকটি মানুষ মৃতদেহ ঘিরে জটলা করছে। ক্যামেরা ঐ দীর্ঘ দেড়শো ফিট উঁচু দূরত্ব থেকে দৃশ্যটিকে যেন বিপুল বেদনার ভারে ঈষৎ কৌণিক উপস্থাপনায় ফ্রেমে আবদ্ধ করেছে। বস্তুতঃ ছবিটির climax যেন এই শেষ দৃশ্য পর্বে এসে দর্শকদের বিমূঢ় করে দিয়ে যায়। সমগ্র ছবিটির ভাবগত দ্বন্দ্বের শিল্পোত্তীর্ণ রূপসাধন ঘটেছে এই একটি মাত্র দৃশ্যতে। এই দৃশ্য গ্রহণ চূড়ান্ত ভাবে subjective বলেই ক্যামেরার উপস্থাপনা এত সার্থক হয়েছে।

ক্যামেরার ফোকাসের তারতম্যে যেমন চলচ্চিত্রে বিভিন্ন মুডের সৃষ্টি করা হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য ভেদে ছবিতে বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা আনা হয়। সত্য-জিতের মহানগরে একটি সিকোয়েন্স আছে যেখানে দেখা গেছে এক বৃদ্ধ জনৈক ব্যক্তির সাক্ষাতে পথে বেরিয়েছেন, তাকে এক উঁচু সিঁড়ি দিয়ে হাতের লাঠির সাহায্যে অত্যন্ত পরিশ্রমে উপরের তলায় উঠতে দেখা গেছে, যখন তিনি উপরের সিঁড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন—কাটিং-এর মাধ্যমে একটি দৃশ্যে দ্যাখা গেছে ঐ বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করার জন্য কেউ আসছেন, এবং আমরা ঐ আগন্তুকের মুখের অভিব্যক্তিতে আকস্মিক ভীতির চিহ্ন লক্ষ্য করি। এর পরের সংলগ্ন দৃশ্যে দ্যাখা গেছে বৃদ্ধের হাতের ছড়িটি উপরের সিঁড়ি থেকে ধাপে ধাপে শব্দ করতে করতে নীচের তলায় আছড়ে পড়ছে। সমগ্র ছবিতে বৃদ্ধের অবসন্ন

হওয়ার কোনো চিহ্নই আমরা এর আগে দেখিনি, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর এই দুর্ঘটনা আমাদের অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এখানে ক্লোজ আপ, হাই এ্যাঙ্গেল শট, কাট ইত্যাদি কয়েকটি বিভিন্ন দৃশ্যে যে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে তাকে চলচ্চিত্রের নন্দনে technique of suggestion সংজ্ঞায় গ্রহণ করা যায়।

ডি সিকা পরিচালিত 'Umberto D' ছবিতে একটি উল্লেখ্য—Subjective tracking-shot আছে, যেখানে দেখে গেছে এক বৃদ্ধলোক জীবনের শেষে নানা রকম অবিচার, দুর্ব্যবহার পেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এক সময় তিনি একটি জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, এর পরই হঠাৎ ক্যামেরার একটি জুমশটে নীচের তলায় ফুটপাতের বাঁধানো পাথর দর্শকদের দিকে ছুটে এসেছে। আমরা অর্থাৎ চলচ্চিত্রের নিত্যকালীন দর্শক বৃদ্ধের সেই মুহূর্তের চিন্তা—যে মনোভাবটি একমাত্র আত্মহত্যা করার—সেই চিন্তার এক বিস্তৃত অনুভূতি পাই। এখানে ক্যামেরার Zoom-shot আমাদের সংলাপ ব্যতিরেকেও বৃদ্ধের মানসিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান চলচ্চিত্র শিল্প যে আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে একটি ছবিতে যে কোনো দুরূহ ভাবব্যঞ্জনা ফোটাতে ক্যামেরাকে অকল্পনীয় পরিশ্রম করতে হয় না। যে পরিচালকেরই ক্যামেরার গতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আছে, তাঁর কাছে মূর্ত বিমূর্ত কোনো ভাব ফুটিয়ে তোলাই কষ্টসাধ্য নয়। ছবিতে কোনো দৃশ্যে যখন একটি চরিত্রের মুখমণ্ডল মূল প্রতিপাদ্য, তখন সেটিকে সমগ্র ফোকাসের মধ্য স্থল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এককভাবে প্রতিফলিত করা হয়, আবার যখন বহু চরিত্রের মুখচ্ছবি প্রতিমায়িত করায় প্রয়োজন সেখানেও লাইটিং, শট কম্পোজিশন ইত্যাদি দর্শকদের এক বিশেষ চরিত্রের প্রতিই আকর্ষণ করে। এই কারণে চলচ্চিত্রের ক্যামেরা সব সময় চরিত্রের কার্যকারণ, তার গতির সমতা, তার অভিব্যক্তিকে বজায় রেখে অগ্রসর হয়। কিন্তু এস্থলে একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে দৃশ্য দৃশ্যান্তরে বিচ্ছিন্নভাবে ক্যামেরার আকস্মিক গমন অনেক সময় দর্শকদের ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিগ্রাহ্য সমতার মধ্যে ফাটল ধরিয়ে সমগ্র বক্তব্যকে মাটি করে দিতে পারে। বক্তব্য অনুযায়ী ক্যামেরার গতি নিয়ন্ত্রিত হয় বলে এর সচলতায় কতোটা বিষয়বস্তু ফ্রেমে রাখা যেতে পারে সে সম্বন্ধে পরিচালককে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয় বিখ্যাত পোলিশ স্রষ্টা আঁদ্রে ভাইদা পরিচালিত 'A generation' ছবিতে একটি

অবিস্মরণীয় Pan আছে যা চলচ্চিত্রের ক্যামেরার অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় বোঝানো সম্ভব ছিল না। হিচকক ও আইজেনস্টাইনের অন্যতম সহকারী প্রখ্যাত চলচ্চিত্রবিদ আইভর মণ্টাগু উল্লিখিত দৃশ্যক্রমটির একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর 'Film world, গ্রন্থে "Wajda introduces his central character to the underground group in 'A GENERATION' 'A lighted cigarette is passed round from hand to hand, the camera pans following it, pausing on each new digger as each refuses it or takes a puff. The pause on each Person is clear and introduses us to his character. The pan is not waste because the cigaette passing itself is the actual subject of the scene, showing the proverty of resources of the group, their comradeship in sharing··The pan PER SE has its own built in rhythm,"

সুতরাং এবারে নিবন্ধের একেবারে পরিসমাপ্তিতে এই নান্দনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যেহেতু চলচ্চিত্র অসংখ্য স্থির ছবির সমবায়ে গড়ে ওঠে, তাই তার চিত্রগ্রহণ, তার পুনর্বিন্যাস, তার উপস্থাপনে যে নির্দিষ্ট ফ্রেম ব্যবহৃত হয়, তার মধ্য দিয়েই স্রষ্টাকে যাবতীয় অভিব্যক্তি, যাবতীয় দ্যোতনার আস্বাদন দিতে হয়। তাই একটি ছবির উৎকৃষ্ট শিল্পের স্তরে উত্তরণে ছবির পরিচালককে কেবল চলচ্চিত্রের দক্ষ কারিগর হলেই চলবে না, তাঁকে হতে হবে সচেতন ও কুশলী শিল্পী। অর্থাৎ মহৎ শিল্পে শিল্পী ও দর্শকের নিভৃত সাক্ষাৎকারে রূপকারের ভূমিকা বিশ্বাধিপতি সম্রাটের মতো। তিনি স্রষ্টা। তাই চলচ্চিত্রের অনাগত শিল্প সম্ভাবনার অভাবনীয় শক্তি প্রাচুর্যের কথা স্মরণ রেখে উচ্চারণ করি—'Act is a tryst.'

ক্লোজ-আপ

চলচ্চিত্রের নন্দন ব্যাখ্যায় প্রতীচ্যের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রবিদ লিণ্ডগ্রীন ক্লোজ-আপ্ সম্বন্ধে বলেছেন : **"Shot taken with the camera actually or apparently very close to the subject; in relation to a human subject, a short of the face only।"**

একালে ক্লোজ-আপ সম্পর্কে উক্ত সীমিত কোনো বিধি প্রযোজ্য নয়। কেননা একালে মানবিক কোনো ঘটনা বা দৃশ্য প্রতিষ্ঠিত করতে কেবল মানুষের মুখের ক্লোজ-আপ্ই ব্যাবহৃত হয় না। আলাদা ক'রে মানুষের হাত, পা, চোখের মণি, কান ও অনেক সূক্ষ্ম শরীরী অংশকেও ক্লোজ-আপের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে।

চলচ্চিত্র যে গতির জন্ম দেয়, ক্লোজ-আপ তার মধ্যে ক্ষণিক বিরতির কাজ করে। যেমন কোনো প্রবহমান ঘটনা দৃশ্যায়িত হ'তে হ'তে হঠাৎ দর্শকের সামনে প্রয়োজনে একটি দৃশ্য অনেক বড় আকারে ধরা পড়ে, একটি মুহূর্ত, একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যকোণ, কোনো বিশিষ্ট বস্তুর নির্দিষ্ট অংশ সমগ্র পর্দাজুড়ে দর্শকদের সচেতন ক'রে দেয়। বস্তুর এই নিকটিকরণকে আমরা চলচ্চিত্রের সংজ্ঞায় ক্লোজ-আপ বলতে পারি। অবশ্য একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে অনেক ক্ষেত্রে জুম লেন্সের মাধ্যমেও ক্লোজ-আপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু তা অনেক পরবর্তী স্তরের ব্যাপার। প্রাথমিকভাবে কোনো বস্তুকে, কোনো দৃশ্যাংশকে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আকারে, স্বাভাবিক দেখার থেকেও অনেক বড় ভাবে, অনেক বিশদ ক'রে দেখানোকেই ক্লোজ-আপ্ বলতে পারি। ক্লোজ আপের মাধ্যমে পরিচালক তাঁর কাংক্ষিত কোনো বস্তুর গুরুত্ব অতি সহজে দর্শকদের চেতনায় পৌঁছে দেন। ক্লোজ-আপ্ মানেই একটি জিনিসকে স্বাভাবিকের চেয়ে আরো স্পষ্টতর দ্যোতনায় দর্শকদের কাছে সচেতন করা। বস্তুতঃ পরিচালক যখন কোনো ক্রিয়ার কিছু ডিটেলস্কে ধরতে চান তখনই প্রয়োজন হয় ক্লো-আপের। পুদভ্কিন বলেছিলেন যে দরকার হলে ক্লোজ-আপের ক্ষেত্রে ক্যামেরার গতিকেও মন্থর ক'রে নেওয়া যেতে পারে, যাতে ক'রে সাধারণ গতিতে দর্শকদের চোখে যেটা ধরা পড়েনা তাকেও ঠিকমতো চলচ্চিত্রের

পর্দায় তুলে ধরা যেতে পারে। পুদভ্‌কিন এই জাতীয় ক্লোজ-আপকে বলেছিলেন 'close up in time,.' অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, মার্কিন পরিচালক গ্রিফিথই হলেন ক্লোজ-আপের আবিষ্কারক। তথ্যটি ভুল। একথা বলা যেতে পারে গ্রিফিথই হলেন প্রথম শিল্পী যিনি ক্লোজ-আপের নিহিত অর্থটি বুঝেছিলেন এবং তাঁর শিল্পগত তাৎপর্যকে চলচ্চিত্রের নন্দনের মাধ্যমে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। গ্রিফিথের আগেও ছবিতে অর্থাৎ পোর্টারের ছবিতেও ক্লোজ-আপ্‌ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু চলচ্চিত্রে ক্লোজ-আপের সার্থক ব্যবহার এবং এর ব্যাকরণগত সৌন্দর্যকে প্রথম গ্রিফিথই উপলব্ধি করেন। শোনা যায় চলচ্চিত্রের একেবারে গোড়ার দিকে সেকালের দর্শকরা ক্লোজ-আপে হঠাৎ মানুষের ছিন্ন মস্তক দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলন। দৃশ্যের কোন্ অংশটি মুহূর্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কোন্ বস্তুটিকে আরো কাছে, আরো পুংখানু পুংখভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরলে তবে গোটা দৃশ্যক্রমের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা পাবে, পরিচালকের এহেন ইচ্ছাকে একমাত্র ক্লোজ-আপই মূর্ত করতে পারে। তাই একালে ক্লোজ-আপকে অনেকে Keystone হিসেবে গণ্য করেন। তবে শিল্পের সব শাখার মতোই close-up-এর ব্যবহারেও পরিচালকের যথার্থ বুদ্ধি ও শিল্পসংযম থাকা দরকার, নাহ'লে যেখানে সেখানে অপ্রয়োজনীয় ক্লোজ-আপ্‌ অনেক ক্ষেত্রে দর্শকের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দেখা দেয়।

নির্বাক যুগের অনেক ছবিতে পরিচালকরা ক্লোজ-আপ্‌ ব্যবহার করতেন দর্শকদের হঠাৎ চমক দেবার জন্য, যেখানে তাৎপর্য অপেক্ষা একটা আচমকা শিহরণ উৎপাদন করাই ছিল পরিচালকদের উদ্দেশ্য। একালে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রের নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তৎকালীন সেই মামুলি ক্লোজ-আপের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নির্বাক যুগে অনেক ছবিতেই দেখা যেত হঠাৎ কোনো বন্দুকের নল, ছুরির ফলা, বিস্ফোরক বারুদ, অশ্রুসিক্ত চোখ—এই জাতীয় অনেক ছকে বাঁধা close-up যা সেকালের ছবির নাটকীয় উপাদান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে close-up-এর ব্যবহারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হতেও দেখা যায়। সাধারণতঃ close-up ব্যবহৃত হয় কয়েক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু বার্গম্যানের 'উইন্টার লাইট' ছবিতে নায়িকা ইন্‌গ্রিড থুলিন যখন চার্চের পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলছে তখন একাধিকবার যে close-up ব্যবহৃত হায়ছে তার এক একটি দৃশ্যের স্থায়িত্ব দু'মিনিট থেকে আড়াই মিনিট পর্যন্ত। কিন্তু ছবিতে এই close-up কোথাও সৌন্দর্য নষ্ট করেনি। আসলে

সবটাই নির্ভর করছে পরিচালকের নির্বাচনের ওপর। সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ছবির শুরু হয়েছে ছবি বিশ্বাসের close-up দিয়ে। ধীরেধীরে close-up থেকে ক্যামেরা ট্রাকব্যাক ক'রে পিছনে সরে এলেদেখা গেছে জমিদার বিশ্বম্ভর রায় তাঁর প্রাসাদের ছাদে বসে তামাক সেবন করছেন। এ দৃশ্যেও close-up -এ সাধারণ সময়ের থেকে বেশী সময় দেওয়া হয়েছে, কারণ সত্যজিৎ রায় প্রথম দৃশ্য থেকেই ছবির মুড গড়ে দেবার জন্য মন্থরভাবে সময়কে তাঁর ছবিতে ব্যবহার করেছেন। চলচ্চিত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে সিনেমায় দীর্ঘ কাল close-up -এর ক্ষেত্রে মানুষের মুখাবয়ব অধিক গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। কারণ একটি চরিত্রের মানসিক গঠন, তার প্রবণতা, তার অনুভূতি ও তার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলের বিচিত্র ভঙ্গিমা বিশেষ কার্যকর। তাই স্বভাবতই চলচ্চিত্রকারেরা মানুষের মুখকে বরাবর close-up-এ প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। এমনকি আধুনিককালেও মুখের ক্লোজ-আপ্ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কিছু কিছু close-up চিরস্মরণীয় হয়ে আছে যেগুলি একালেও চলচ্চিত্র রসিকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। যেমন মুরনোর' Last Laugh, ছবিতে হোটেল দারোয়ানের বিখ্যাত close-up, পোটেমকিন্ ছবির close-up, কার্ল ড্রেয়ারের Passion of Joan of Arc ছবির Arc -এর বিষাদঘন অশ্রুময় মুখমণ্ডল, ষ্ট্রোহাইমের Greed ছবিতে স্ত্রীর লোভকে দেখানোর জন্য ব্যবহৃত ড্রয়ার ভর্তি টাকার ক্লোজ-আপ্, অথবা গ্রিফিথের চিরস্মরণীয় intolarance ছবির সেই মহিলার ক্লোজ-আপ্ ইত্যাদি। সিড্নী লুমেটের 'পণ ব্রোকার' ছবিতে একটা আসাধারণ close-up আছে যেখানে তরুণ অরতেজকে খুন করার পর অভিনেতা রড্ স্টিগারের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তার মুখ চিৎকারের জন্য উন্মুখ, কিন্তু কোনো শব্দ নির্গত হচ্ছে না। অব্যক্ত অভিনয়-মুহূর্তটির close-up একালের সিনেমার এক বিশেষ উপাদান। মুখের close-np ব্যবহারে ফরাসী পরিচালক ব্রেসঁকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ তিনি মুখের বিবিধ পরিবর্তনকে close-up-এর মাধ্যমে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তার 'মুসেৎ' 'বালথাজার' ইত্যাদি ছবিতে এই close-up-এর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যবহার লক্ষ্য করার মত। এমনকি 'বালথাজার' ছবির শেষ দৃশ্য পর্বে ব্রেসঁ অশ্রুসিক্ত গাধার চোখকে সমগ্র পর্দাজুড়ে দেখান। একালের পাপ ও পতন,

নীতিহীনতাকে তিনি গুলিবিদ্ধ গাধার চোখের জলে বিশদ ক'রে দেখিয়েছেন।

আসলে close-up হ'ল চলচ্চিত্র শিল্পের সেই হাতিয়ার যাকে কেন্দ্র ক'রে পরিচালক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু, মুহূর্ত বা চরিত্রের সূক্ষ্ম বিবর্তনকে এক লহমায় দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেন। চলচ্চিত্রের জন্মলগ্ন থেকে এই close-up একালে এসে এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে যার নিদর্শন হাল-আমলের অসংখ্য ছবিতে ছড়িয়ে আছে।

প্যানিং ও জুমিং

চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যাকরণে কিছু কিছু প্রয়োগকৌশল আছে যেগুলো যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই অপরিহার্য উপকরণরূপে প্রতিভাত হয়। প্যানিং এবং জুমিং সেই ধরনের দুটি অপরিহার্য শিল্পকৌশল বলা যেতে পারে। তবে প্রয়োগের তারতম্যে এই দুটি প্রকরণের শিল্পপ্রকাশ নানাধরনের হয় এবং সেটা নির্ভর করে পরিচালকের ছবির দৃশ্যচিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। অর্থাৎ কে কোন্ ক্ষেত্রে কিভাবে এই কৌশল দুটির ব্যবহার ঘটাচ্ছেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে দুটি কৌশলেরই ব্যবহারিক প্রক্রিয়া সকলের কাছেই এক। প্যানিং (panning) কথাটি এসেছে 'প্যানোরামা' শব্দ থেকে। যখন ক্যামেরা বিশেষ একস্থানে স্থিত হ'য়ে তার অক্ষের (axis) উপর থেকে বাঁদিকে বা ডানদিকে চলাফেরা করে তখন তাকে চলচ্চিত্রের সংজ্ঞায় প্যানিং বলা হয়। প্যানিংশট্ সাধারণতঃ গৃহীত হয় বাঁদিক থেকে ডানদিকে অথবা ডানদিকে থেকে শুরু ক'রে বাঁদিকে। বস্তুতঃ ইংলণ্ডে প্যানিং অর্থে ক্যামেরার সমান্তরালে চলাফেরাকেই বোঝায়। কিন্তু অন্যান্য মহাদেশীয় চলচ্চিত্র জগতে খাড়াভাবে, সমান্তরাল এবং কৌণিক-ভাবেও প্যানিং-এর প্রচলন আছে। যেখানে কোনো দৃশ্য গ্রহণে খুব দ্রুত প্যানিং ব্যবহৃত হয় তাকে বলাহয় জিপ-প্যান (Zip-pan) কোনো কোনো ছবিতে দেখা গেছে ক্যামেরা সম্পূর্ণ ৩৬০ ডিগ্রি প্যান করেছে। অর্থাৎ দৃশ্য গ্রহণে পুরো একটি বৃত্ত রচিত হয়েছে। আজকাল অনেক ছবিতে এই ধরনের প্যানিং দেখা যাচ্ছে যা একটা নাটকীয় সংঘাত গড়ে তোলার জন্য মূলতঃ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই মুহূর্তে কালাটোজভের একটি ছবির কথা মনে পড়ছে। ছবিটির নাম 'দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং'। এতে একটি অনবদ্য প্যানিং আছে যেখানে গুলির আঘাতে ছবির নায়ক বনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। তার দেহ মাটি স্পর্শ করার পূর্বমুহূর্তটিকে পরিচালক এই দীর্ঘ প্যানিং-এর মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন যেখানে পুরো ৩৬০°ডিগ্রি জুড়ে সমস্ত বনভূমি যেন দর্শকদের চোখের সামনে চক্রাকারে প্রবল গতিতে ঘুরেছে। প্যানিং অনেক ক্ষেত্রে ছবিতে অত্যন্ত মন্ময় (Subjective) ব্যঞ্জনা এনে দেয়। মার্সেল কামুর 'Black Orpheus' ছবিতে এই ধরনের একটি প্যানিং আছে। ছবির একেবারে শেষে নায়ক-নায়িকার মৃত্যু ঘটেছে পাহাড়

থেকে নীচে পড়ে গিয়ে। ক্যামেরা শেষ দৃশ্যে মৃত নায়ক-নায়িকাকে নীচে রেখে প্রথম কিছুটা উপরে টিল্ট করে এবং তারপর ধীরে ধীরে pan ক'রে 'রিও' অঞ্চলের আকাশ-পাহাড়-সমুদ্রকে সমগ্র ফ্রেমের মধ্যে ধরে। সেই মুহূর্তের বিষণ্ণ সৌন্দর্যটিকে এইভাবে প্যানিংএর সাহায্যে পরিচালক দর্শকদের দৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেন। গ্রিফিথের 'Birth of a Nation' ছবিতে যেখানে আটলান্টার রক্তক্ষয়ী সিকোয়েন্সের শুরু হচ্ছে এক গ্রাম্য শান্ত পরিবেশে, সেইখানে পরিচালক এক অনবদ্য প্যানিং-এর ব্যবহারে পারিপার্শ্বিক বৈপরীত্য এনেছেন। আমরা দেখি পাহাড়ের একপ্রান্তে গ্রামের যুবতীরা ও কিছু ছোট ছেলেমেয়েরা শান্ত পরিবেশে চড়ুইভাতি করছে। এখানে ক্যামেরা আস্তে প্যান করলে দেখা যায় যে কিছুদূরে নীচে একদল সশস্ত্র সৈনিক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে। এবং যুদ্ধের দৃশ্য পর্যায় শুরু হয় যা প্রথম সূচনা দৃশ্যের পরিবেশের একেবারে বিপরীত। এই উভয় সিকোয়েন্সের নাটকীয় সংঘাতের বৈপরীত্যকে গ্রিফিথ একটি প্যানিং-এ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চলচ্চিত্রে দৃশ্যগ্রহণে একধরনের মুভমেন্ট আছে যাকে ট্রাকিং-এর সদৃশ বলা যেতে পারে যেটা একটা বিশেষ লেন্স-এর দ্বারা গৃহীত হয় এবং এই দৃশ্যকে সিনেমার সংজ্ঞায় বলে জুমশট্ (Zoom)। এই জুমিং অনেকটা ট্রাকিং-এর মত মনে হয় কিন্তু দুটোর মধ্যে প্রভেদ আছে। ট্রাকিং দৃশ্যে ক্যামেরা স্বয়ং বস্তুর কাছে বা বস্তু থেকে পিছনে চলাফেরা করে। কিন্তু জুমিংয়ের ক্ষেত্রে ক্যামেরা একই স্থানে অবস্থিত থাকে, কেবল একটা লেন্সের সাহায্যে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ প্রয়োজনে বস্তুর কাছাকাছি চলে যায় আবার কখনো বস্তু থেকে অনেক পিছনে চলে আসতে পারে। এই জুমিং অনেক ক্ষেত্রে খুব দ্রুত গতিতেও সংগঠিত হয়। সেটা নির্ভর করে দৃশ্যের ঘটনাসংঘটনের পরিপ্রেক্ষিতের ওপর। 'চারুলতা' ছবিতে সত্যজিৎ দ্রুতগতির একটি জুমশট গ্রহণ করেছেন। ছবির মাঝামাঝি নিজস্ব পত্রিকার দেখাশোনার ব্যাপারে সদাকর্মব্যস্ত ভূপতিকে চারু কাছে না পাওয়ায় দারুণ নিঃসঙ্গ একাকীত্বের জীবন কাটাচ্ছে। একটি দৃশ্যে ভূপতি তার সম্পাদিত Sentinel পত্রিকা হাতে নিয়ে দোতালার অলিন্দ অতিক্রম ক'রে চলে যায়। চারু দূরবীণ চোখে লাগিয়ে ভূপতিকে কাছে দেখে, পরমুহূর্তেই চারু দূরবীণ নামিয়ে নেয় চোখ থেকে—ভূপতিকে দর্শকরা আবার দূর অলিন্দের শেষ প্রান্ত দিয়ে চলে যেতে দেখে। এখানে অত্যন্ত দ্রুতগতির জুমিং-এর ব্যবহার কাছে থেকেও ভূপতিকে চারুর না পাওয়ার

বেদনাটিকে অপূর্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি একেবারে চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা। ডিসিকা পরিচালিত 'Umberto D' ছবিতে এই জাতীয় একটি জুমিং আছে যেখানে অতি দ্রুত জুম লেন্সের দ্বারা দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। একটি বৃদ্ধ হতাশায়, ক্লান্তিতে, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। একটি দৃশ্য তিনি উপরের জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি রেখেছেন। পরমুহূর্তেই হঠাৎ ক্যামেরায় 'জুম্‌শটে' নীচের তলার ফুটপাত যেন দর্শকদের দিকে দ্রুত ছুটে এসেছে। দর্শকদের মনে বৃদ্ধের সেই মুহূর্তের আত্মহত্যা করার মনোভাবটি নিমিষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কেননা ইতিমধ্যেই ছবিতে পরিচালক ঐ বৃদ্ধের মানসিক অশান্তি, হতাশা আর চরম দুর্দশার ব্যাপারটিকে এস্টাবলিশ ক'রে দিয়ে:ছন। এখানে ক্যামেরা একটি মাত্র বাঙ্গনায় ঐ Zoom Shot-এ সংলাপ ছাড়াও বৃদ্ধের মানসিক বিক্ষিপ্তির কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে দিয়েছে।

বস্তুঃত জুমিং আর ট্রাকিং-এর মধ্যে যেমন কৌশলগত পার্থক্য আছে, তেমনি প্রতিক্রিয়ার দিক থেকেও ফরওয়ার্ড ট্রাকিং বা ব্যাক্‌-ট্রাকিং-এর সঙ্গে 'জুম ফরোয়ার্ড' বা 'জুম ব্যাক্' পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে। ফরোয়ার্ড ট্রাকিং বা ব্যাক্‌-ট্রাকিং-এর ক্ষেত্রে দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষণটি (Perspective) যেভাবে সরে যায় জুমিং-এ তা হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে জুম্‌ ফরোয়ার্ডের অর্থাৎ জুমলেন্সের সাহায্যে ক্যামেরায় দৃষ্টিকোণ যখন বস্তুর কাছে চলে যায় তখন পিছনের পটভূমি (Background) প্রথম আবির্ভাবের তুলনায় বড় আকারে দেখা দেয়। জুমলেন্সের ফোকাল লেংথের জন্যেই এটা ঘটে। কিন্তু এই একই ধরনের দৃশ্য যখন ফরোয়ার্ড ট্রাকিং-এ গৃহীত হয় তখন অগ্রবর্তী স্থানটির (Foreground) বস্তুসমূহ আস্তে আস্তে বড় আকার ধারণ করে কিন্তু ব্যাকগ্রাউণ্ডের অবস্থা একই থাকে, কেননা এক্ষেত্রে স্বয়ং ক্যামেরা সচলভাবে দূরের বস্তুর কাছে এগোচ্ছে। অর্থাৎ ট্রাকিং দৃশ্যে ব্যাকগ্রাউণ্ডের ব্যত্যয় ঘটেনা যেটা জুমিং-এর ক্ষেত্রে হয়। জুমিং এমনই একটি অপরিহার্য কৌশল যেটি না হলে অনেক প্রার্থিত মুহূর্ত ছবিতে গড়ে তোলা যায় না, তেমনি আবার এর অপব্যবহারে কোনো দৃশ্যের সৌন্দর্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় একমুহূর্তে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একালে অনেক হিন্দী ছবিতে আউটডোর শুটিংয়ে যে সমস্ত গানের দৃশ্য গৃহীত হয় সেখানে যথেচ্ছভাবে জুমশট্ গ্রহণ করা হয় যার কোনো যৌক্তিকতা নেই, শিল্পসার্থকতাও নেই। জুমিং প্রধানতঃ দুটি কাজ সাধিত করে। প্রথমতঃ জুমিং-এ ক্যামেরা না সরিয়েও ডলিশট বা ট্রাকিং দৃশ্যের এফেক্ট আনা যায়। দ্বিতীয়তঃ, দূর

থেকে কোনো বস্তুর কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ লঙ্‌শট থেকে ক্লোজশটে যাওয়ার বা তার বিপরীতে ক্লোজ থেকে লঙে চলে আসার ক্ষেত্রে একাধিক খণ্ড দৃশ্য গ্রহণ না ক'রেও জুমিং-এর মাধ্যমে উক্ত প্রভাব গড়ে তোলা সম্ভব। অনেক ছবিতে পরিচালকরা জুমিং কৌশলটিকে প্যানিং ও টিল টিং-এর সঙ্গে সম্মিলিত ক'রে ব্যবহার করেন এবং এক্ষেত্রে ছবিতে একটা ত্রিমাত্রিক (Three-dimensional) আয়তন গড়ে ওঠে। ফ্রাঙ্কো ইন্‌ডোভিনা পরিচালিত 'Voyeur' ছবির শুরুতে একটি সুন্দর জুমিং আছে। ছবির নায়ককে আমরা দেখি অন্যমনস্ক, উদাসীনভাবে রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়ে কর্মব্যস্ত লোকজন চলে যাচ্ছে। এখন ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুমব্যাক্ করলে লঙ্‌শটের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে শহরের রাজপথে নায়ক অসংখ্য লোকের মাঝখানে কেমন যেন বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত প্রতিভূর মতো দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যটি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রথমেই নায়ক চরিত্রের রহস্যের সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে দেয়। ডেভিড লীনের 'Brief Encounter' ছবির একটি দৃশ্যে নায়িকা আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে রেল লাইনের ধারে যায়, ট্রেন এসে পড়ে, নায়িকার হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য মাথা ঘুরে ওঠে, ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে জুমিং-এর মাধ্যমে নায়িকার মুখের ক্লোজ-আপে চলে যায়। প্রচণ্ড বেগে ট্রেনটি পাশ দিয়ে যায়, হাওয়ার বেগে নায়িকার চুলগুলো মুখের ওপর এলোমেলোভাবে উড়ে পড়ে, টেনের আলোকিত জানলাগুলি যেন খণ্ড খণ্ড প্রতিচ্ছায়ার মতো দ্রুত একটার পর একটা নায়িকার মুখের ওপর দিয়ে সরে যায়। নায়িকার সম্বিৎ ফিরে আসে। পুরো দৃশ্যপটটি এক দারুণ উত্তেজনায় পরিসমাপ্ত হয়। জুমিং-এর প্রাকরণিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সাবধান ক'রে ক্যামেরার বিদেশী দক্ষ শিল্পীরা অনেক আগে বলেছিলেন— It can contribute to a film's pace, suspense, excitement—or turn it into an eyesore, সুতরাং জুমিং-এর ব্যবহারে একজন শিল্পীর সর্বদা সচেতন থাকা দরকার যে তিনি কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে জুমলেন্সের ব্যবহার করছেন, না হলে পুরো এফেক্টটাই বিপরীত হয়ে যাবে।

ফ্রীজ

Where ever anything lives, there is, open somew Lere, a register in which time is being inscribed.

অনন্তের দিকে প্রবাহিত মহাকালে মুদ্রিত এই 'সময়'কেই চলচ্চিত্র স্রষ্টা নোতুন করে রূপ দেন তাঁর ছবিতে। তাঁর সৃষ্টিতে সময় তাই একটা সম্পূর্ণ নোতুন পরিচ্ছদ গ্রহণ করে। চলচ্চিত্র শিল্পটাই সময়ের ব্যবহারকেন্দ্রিক। প্রবহমান সময়ের নিজস্ব একটা ছন্দ আছে। চিত্রপরিচালক সেই সময়কে নিজের প্রয়োজনমতো গড়ে নেন। তাই বলা হয়ে থাকে যে চলচ্চিত্রের একটাই 'কাল' অর্থাৎ কেবল Present Continuous Tense. ঘটমান বর্তমানের মধ্যেই চলচ্চিত্র স্রষ্টা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্পর্শ দেন। চলচ্চিত্র এমনই এক বৈজ্ঞানিক শিল্পমাধ্যম যে এখানে সময়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধি না করতে পারলে সার্থক সৃষ্টি কখনো সম্ভব নয়। সিনেমার যা কিছু শিল্পের কারবার তা এই সময়কে আশ্রয় করেই। দক্ষ স্রষ্টার কাছে সময় তাই কেবল চলমান নয়, কখনো স্থির নিশ্চল, কখনো অস্বাভাবিক দ্রুত কখনো বা অস্বাভাবিক মন্থর, আবার কখনো বস্তুজগতের সমান্তরাল যথাযথ। সিনেমার পর্দায় অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর কোনো আচরণের একটা অংশ হঠাৎ মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে যায়, পরক্ষণেই পূর্ব ক্রিয়াসংস্থানে দৃশ্যটা ফিরে যায়। পর্দায় কোনো দৃশ্যাংশের এই হঠাৎ স্থির হয়ে যাওয়াটাই সিনেমার ভাষায় বলা হয় ফ্রীজ (Freeze)। পরিচালক নিজের ভাবনা অনুযায়ী যখন কোনো মুহূর্তের বিশিষ্ট খণ্ডাংশকে ক্ষণিকের জন্য নিশ্চল করে দিতে চান তখন তিনি ফ্রীজ ব্যবহার করেন। একালের চলচ্চিত্রে এই ফ্রীজ একটা বহুল পরিচিত কৌশল। আলোকচিত্রের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই ফ্রীজ নির্মিত হয়। প্রাথমিক শর্তে পরিচালক যে ফ্রেমটিকে ফ্রীজ করতে চান সেটিকে ঐ মূল ফিল্ম স্ট্রিপ থেকে বেছে নেওয়া হয় এবং তাকে অন্য আর একটি ফিল্ম স্ট্রিপের ওপর অনুকৃত (Copy) করা হয় যেখানে ঐ ফ্রেমটির প্রয়োজনমতো অসংখ্য প্রতিলিপি সম্ভব। ধরা যাক পরিচালক একজন সাঁতারুর উঁচু থেকে নীচের জলে ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যকার একটি বিশিষ্ট মুহূর্তকে তিন

সেকেণ্ডের জন্য ফ্রীজ করতে চান অর্থাৎ নীচের জল ও উঁচু স্থানের মধ্যবর্তী শূন্যে তাকে সেকেণ্ডের জন্য নিশ্চল গতিহীন করতে চান।

এখানে প্রথমে সাঁতারুর ওপর থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার ক্রিয়াটি যথাযথ স্বাভাবিক ভাবে আলোকচিত্রের মাধ্যমে গৃহীত হবে। তারপর ঐবিশিষ্ট দৃশ্যের যে ফ্রেমটি পরিচালক ফ্রীজ করবেন সেটিকে অপটিক্যাল ল্যাবরেটরীর সাহায্যে বাহাত্তরটি প্রতিলিপি (Copy) করতে হবে এবং এই বাহাত্তরটি ফ্রেম একটি ফিল্ম স্ট্রিপের ওপরই অনুকৃত হবে। এবারে এই ফিল্ম স্ট্রিপটিকে ঐ সাঁতারুর ঝাঁপ দেওয়ার দৃশ্যের মাঝখানে জুড়ে দেওয়া হল। এখন পরিচালক যে বিশিষ্ট ফ্রেমটি নির্বাচিত করে বাহত্তরটি প্রতিলিপি করেছেন সেটির বাহাত্তরবার পুনরাবৃত্তি ঘটবে ফলতঃ ঐ বিশিষ্ট মুহূর্তটি চলচ্চিত্রের পর্দায় তিন সেকেণ্ডের জন্য ফ্রীজ হয়ে থাকার পর আবার নিজস্ব গতিতে ফিরে যাবে। পরিচালক যতক্ষণ ইচ্ছে ফ্রীজ তৈরী করতে পারেন কিন্তু এক সেকেণ্ডের জন্য তাকে একই ফ্রেম চব্বিশবার অনুলিপি করতে হবে। কেননা সিনেমার ব্যাকরণ অনুযায়ী এক সেকেণ্ড চব্বিশটি ফ্রেমের গতি প্রবাহিত হয়। ল্যাবরেটরীর প্রভূত ব্যয় সংক্ষেপ করার জন্য আরো একভাবে ফ্রীজ ফেম গৃহীত হয়। এখানে প্রার্থিত ফ্রেমটিকে খুব শক্ত করে চারটি কোণ কোনো কিছুর ওপর ভালোভাবে আটকে খুব উজ্জল প্রসারিত আলোর সামনে রেখে ক্যামেরার মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট আটকানো ফ্রেমটির ফটো নেওয়া হল ঠিক যেমনটি মুভি ক্যামেরায় ছবি তোলা হয় এবং এখানে চূড়ান্ত ক্লোজ আপ কৌশলের সূক্ষ্মতা একান্ত অপরিহার্য্য। কেননা ঐ ক্ষুদ্র একটি ফ্রেমের যথার্থ রিডিং-এর ক্ষেত্রে তার যথার্থ উদ্‌ঘাটন (Exposure) বোঝা খুব দুরূহ।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে রেনে ক্লেয়ার ১৯২৩ সালে নির্মিত তাঁর "A crazy Ray" ছবিতে ফ্রীজ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু নিশ্চিতরূপে ফ্রীজ ব্যবহারে প্রথম দিনটি জানা যাচ্ছে না। কিন্তু রেনে ক্লেয়ারের এই ছবি মোটামুটিভাবে ফ্রীজের প্রাথমিক প্রয়োগরূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ ছবির একটি দৃশ্যে একটি মানুষ বহু উঁচু একটি জানালা থেকে আত্মহত্যার অভিলাষে নীচের ভূমিতে লাফিয়ে পড়ে। মানুষটির নীচে পড়ার মাঝখানে পরিচালক তাকে ফ্রীজ করেছেন। ১৯৫৯ সালে নির্মিত ত্রুফোর 'The 400 Blows' ছবিতে এসে ফ্রীজের ব্যবহার একটা নোতুন তাৎপর্য পেল। এ ছবিতে একটি ছোট ছেলে বাড়ীর অবরোধ থেকে পালিয়ে সমুদ্র অভিমুখে ছুটে যায় কিন্তু

সম্মুখের সমুদ্র তাকে কোনো নোতুন পথের সন্ধান দিতে পারে না। ক্রুদ্ধ, জীবন পলাতক ছেলেটি পরাজিত মুখে পিছনের দিকে ফেরে, তার মুখ এখন দর্শকদের দিকে। এই অবস্থায় পরিচালক জুমিং এর মাধ্যমে তার মুখের কাছে গিয়ে দৃশ্যটি ফ্রীজ করে দেন। দৃশ্যটি এক অনবদ্য ব্যঞ্জনা লাভ করে। ছবির এই শেষ দৃশ্যের ফ্রীজের মাধ্যমে দর্শকরা ছেলেটির ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা নিয়ে বাড়ী ফেরেন। ফ্রীজকে অনেক ক্ষেত্রে প্রথম দিকে 'Stopped-action photography' বলা হত। একালে ফ্রীজ কথাটাই অধিক পরিচিত। এখানে প্রসঙ্গতঃ ফ্রীজ এবং 'ষ্টীল' এর পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা থাকা উচিত।

কেননা দুটোর প্রভাব আলাদা। সাধারণতঃ ডকুমেন্টারী ছবিতে কোনো ঐতিহাসিক জিনিসের বর্ণনায় বা কারুর প্রতিকৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'ষ্টীল ফটো' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ফ্রীজ হল মূলতঃ কোনো চলিষ্ণু ক্রিয়ার একটা খণ্ডাংশ যা হঠাৎ মুহূর্তের জন্যথেমে আবার পূর্বের ন্যায় চলতে থাকে। কন ইচিকওয়ার 'The key' ছবিতে তিনি তাঁর চরিত্রদের প্রথম আবির্ভাব দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে চরিত্রদের এক একজনকে এক এক মুহূর্তের জন্য পর্দার সামনে নিশ্চল করে দিয়েছেন। এখানে ইচ্ছে করেই ষ্টীল ব্যবহৃত হয়েছে। ফ্রীজের প্রতিকূল ব্যবহারও যদি প্রয়োজন মতো ঠিক স্থানে করা যায় তবে কৌকতুকর পরিবেশও সৃষ্টি করা যায়। মিলোস ফোরম্যানের 'পিটার এ্যাণ্ড পাভলা' ছবিতে ফ্রীজের ব্যবহারে এইধরনের কমিক এফেক্ট তৈরী হয়েছে। ছবির এক প্রধান চরিত্র তার ছেলের কাছে গম্ভীর ব্যক্তিত্ব অটুট রাখতে চান কিন্তু পারেন না। একদিন তাঁর এক বন্ধু তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং যাবার সময় বলেন 'এখানে এসে খুব মজা পেলাম বেশ চিত্তাকর্ষক মনে।' এর উত্তরে ছেলেটির বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে চেষ্টা করেন 'আসলে এটা হচ্ছে গিয়ে ʼ। তাঁর কথা শেষ হয় না। তিনি ঠিক উত্তর দেবার জন্য সঠিক শব্দ বলার চেষ্টা করতে থাকেন, তাঁর মুখ খোলা অবস্থায়। এখানে এক দীর্ঘ ফ্রীজ শটে ছেলেটির বাবার মুখটি খোলা থাকে এবং ছবি শেষ হয়। সমস্ত দৃশ্যটাই একটা সূক্ষ্ম কৌতুকজনক পরিবেশের মধ্যে সমাপ্ত হয়। সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবির শেষ দৃশ্যের এক অনবদ্য ফ্রীজের মাধ্যমে সমগ্র ছবিটার চূড়ান্ত শিল্পত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। অবসন্ন চিত্ত, ব্যথিত-হৃদয় ভূপতি বাড়ী ফেরে, চারু দরজা খুলে ভূপতিকে গ্রহণ করতে যায়। দুজনে হাত বাড়ায়। কিন্তু হাতে হাত স্পর্শ হবার আগেই ফ্রীজ শটে তাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। তাদের

দাম্পত্য জীবনে আসন্ন ভাঙন প্রতীত হয়ে ওঠে। এই শেষ দৃশ্যের ফ্রীজ ব্যবহারে সত্যজিৎ মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম মানস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা গড়ে তোলেন। সত্যজি-তের 'প্রতিদ্বন্দ্বী ছবির শেষ দৃশ্যেও ফ্রীজ-এর বাবহার ঘটেছে। ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ চাকরী নিয়ে বালুরঘাট চলে আসে। হোটেলের ছাদে দাঁড়িয়ে দূরাগত শববাহকের ধ্বনি তাকে যেন অতর্কিতে পাখীর ডাকের সঙ্গে অতীতকে ফিরিয়ে দেয়। সে দর্শকদের দিকে ফিরে চলতে শুরু করলেই ফ্রীজর নিশ্চলতা তাকে থামিয়ে দেয়। ছবি শেষ হয়। মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম' ছবিতে ফ্রীজ এবং ষ্টীল ব্যবহৃত হয়েছে। আজকাল হিন্দী ছবিতে অহরহ ফ্রীজের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে যার বেশীর ভাগ যুক্তিহীনতায় ভরা। যেখানে সেখানে অযৌক্তিকভাবে এই সব ফ্রীজ ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পের যে কোনো টেকনিকই যদি এলোমেলো এবং নির্বোধের মতো ব্যবহার করা হয় তবে তখন আর তার কোনো শিল্পত্ব থাকে না। কেবল একটি ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে যায়। হিন্দি ছবিতে আজকাল যথেচ্ছভাবে যে সব ফ্রীজ ব্যবহৃত হচ্ছে তার অধিকাংশই এই ব্যাধির প্রভাব।

সমস্ত প্রকারের গতিরই স্থান ও কালগত মাত্রা আছে। কিন্তু চলচ্চিত্রের সুবিধা এই যে এ শিল্পে পরিচালক ইচ্ছে করলে এই স্থানকালগত সময়কে একবারে ভেঙে তার মাত্রাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। অর্থাৎ সময় ও সময়হীনতা সিনেমাশিল্পে স্রষ্টার ইচ্ছার অধীন। চলচ্চিত্রে তাই সময় ব্যপারটাই প্রধান বিষয়। এ শিল্প এমনই এক প্রকাশ-মাধ্যম যে এখানে সময়ের মাত্রা অনন্ত বিস্তৃত হতে পারে এবং স্থানগত মাত্রা শূন্যও হতে পারে। সবই নির্ভর করছে পরিচালকের স্বকীয় উপলব্ধির ওপর। 'Ode on a Grecian Urn' কবিতায় কীট্‌স্ লিখেছিলেন 'Forever wilt thou love and she be fair' এই বর্ণনাটি কোনো ছবির মাঝখানে হঠাৎ এইভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে এবং কবির বর্ণনার মতোই এই চরণটির নিশ্চল সমতানের আভাস দিতে পারে। চলচ্চিত্রের ফ্রীজ এই হঠাৎ থেমে থাকা ঐক্যতানের স্ফুলিংগকে তুলে ধরে। অনন্তে প্রবাহিত সময় এই ফ্রীজের মাধ্যমে ক্ষণিক বিরতির ব্যঞ্জনা এনে দেয়।

স্লো-রিভার্স ও এ্যাক্সিলারেটেড মোশন্

জন্মসূত্রেই গতি এবং সময় এ দুটো ব্যাপারই চলচ্চিত্র শিল্পের মাধ্যমগত উপাদান হিসেবে কাজ ক'রে এসেছে। সেই শুরু থেকে আজকের সাম্প্রতিকতম সিনেমার প্রকরণে সময় আর গতি নিত্য নোতুন সংজ্ঞা আর প্রকাশ স্বরূপে চিহ্নিত হচ্ছে। কেউ সময়কে ভাঙছেন নিজের শিল্পধারার স্বকীয় অনুচিন্তায়, কেউ তাঁদের ছবিতে গতি অর্থাৎ মুভমেন্টকে গ'ড়ে নিচ্ছেন এক এক আশ্চর্য শিল্প দক্ষতায়। অথচ প্রাথমিক উপাদানরূপে দুটো বিষয়ই কাল থেকে কালান্তরে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রাকরণিক সুষমায় প্রত্যেক মুহূর্তে নোতুন, অভিনব হ'য়ে উঠছে।

স্লো মোশন্ঃ সাধারণভাবে স্লো মোশন্ ব্যাপারটি চলচ্চিত্রের গোড়া থেকে স্বপ্ন, রূপকথা এবং বিয়োগান্ত কোনো দৃশ্য পর্যায়ের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা যায় রুদ আঁতা লরা ১৯২৩ সালে নির্মিত তাঁর 'Faits Divers' ছবিতে প্রথম নাটকীয় ভঙ্গীতে স্লো মোশনের ব্যবহার করেন। গাণিতিক হিসেবে এ পর্যন্ত বহু অসংখ্য ছবিতে এই রীতির ব্যবহার ঘটেছে, তার সব কটিই কিন্তু শিল্পসম্মত এবং বুদ্ধিদীপ্ত নয়। কোথাও এর ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে আবার মননশীল পরিচালকের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে কখনো এই কৌশলের ব্যবহার অনবদ্য শিল্প ব্যঞ্জনা দান করেছে। Storm over Asia ছবিতে যখন সৈন্যবাহিনী জনৈক বন্দীর প্রাণদণ্ডের জন্য তাদের হাতের বন্দুক উঁচু করে তখন এই দৃশ্যে স্লো মোশনের ব্যবহার তাদের অনীহার ভাবটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। ককতো তাঁর "অরফী" ছবিতে একটি দৃশ্যে অদ্ভুতভাবে স্লো মোশন্ ব্যবহার করেছেন। যখন কবি গাড়ীচালকের সাহচর্যে মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর মিলন স্থানে চলেছেন তখন স্লো মোশনে তাঁর চলার ভঙ্গীটি বহুক্ষণ দর্শকদের মনে একটা অশরীরী অস্বচ্ছ আবেশ সৃষ্টি করে রাখে। সাধারণভাবে স্লো মোশন্ কৌশলটি চলচ্চিত্রে নানাবিধ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে কাজে লাগলেও একালের ছবিতে পরিচালকরা এই রীতিটাকে কোনো চরিত্রের খণ্ড মুহূর্তের আনন্দ উল্লাস বা পরম সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি স্বরূপ ছবির পর্দায় তুলে ধরেন। সিডনি লুমেট তাঁর 'পন ব্রোকার' ছবিতে

স্ট্যাঙ্গেরম্যান-এর স্মৃতির বিভিন্ন অংশে এই স্লো মোশন্ ব্যবহার করেছেন। তার মনে পড়ে যায় তার পরিবারের শেষ বনভোজনের স্মৃতি যার পর তার পরিবার নাৎসিদের দ্বারা বন্দী হয়। এই স্মৃতির দৃশ্যপটে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্ট্যাঙ্গেরম্যানের মানসিক বৈপরীত্য ধরা পড়েছে অপূর্বভাবে। কোথাও এই রীতি ছবির দৃশ্যপটে এক অনবদ্য কাব্যিক ব্যঞ্জনা এনে দেয়। ক্লদ লেলুশ তাঁর 'A Man and A Woman ছবিতে কাব্যিক ভঙ্গিতে স্লো মোশন্ কাজে লাগিয়েছেন। প্রেমিক ও প্রেমিকা দুজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকতে ভ্রাম্যমাণ। তাদের উভয়ের আনন্দ উচ্ছল আচরণ সূর্যকরোজ্জ্বল বালুকাবেলায় এই স্লোমোশনে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। আর্থার পেন তাঁর Bonnie and Clyde ছবিতে এই কৌশলটিকে অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন যেখানে স্লো মোশন্ সমগ্র দৃশ্য পর্যায়ে এক চূড়ান্ত ট্রাজিক পরিণতি দর্শকদের আবিষ্ট করে। বিরোধী পক্ষের গুলিতে বিধ্বস্ত হয়ে বনি এবং ক্লাইড মৃত্যু বরণ করছে। তাদের অনমনীয় দুঃসাহস, তাদের প্রবল পরাক্রম শক্তিশালী গোষ্ঠীর আচমকা আঘাতে বিপর্যস্ত, তাদের দেহ ক্রমে গুলির আঘাতে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। পরিচালক এখানে টুকরো টুকরো দৃশ্য সমন্বয়ে স্লো মোশনে তাদের নির্মম মৃত্যু এবং চূড়ান্ত পরিণামকে এক করুণ পরিবেশের মধ্যে প্রকাশ করেছেন যার চলচ্চিত্রিক প্রয়োগ এক কথায় অনবদ্য। আইজেনষ্টাইনের বিখ্যাত October ছবিতে জারতন্ত্রের পরাক্রম ভেঙ্গে পড়ছে। এই ছবিতে পরিচালক নোতুন বিপ্লবের উত্থান এবং জারতন্ত্রের পতনকে প্রতীকময় ক'রে তুলেছেন স্লো মোশনের ব্যবহারে। আমরা ছবিতে দেখেছি পরাক্রম আর স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিভূ বড় বড় মূর্তিগুলো একে একে মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য পর্যায়টিতে স্লো মোশন্ ব্যবহৃত হয়েছে যা একান্তভাবে চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা। শোনা যায় জ্যাঁ এ্যাপস্তাঁ্যা তাঁর The Fall of the House of Usher' ছবিটি সম্পূর্ণ স্লো মোশনে তৈরী করেন। এ ছবির কাহিনী এডগার এ্যালান পো'র গল্পকে আশ্রয় ক'রে নির্মিত হয়েছিল। আসলে স্লো মোশনে পরিচালক সম্ভবতঃ পো'র রহস্যময় কাহিনীর বিশেষ বাঁককে প্রত্যেক দৃশ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতেও খুব অল্প সময়ের জন্য স্লো মোশনের ব্যবহার আছে। সিদ্ধার্থ সারাদিনের ক্লান্তির পর চৌরঙ্গী পাড়ার কোনো এক পুকুরের ধারে বসে আছে। পুকুরের জলে প্রতিভাত পড়ন্ত বেলার সূর্য। ধীরে ধীরে তার অতীত ঘিরে আসছে। এখানে পরিচালক কয়েক মুহূর্তের জন্য স্লো মোশন ব্যবহার

করেছেন সেখানে দেখা গেছে সিদ্ধার্থ আর তার ছোট বোন দূর থেকে দর্শকদের মুখোমুখি ছুটে আসছে। তত্ত্বগত দিক থেকে বলা যায় যে যখন ক্যামেরা স্বাভাবিক গতির একেবারে দ্বিগুণ গতিতে কাজ করে, তখন প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮টি ফ্রেম গৃহীত হয় এবং যখন এই অংশকে স্বাভাবিক গতিতে প্রোজেকশনের মাধ্যমে প্রতি সেকেণ্ডে ২৪টি ফ্রেমে প্রবাহিত ক'রে পর্দায় দেখানো হয় তখন তা স্লো মোশনের রূপ নেয়। আবার বিপরীতভাবে বলা যায় যে যখন কোনো দৃশ্য স্বাভাবিকের থেকে অর্দ্ধেক গতিতে ক্যামেরায় গৃহীত হওয়ার পর পর্দায় স্বাভাবিক গতিতে প্রতিফলিত তা এ্যাক্সিলারেটেড মোশনের রূপ নেবে। প্রত্যেক চলচ্চিত্র অনুসন্ধানীরই নিশ্চয়ই এ তথ্য জানা যে রুশ পরিচালকরাই উত্তমরূপে স্লো মোশন আর এ্যাক্সিলারেটেড মোশনকে সম্পাদনার এক বিশিষ্ট উপাদানের অনুষঙ্গে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন এবং পরিমার্জিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে পুদভকিনের সেই বিখ্যাত বর্ণনার কথাও স্মরণে থাকা উচিত, যেখানে তিনি এক ঘটনাক্রমে জনৈক লোককে ঠিক বৃষ্টির অব্যবহিত পরে কাস্তে হাতে ঘাস কাটতে দেখেছিলেন। এই ঘটনাটি তাঁর অভিজ্ঞতায় যে detail বর্ণনায় এবং পর্যবেক্ষণে ধরা দিয়েছিল তাকে তিনি সিনেমার স্লো মোশনের আঙ্গিকে পরিকল্পনা করেছিলেন।

'এ্যাক্সিলারেটেড মোশন'ঃ কৌশলটি সেই পুরানো আমল থেকে কমিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছবিতে ব্যবহৃত হ'ত। যাঁরা ম্যাক সেনেট, ম্যাক্স লিনডার, বাসটার কীটন বা চ্যাপলিনের ছবি দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে এঁদের অনেক ছবিতেই মজার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক গতির থেকে অনেক দ্রুত গতির ব্যবহার দেখা গেছে। এই অস্বাভাবিক দ্রুত গতিই চলচ্চিত্রের ভাষায় এ্যাক্সিলারেটেড মোশন হিসাবে পরিচিত। বস্তুতঃ এ্যাক্সিলারেটেড মোশন কৌশলটির যে দৃশ্যগ্রাহ্য মজা আছে তা অন্য কোনো শিল্প মাধ্যমে কোনোভাবেই প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এটা একান্ত ক্যামেরার প্রক্রিয়া। এই কৌশলটি ছবিতে কোনো এ্যাভভেঞ্চারের উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে বা ক্রাইম ছবির ধাবন দৃশ্যের (Chasing Scenc) ক্ষেত্রেও সুপ্রযুক্ত হয়। ক্রাইম ছবির ঘটনা সংঘাতে যেখানে কোনো পলায়ন দৃশ্য চলছে সেখানে একদল আর একদলের পিছনে প্রচণ্ড আক্রোশে ধাবমান। এখানে অস্বাভাবিক গতি সংগতভাবেই পর্দায় যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তার থেকে ছবির মূল অংশের নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি হয়। আবার এই কৌশল কৌতুককর দৃশ্যেরও

অবতারণা করে খুব সহজে। যেমন ধরা যাক একজন ছুটে পালাচ্ছে, তার দৌড়ানোর আশটা যদি স্বাভাবিকের থেকে অস্বাভাবিক গতিতে পর্দায় প্রতিফলিত হয় তবে মজার পরিবেশ সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। চ্যাপলিনের 'দ্য কিড' ছবিতে বাচ্চাটিকে জোর ক'রে একজন গাড়ীতে ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে। চ্যাপলিন উর্দ্ধশ্বাসে তাকে তাড়া করেছে। শেষ পর্যন্ত তার হাত থেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে লোকটিকে তেড়ে যায়, লোকটি প্রচণ্ড বেগে দৌড় দেয়। এখানে চ্যাপলিন খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবেই এ্যাক্সিলারেটেড মোশন ব্যবহার করেছেন যা ঐ অংশে ভীষণ ভাবে কৌতুকের সৃষ্টি করে। ফরাসী সমালোচক আর্মা কোলিয়ে খুব সুন্দর ভাবে স্লো মোশন আর এ্যাক্সিলারেটেড মোশন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

"Accelerated motion is comic because the pace overwhelms us, our only resourse is to laugh. Slow motion is tragic because slowing down time makes it intcrminable, untbara-ble. The tragic is the absence of any issue : Slow motion removes issues, accelerated motion multiplies them",

রিভার্স মোশন ঃ কৌশলটিও চলচ্চিত্রে অনেক ক্ষেত্রে কৌতুক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে রিভার্স মোশনের ব্যবহার কম দেখা যায়। প্রথম দিকে সাধারণতঃ কমিক বা ম্যাজিক জাতীয় এফেক্টের জন্য সিনেমায় রিভার্স মোশনটিকে ব্যবহার করা হত। একালে অনেক সীরিয়াস ছবিতে ও গভীর ভাবনামূলক ছবিতে পরিচালকরা এই কৌশলটিকে নোতুন তাৎপর্যে ব্যবহার করছেন। বরোজিক তাঁর 'Renaissance' নামের শর্ট ফিল্মে অত্যন্ত তাৎপর্যের সঙ্গে এই কৌশলটিকে ব্যবহার করেছেন। যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি পরিবারের বাড়ীর একটি কক্ষ। চারিদিকে সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। হঠাৎ আস্তে আস্তে ঘরের সেইসব বিধ্বস্ত বস্তুগুলো আবার তাদের পুরোনো শরীর সংস্থানে ফিরে যাচ্ছে। দর্শকরা দেখেন ভাঙ্গা টেবিলটা আবার আস্তে আস্তে জুড়ে যায়। দেওয়ালের ফটোটা জোড়া লেগে যায়, টেবিলের পুতুলটা, বাঁশীটা, কাঁচের প্লেট, এমনকি ছোট অর্গানটাও একে একে জোড়া লেগে যায়। এই পিছন থেকে সামনে আসা অর্থাৎ অতীত থেকে বর্তমান দৃশ্য সংস্থানে ফিরে আসার ক্যামেরা-প্রক্রিয়াই চলচ্চিত্রে রিভার্স মোশন নামে পরিচিত। রিভার্স মোশন যে কতো অসাধারণ নৈপুণ্যে গভীর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে

এই ক্ষুদ্র চিত্রটি তার নিদর্শন। ছবির নামের সঙ্গে কৌশলটির ব্যবহার এত সুপ্রযুক্ত যে অল্প সময়ের এই ছবিটি সমগ্র দর্শকদের অতীতের মনোরম পরিবেশ ও যুদ্ধে তাদের সমূল ধ্বংসের কারুণ্যকে অনবদ্য শিল্প ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করে। আইজেনস্টাইনও তাঁর বহু খ্যাত October ছবিতে ভেঙে যাওয়া বিরাট সমস্ত মূর্তির পুনরায় জুড়ে যাওয়া দেখিয়েছেন এই রিভার্স মোশনে। জারের মূর্তি যা পূর্বে চূর্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সেটি আবার রিভার্স মোশনে জোড়া লেগে যাচ্ছে। অর্থাৎ পরিচালক প্রতীকের মাধ্যমে পুরাতন জারতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকে ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন।

রিফ্লেক্স প্রোজেকশন

সিনেমা শিল্পের দীর্ঘদিনের ইতিহাসে অনেক ওঠা পড়ার সূত্র আবিষ্কার কৌতূহলী দর্শকদের অনুসন্ধানের দাবী রাখে। একালের চলচ্চিত্রে সমগ্র প্রযোজনার মধ্যে শিল্প নির্দেশনার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সিনেমার শিল্প প্রকরণের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা নিহিত। আধুনিক কালে এক দিকে সিনেমা নির্মাণে বাস্তবতা অনুযায়ী সেট নির্মাণে যেমন চলেছে কল্পনাতীত অযুত অর্থে দ্বিধাহীন ব্যয় বহুলতা, অপরদিকে শিল্পকারিগর তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত প্রচেষ্টা সেট নির্মাণে প্রয়োগ করছেন। অভিনব যান্ত্রিক কুশলতা যা বাস্তবতার যথার্থ প্রতিবাদন করেও অর্থ নৈতিক ব্যয়ভার লাঘব করেছে অনেক পরিমানে। এই ধরনের এক স্বল্প ব্যয়ের সেট নির্মাণের কাজে 'রিফ্লেক্স প্রজেকশনের' সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আর এমনি ভাবেই চলছে অপরিমিত ও পরিমিত অর্থের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা—শিল্পের খতিয়ানে স্থায়ীত্ব কতটুকু তার উত্তর দেবে অনাগত কালের সিনেমা শিল্পের ইতিহাস।

যে 'রিফ্লেক্স প্রজেকশন'-এর প্রয়োগ আমরা য়ুরোপে প্রথম দেখি '২০০১—স্পেস অডিসি' এবং 'হোয়ার ইগলস ডেয়ার' ছবিতে', তাই নিয়ে হলিউডে হৈ চৈ পড়ে গেছে। বড় বড় স্টুডিও গুলোতে সাজ-সাজ রব উঠেছে। যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে পুরো-দমে। এম-জি-এম, বাক্স, প্যারামাউন্ট রয়েছে তাদের সকলের আগে। এটা আসলে কী জিনিস ? প্রচলিত ব্যাক প্রজেকশন বা ট্রাভেলিং সটের সঙ্গে এর তফাৎটা কী ? অবশ্য ব্যাকগ্রাউণ্ড প্রজেকশন বা ট্রাভেলিং ম্যাট এখনো পুরানো হয় নি। রিফ্লেক্স প্রজেকশন এদের ডুবিয়ে দেয় নি। এখনো ছোট স্টেজের ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউণ্ড প্রজেকশন দিয়েই ছোট সেটের সাহায্যে বড় স্টেজের চেহারা আনা হয়। আসলে, রিফ্লেক্স প্রজেকশন হচ্ছে একটা নতুন হাতিয়ার যা বেশ বড় অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ ; একে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পরিচালক বা শিল্প নির্দেশকই পারেন। এখানে ক্যামেরার স্বাধীনতা অনেক বেশী। 'ওয়াইড এ্যাঙ্গেল লেন্সের' যথেচ্ছ সদ্ব্যবহার করে সেটের চেহারাকে বিশাল করা যায়। ক্যামেরাকে ইচ্ছামতো 'প্যান' বা 'জুম' বা 'টিল্ট' করানো সম্ভব। মিনিয়েচার বা মডেলের ছবি তুলে তার বিরাট জায়গা জুড়ে প্রজেকশন। তাহলেই

ক্যামেরার স্বাধীন চলাফেরা। সেন্টপলস গীর্জার ভেতরকার দিকে চূড়ো থেকে ক্যামেরা প্যান করে ছবি তোলা হ'ল। তার প্রজেকশনে সেটের যে চেহারা আসবে, তা প্রচুর ব্যয় করেও সম্ভব নয়; তৈরী করতে গেলে প্রযোজকদের মাথা ঘুরে যাবে। স্টুডিওর ভেতর থেকেই ওয়েষ্টমিনিষ্টারএ্যাবিকে দেখানো যাবে। এ্যাবির রিফ্লেক্স প্রজেকশনের সামনের স্টুডিওর স্টেজ সেট। প্রজেকশনের সুবিধে মতো জায়গা খানিকটা কেটে বাদ দিয়ে সেটের দরজা বসিয়ে তার ভেতর দিয়ে অভিনেতাদের যাওয়া আসা চলবে। সামনে সেটের আর সব প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র মনে হবে যেন আসল ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবিতেই ছবি তোলা হয়েছে।

ধরা যাক বাকিংহাম প্যালেসের কোন ব্যালকনির দৃশ্য। প্যালেসের রিফ্লেক্স প্রজেকশনের সুবিধে মতো জায়গায় সেটের ব্যালকনি, সেখানে অভিনেতারা নিজের অভিনয় করে যাচ্ছেন। মনে হবে প্যালেস থেকেই ছবি তোলা অথচ প্যালেসের ব্যয়বহুল পুরো সেট বানাতে হল না। ছোট স্টেজেও এই পদ্ধতি কাজে আসে। একশ ফুট প্রশস্ত সেটে আমাদের দৃশ্যর সঙ্গে মানানসই রিফ্লেক্স প্রজেকশন দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া যায়। অন্য দিকে স্টুডিও দৃশ্যকে অনেক ছোট করে দেখানো যেতে পারবে। জীবজন্তু বা অন্যকোন পরিচিত বস্তুর বড় আকারে প্রজেকশন করে। এগুলো কয়েকটা উদাহারণ মাত্র। শিল্প নির্দেশক তাঁর কল্পনার সাহায্যে চিত্রগ্রহণের এই নতুন মাধ্যমকে প্রয়োগ করে ছোট বড় অনেক কিছু করতে পারেন। যান্ত্রিক দিক থেকে দেখতে গেলে এর যন্ত্রপাতি খুবই সহজ। ক্যামেরা, আয়না আর মোবাইল ডলিতে আটকানো মুভি বা সিট প্রজেকটর, ব্যাস হয়ে গেল। এগুলো যতো অভিজাত ধরনের হয় ততোই ভালো। আর এর জন্যে স্টুডিওর ইঞ্জিনীয়াররা রয়েছেন। ষ্টানলি কুব্রিকের '২০০১-এ' ৮''×১০'' রঙীন ষ্টিল প্লেট প্রজেকশনের এক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল যাতে পুরো প্রজেকশনের ১:৫ অংশ ক্যামেরা জুম্ করিয়ে 'গ্রেন-ফ্রি' 'রিফটোগ্রাফী' সম্ভব হয়েছিল। 'গ্রেনিনেস এর' অসুবিধা পেরিয়ে 'ব্যাকগ্রাউণ্ড ডিটেল' অনেক বেশী দেখানো গেছে। ৭০ মিলিমিটার বা তার চেয়ে বড় 'ফরম্যাটের' প্রজেকশন থেকে চলন্ত ব্যাকগ্রাউণ্ড প্রজেকশনেরও ঐ একই রকম 'গ্রেন ফ্রি' ডিটেলের জন্যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অভিনয়ের যেমন একটা মঞ্চ আছে, ছবি তৈরীর ক্ষেত্রেও তেমনি এক নতুন মঞ্চ রূপে এসেছে রিফ্লেক্স প্রজেকশন পদ্ধতি। তবে এর বেশ কিছুটাই অজানা।

তাই এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার এখনো সম্ভব হয় নি। আমাদের (বিশিষ্ট কলা-কুশলীদের) একে তাচ্ছিল্য করা ঠিক হবে না। বরং এর ব্যবহার বাড়াতে হবে। খরচের দিকটা ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে আমাদের স্টুডিও-গুলোতে এ দিয়ে অনেক অনেক ছবি উঠবে। এবং এর থেকে আরো নতুন সহজ পন্থার আবিষ্কার হবে, যাতে খরচ এবং সময় দুই ই কম লাগবে ছবি করার জন্য।

এ্যানিমেশন

যে কোন বস্তুই গতি সম্পন্ন হ'লে তাকে এ্যানিমেশন হিসাবে গণ্য করা চলে। কেননা বস্তুর গতির মধ্যেই এ্যানিমেশনের ধর্ম লুকিয়ে থাকে। কিন্তু চলচ্চিত্রে যখন 'এ্যানিমেশন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন এর তাৎপর্য অনেক গভীর অর্থবহ হ'য়ে ওঠে। সিনেমার জন্মলগ্নের কয়েক বছর পর, সেইকালের আদি দর্শকদের কাছে এ্যানিমেশন অনেকটা ম্যাজিকের মতো প্রতিভাত হয়েছিল। ফ্রান্সে এমিল কোল তাঁর দেশলাইয়ের সাদা ছোট ছোট কাঠি নিয়ে কালো বোর্ডের বিপরীতে ১৯০৮ সালে পরীক্ষা শুরু করেন। পরের বছর আমেরিকার উইনসর ম্যাকে দশ হাজার ছবি এঁকে একটি এ্যানিমেটেড ফিল্ম প্রয়োজনা করেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সিনেমার দর্শকরা এই এ্যানিমেশন কৌশলটিকে নিছক মজা আর মনোরঞ্জন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আসলে সবাক চলচ্চিত্রের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত এ্যানিমেশন নিজের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত এ্যানিমেশন হয়নি। ফিল্মের যাদুকর শিল্পী ওয়াল্ট ডিজনে ১৯২৩ সালে Little Red Riding Hood নামে একটি কার্টুন তৈরী করেন এবং ১৯২৮ পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁর মিকিমাউস্ সিরিজের সবাক শিল্পরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য। এবং বলাবাহুল্য যে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৮ এই কালসীমায় তাঁর 'মিকি মাউস', 'ডোনাল ডাক' এবং 'সিলি সিম্ফনী সিরিজে'র চূড়ান্ত সাফল্য ঘটে। এরপরই ডিজনে সর্বপ্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কার্টুন ছবি তৈরী করলেন 'Snow White and the Seven Dwarfs'। রং, শব্দ, সংগীত সব মিলেমিশে এবার কার্টুন ছবিকে পরিণত শিল্পের মাধুর্য এনে দিল। এ্যানিমেশন ফিল্ম স্বকীয় চরিত্রে সমুন্নত হ'ল। আসলে যেখানে জীবন্ত চরিত্রের (live-action) চলচ্চিত্র নির্মাণের বিরতি, এ্যানিমেশন ছবির মৌলিক চরিত্রের যাত্রার শুরু সেইখান থেকেই।

এ্যানিমেশনের প্রাথমিক স্তরে কতগুলো প্রধান টেকনিক কর্যকরী ছিল পরবর্তীকালে যার অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছে। যেমন প্রথমতঃ অংসখ্য টুকরো টুকরো কাগজে অঙ্কিত রেখাচিত্রের ক্রমিক ফটোগ্রাফ গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ নেগেটিভ ফিল্মের ওপর এগুলোর বিপরীত প্রতিলিপি আটকে পর্দায় প্রক্ষেপণ,

যার ফলে কালো রংয়ের পটভূমিকায় সাদা মূর্তির প্রতিচ্ছবি তৈরী হয়, তৃতীয়তঃ সিল্যুট ছবি খুব সহজ নির্মিতির বিবর্তন যা সাদা কাগজের ওপরে আটকে তৈরী করা হত। চতুর্থতঃ কার্টুন ছবির পিছনের পটভূমিকার ক্রমশঃ উন্নতিসাধন, পঞ্চমতঃ মূর্তি এ্যানিমেশনের উদ্ভব, ষষ্ঠতঃ সেল্ এ্যানিমেশনের আবিষ্কার। মার্কিন শিল্পী আর্ল হার্ডই প্রথম যিনি ১৯১৫ সালে এই সেল্ প্রথার এ্যানিমেশনের কৌশলটির সর্বস্বত্ব রক্ষা করেন। এরপর বিল নোলন নামে আর একজন শিল্পী কার্টুন ছবির পিছনের পটভূমিকার বিস্তৃত দৃশ্যাবলীর গতিময়তা আনলেন। আসলে সেল্ এ্যানিমেশন প্রথাই সব রকমের উন্নত কার্টুন ছবির টেকনিক। আমেরিকার কমিক স্ট্রিপ জাতীয় ছবিই মার্কিন কার্টুনের উৎস বলে ধরা হয়। আর আমেরিকায় তাই দৈনিক পত্রের কমিক স্ট্রিপ আর ফিল্ম কার্টুন একই সঙ্গে পাশাপাশি প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বিবর্তিত হয়েছে। আমেরিকায় কার্টুনের আর একটা বড় অবদান হ'ল ছবির কার্টুন চরিত্রগুলি ও বস্তুর গতি সম্পর্কিত সময়কেন্দ্রিক ভাবনা। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে একালে রাশিয়ায় যে সমস্ত উন্নত ধরনের কার্টুন ছবি তৈরী হয় তার মধ্যে সাধারণ জীবনযাত্রার জীবন্ত চরিত্রের মতো ছন্দ অনুসৃত হয় যা তাদের লোকগাথা থেকে গৃহীত। পাশ্চাত্য রীতির কোনো সমান্তরাল অনুকরণ রুশ কার্টুন ছবিতে সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় না।

এ্যানিমেশন শিল্পী কাগজের ওপর যে চিত্র আঁকেন সেটাত তাঁর নিজস্ব জগৎ। সেখানে ব্যবহারিক জগতের অনেক সত্যাসত্য সব সময় স্বীকৃত হয় না। যেমন এ্যানিমেশন ছবির পাত্র পাত্রীদের গতিবিধি, তাদের চলার ছন্দ ও অতিরিক্ত গতিময়তা এ সবই এ্যানিমেশন চিত্রকরের কল্পনা অনুসারে গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে এ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে তিন ধরনের গতির ব্যবহার দেখা যায় যা নিউটন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ যে বস্তু বা শরীর প্রথমাবধি স্থির তা নিশ্চলরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং যা গতিসম্পন্ন তা সাধরণতঃ সচল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য। দ্বিতীয়তঃ এই বস্তুসমূহের চলনভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটবে একমাত্র বহিরাগত কোনো শক্তির সাহায্যে। সাধারণ এই বস্তুসমূহের সঞ্চরণ ঘটবে সোজাসুজি যতক্ষণ না কোনো অন্য শক্তি দ্বারা তার গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক গতিরই একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। মোটামুটি এই তিন ধরনের গতিতত্ত্বকে অবলম্বন করেই এ্যানিমেশন শিল্পীকে কাজে নামতে হয়। কার্টুন এ্যানিমেশন এবং প্রকৃত জীবনের মধ্যে তফাৎ যেটা সেটা হ'ল তত্ত্ব প্রয়োগের কতকগুলো নান্দনিক সূত্র। কার্টুন শিল্পী সাধারণতঃ রেখাচিত্রের মাধ্যমে

প্রাথমিকভাবে বস্তু বা মূর্তির আভাস দেন যা প্রকৃত ব্যবহারিক জীবনের আয়তনের ইংগিত দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কার্টুন শিল্পী এমন ভংগির ছবিও ইচ্ছে করলে আঁকতে পারেন যার সঙ্গে ব্যবহারিক প্রকৃত জগৎ ও জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি ইচ্ছে করলে একেবারে বিমূর্ত কোনো আকার ও গড়ে তুলতে পারেন। এখন এইসব বিমূর্ত বস্তু বা চরিত্র যখন নিজেদের মতো গড়ে ওঠে তখন তারা অনেক সময় রূপকের আশ্রয়ে আসল জগতের একটা প্রতিরূপও অনেক সময় তৈরী করে, যেমন নরম্যান ম্যাকলারেনের 'ব্লিংকিটি ব্ল্যাঙ্ক' ছবির কমিক মুরগির ছানা চরিত্রটি। কার্টুন ফিল্ম তৈরীর ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের দিক, তা হ'ল যে এ ছবি নির্মাণের সময় যেসব জীবজন্তু বা মানুষের মূর্তির ছবি আঁকা হয় তাদের গতিবিধি ও কার্যকারণ ঠিক তাদের অঙ্কিত চেহারাসদৃশ্য হওয়া একান্ত দরকার এবং এই ব্যাপারটা সাধারণতঃ স্বাভাবিক আকৃতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে করা হয়ে থাকে। যেমন বড় বড় চোখ, বিরাট নাক, বড় মুখ, বিরাট মাথা, খুব ছোট্ট শরীর ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে Visual symbol ব্যবহার করা হয় যা দিয়ে অনেক অদৃশ্য অনুভূতিকে আঁকার মাধ্যমে পদায় দেখানো যায়। যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস, ঝোড়ো হাওয়া ইত্যাদি রেখাচিত্রের মাধ্যম পর্দায় ধরা হয় যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না অথচ অনুভব করা যায়। কার্টুন ছবিতে সময়কে যেভাবে ব্যবহার করা হয় তারও খুব গুরুত্ব আছে। কার্টুন চরিত্র ইচ্ছে করলে এক মিনিটে বিরাট পাহাড় টপকে চলে যেতে পারে কেননা সবকিছুই চিত্রকরের ইচ্ছে অনুযায়ী ঘটছে। যদিও এ্যানিমেটেড ফিল্ম একান্তভাবে হাতে আঁকা শিল্পমাধ্যম তবু সবাক চলচ্চিত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এতে এক নোতুন মাত্রা আরোপিত হয়। সবাক চিত্রে সাধারণতঃ যে তিন ধরনের শব্দ-পন্থা ব্যবহৃত হয় যেমন (১) কণ্ঠস্বর বহনের অংশ (২) কেবল নানা ধরনের শব্দ বহনকারী অংশ ও (৩) সংগীত বহনকারী অংশ এই তিন ধরনের রীতিই সবাক কার্টুন ছবিতে অত্যন্ত প্রযত্নে সূক্ষ্ম চূড়ান্ত দক্ষতায় পারস্পরিক মিলনে কার্যকরী হয়ে থাকে। তাছাড়া কার্টুন ছবিতে সবসময়ে সংগীত প্রয়োগের একটা দারুণ গুরুত্ব আছে। এবং বস্তুতঃ কার্টুন ছবির মূল কাহিনীকারের চেয়ে ছবির সংগীতস্রষ্টা এ্যানিমেশন ছবির পরিচালকের কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হন। প্রথম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্টুনের গলা শোনা গেছে মিকি মাউস্ এবং ডোনাল ডাক চরিত্রের মাধ্যমে। তাছাড়া এই মিকি মাউস্ ও ডোনাল ডাক চরিত্রগুলি এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং টাইপেজের আকার

ধারণ করে ছিল যে ছবিতে যে কোনো মুহূর্তে তাদের গলায় স্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। দীর্ঘকাল ধরে এইসব কার্টুন চরিত্র এ্যানিমেশন ফিল্মের বিশেষ সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। জনপ্রিয় তথাকথিত কার্টুন ছবি নির্মাণের পাশাপাশি একদল শিল্পী স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষামূলক এ্যানিমেশন নিয়ে চর্চা চালিয়ে এসেছেন। এঁদের বাসনা কার্টুন ছবির শিল্পগত দিকে একটা সম্পূর্ণ নোতুন পথ খুলে দেবার। নরম্যান ম্যাক-লার্ন যিনি বেশ কয়েক বছর ধরে বিমূর্ত ও আধা-বিমূর্ত এ্যানিমেশন ছবির জনক হিসেবে সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁর ছবির স্বভাব ও শিল্প চরিত্র সম্পূর্ণভাবে তাঁর স্বকীয় ধ্যানধারণার অনুষঙ্গে গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি তিনি তাঁর 'ব্লিংকিটি ব্ল্যাঙ্ক' ছবিতে সরাসরি ফিল্মের স্ট্রিপের ওপরই ছুরি ব্লেড, সেলাই এর সূঁচ ইত্যাদি নানা বস্তুর সাহায্যে স্কেচ ক'রে এক নোতুন শিল্পরূপ গড়ে তুলেছেন। পরে তাতে তুলি দিয়ে রং করে নিয়েছেন। ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসব সর্বোচ্চ পুরস্কার অর্জন করেছে। ম্যাকলানের সব ছবির বিষয়-বস্তু আন্তর্জাতিক মিলনের সুর যা পৃথিবীর সব ধরনের মানুষ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে। "I will count myself lucky if in one and the same film I can appeal to both simple folk and the fancier kind." পিটার ফোল্ডেস্ পরিচালিত A Short Vision ছবিটি একটি কবিতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যেখানে অসংখ্য স্কেচের মাধ্যমে পরিচালক দেখিয়েছেন যে পরমাণু অস্ত্র কিভাবে মানবিক ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবে আরো অনেক শিল্পী তাঁদের কার্টুন ছবির মাধ্যমে অনেক তত্ত্বকথা, অনেক মহত্তর আদর্শের ব্যাপারে এগিয়ে চলেছেন। দর্শকদের তাঁরা বর্তমান জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নোতুন ক'রে ভাবতে শেখাচ্ছেন। কার্টুন ছবির এটা একটা খুব প্রগতিশীল প্রাগ্রসরণ।

ওয়াল্ট ডিজ্নে প্রথম শিল্পী যিনি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কার্টুন ছবি উপহার দিয়েছেন যার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা কাহিনীর আমেজ পাওয়া গেছে। যদিও তাঁর সবকটি কাহিনী কার্টুন চিত্র আর্থিক সাফল্য লাভ করেনি তবু তাঁর বেশ কয়েকটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি চলচ্চিত্র-শিল্প ইতিহাসের অন্যতম সম্পদ। যদিও তাঁর প্রায় সব ছবিই সাধারণতঃ শিশুদের উপযোগী উপকথা, রূপকথা কেন্দ্রিক কাহিনী আশ্রিত। কেবল তাঁর প্রযোজিত 'Animal Farm' ছবিটি বড়দের উপযোগী ক'রে তৈরী হয়েছিল। কার্টুন ছবি যে কেবল রূপকথা, শিশুরোমাঞ্চ

বা লোকগাথা জাতীয় কাহিনীকেন্দ্রিক হলেই ভালো হয় এমন কোনো কথা নেই। এর মাধ্যমে অনেক গভীর বিষয় ও পরিণত তত্ত্বগত ব্যাপারও প্রকাশ করা যেতেপারে তার প্রমাণ ভিজনের Man in space ছবি। এটি একটি অসাধারণ সায়ান্স ফিক্‌সান ছবি। এ্যানিমেশন চিত্রের আর একটি বিশেষ দিক আছে সেটি হ'ল পাপেট এ্যানিমেশন। আজকাল পাপেট এ্যানিমেশন বহু দেশে নির্মিত হচ্ছে। পাপেট ফিল্মের প্রথম দিকে কাঠের তৈরী মূর্তিতে সরাসরি রং ক'রে নেওয়া হ'ত। সম্প্রতি আলেক্সিএফ এবং এট্টিয়েন রাইক এই দুই পাপেট শিল্পী তঁদের অ্যানিমেশন ছবির জন্য নানা জাতীয় প্লাস্টিক ও অন্যান্য বস্তুর সাহায্যে তঁাদের পাপেটের পোষাক-পরিচ্ছদ, চেহারা ইত্যাদি বানিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের সুবিধা মতো। এবং এ ব্যাপারটা অ্যানিমেশন ছবিতে একটি নোতুন বিমূর্ত ব্যঞ্জনা দান করেছে। পাপেট এ্যানিমেশন ছবির প্রধান সমস্যা হ'ল ছবিতে মূর্তিগুলিকে নিরেট বস্তুরূপে প্রতিপাদন করা ও তাদের ত্রিতল (three dimensional) আয়তনটাকে এক একটি আলাদা আলাদা ফ্রেমের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা। হাতে আঁকা কার্টুন ছবির এ ব্যপারে ভীষণ সুবিধা রয়ে গেছে। খোদাই করা কোনো কাঠের মুখমণ্ডলটিকে এ্যানিমেশন ছবিতে গতিময় দেখাতে গেলে প্রতি এক সেকেণ্ডের জন্য চব্বিশটি ক'রে কাঠের মুখ তৈরী করতে হয়। পাপেট ফিল্মের সব থেকে যশস্বী শিল্পী চেক পরিচালক জিরি ট্রংকা তাঁর ছবিতে মূলতঃ উপকথার গল্পকেই আশ্রয় করেন কিন্তু সেখানে তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্মপ্রযত্নে তাঁর পুতুলগুলিকে এমন ভাবে গড়ে তোলেন যাদের চলাফেরা-হাবভাব হুবহু জীবন্ত চরিত্রানুগ হয়ে ওঠে। ট্রংকা একবার পাপেট ফিল্মের ক্ষেত্রে স্বকীয় ধারণা ও অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছিলেন যার থেকে 'পাপেট এ্যানিমেশনে'র মৌলিক ব্যাপারটা বোঝা যাবে। "I had my own conception of Low pupets could be handled—each of them to have an individual but static facial expression, as compared with the puppets that by means of various technical devices, can change their mien in an attempt a more life-like aspect. In practice of course, this has tended not to enhance the realism, but rather conduce to naturalism." এবারে একনজরে এ্যানিমেশন ছবির পুরো প্রযোজনার ব্যাপারটা একটু দেখা যাক তাহলে বোঝা যাবে যে যে-কোনো প্রকৃত কাহিনী চিত্রের তুলনায়

এ্যানিমেটেড কার্টুন ছবি নির্মাণে ব্যয়ের পরিমাণ ও অর্থের পরিমাণ কতোগুণ বেশী। একটি কার্টুন ছবিতে যাঁরা যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন—

(ক) প্রযোজক—(ইনি হলেন প্রধান ব্যক্তি যিনি পুরো ব্যাপারটাকে দেখাশোনা করেন।)

(খ) পরিচালক।

(গ) নক্সাকারী—(এখানে প্রাথমিক ছবি আঁকেন একজন, পটভূমিকার ছবি আঁকেন আর একজন। ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক ব্যক্তিও কাজ করেন।)

(ঘ) প্রধান এ্যানিমেটর।

(ঙ) সহকারী এ্যানিনেটর।

(চ) কালি ও রং করার জন্য দু'জন শিল্পী।

(ছ) চেকার—(যিনি সব আঁকাগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখেন।)

(জ) ক্যামেরাম্যান।

(ঝ) সম্পাদক।

(ঞ) স্টুডিও ম্যানেজার।

এছাড়া সংগীতকার আছেন যিনি স্বতন্ত্রভাবে ছবিতে কাজ করে থাকেন। যে কোনো কার্টুন ছবিই প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষও দীর্ঘ কালীন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের Live-action ছবি তৈরী করতে যেসময় ও পরিশ্রম লাগে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কার্টুন ছবি বহুগুণ বেশী পরিশ্রম আর সময়ে গড়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র-এর প্রয়োজনায় একটা ছবি তৈরী হয়েছিল। নাম 'Invition to the Dance' পরিচালক ছিলেন জীন কেলি। ছবিটি তৈরী করতে খরচ হয়েছিল এককোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। সময় লেগেছিল দু'বছর। ছবিটি যদিও আর্থিক দিকে থেকে দুর্দান্তভাবে ফ্লপ্ হয়েছিল, তবুও এ ছবিতে জীন কেলি কার্টুন আর জীবন্ত চরিত্র নিয়ে একটা অসাধারণ পরীক্ষা করেছিলেন। সমগ্র ছবিতে এ্যানিমেশন আর জীবন্ত চরিত্র পাশাপাশি মিলেমিশে মূল জিনিসটাকে ব্যক্ত করেছিল। এবং এ ছবিতে কার্টুন আর ব্যক্তি চরিত্রের বিভিন্ন নাচের দৃশ্যগুলি ছবির প্রতিপাদ্য সংলাপের কাজ করেছিল। বহু পরবর্তীকালে ওয়াল্ট ডিজ্নে প্রোডাকসন্সের 'মেরী পপিন্স' ছবিতে আমরা এই ধরনের কিছু লক্ষ্য করেছি, যেখানে জীবন্ত চরিত্র আর কার্টুন মিলে অনেক সুন্দর দৃশ্য গড়ে তোলা হয়েছে।

কাল´জেম্যান পরিচালিত বিখ্যাত ছবি 'A Jester's Tale ছবিতে পরিচালক এক রাজনৈতিক তত্ত্বকে অত্যন্ত সুন্দর শিল্পসম্মত ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন ঐ একই প্রথায়। এ ছবিতেও কার্টুন আবার জীবন্ত চরিত্রের একটা আশ্চর্য অন্বয় লক্ষ্যকরা গেছে। কার্টুন ছবি চলচ্চিত্রের এমনই এক শাখা যেখানে পাঁচ মিনিটের একটা ছবিতে ৭২০০টি স্বতন্ত্র ছবির দরকার এবং ৯০ মিনিটের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিতে ১২৯৬০০টি আলাদা আলাদা ছবির প্রয়োজন হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে কার্টুন ছবির পরিচালক কী অসীম ধৈর্য আর প্রযত্নে তাঁর শিল্প গড়ে তোলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ডিজনে শেষের দিকে ৭০ মিলিমিটারেও Sleeping Beauty নামে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রূপকথা নির্মাণ করেছিলেন যার শিল্প সাফল্যের তুলনা মেলে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এ্যানিমেশন ছবিতে যে গতির প্রকাশ, পাত্র-পাত্রীদের যে আচার-আচরণ আমরা লক্ষ্য করি তারা যেহেতু পরিচালকের স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত এবং এক ধরনের কৃত্রিম প্রথায় শিল্পীদের অঙ্কিত রেখাচিত্রের আধারে গড়ে ওঠে, সেই কারণে এ্যানিমেশন ছবির শিল্পতত্ত্ব তার জন্ম ও বিবর্তনের ইতিহাসও তথাকথিত স্বাভাবিক সিনেমা শিল্পের ব্যাকরণ থেকে স্বতন্ত্র। শোনা যায় যে ১৯৩০ সালের পর থেকে ডিজনে কার্টুন ছবির সুদূরপ্রসারী শিল্প-সম্ভাবনার কথা প্রকৃতভাবে উপলব্ধি ক'রে 'মাল্টি-প্লেন-ক্যামেরা' নামে এক ধরনের কৌশল উদ্ভাবন করে-ছিলেন যার সাহায্যে কার্টুন ছবিতে ক্যামেরার সচলতা স্বাভাবিক চলচ্চিত্রের মতো পরিচালকের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। ফলতঃ পরবর্তীকালের কার্টুন ছবিতে আমরা প্যান, টিল্ট্, লং, মিড, ক্লোজ-আপ্, জুম, যে কোনো ধরণের ট্রাকিং ইত্যাদি নানা যান্ত্রিক ব্যবহার লক্ষ্য করি।

ডিজনের পরবর্তীকালে এ্যানিমেশন চলচ্চিত্রে একটা পালাবদল লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার UPA গোষ্ঠীর চিত্রনির্মাতারা ডিজনে প্রবর্তিত স্টাইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে নোতুন ধরনের কার্টুন তৈরী করতে সচেষ্ট হন ১৯৫০ সালের পর থেকে। তাঁদের কাজের মাধ্যমে কার্টুন ছবি প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী হ'য়ে প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন এই গোষ্ঠীর দ্বারা একটা ছবি নির্মিত হয় শ্লেষাত্মক বিবাহিত জীবনের গল্পকে আশ্রয় করে। এ ছবিটি জেমস্ থার্বারের রচনা অবলম্বনে গড়ে ওঠে। ছবিটির নাম 'Unicorn in the Garden'। পোলাণ্ডের দুই বিখ্যাত এ্যানিমেশন শিল্পী ওয়ালেরিয়ান বরোজিক্ এবং জ্যান লেনিকা কার্টুন ছবিতে একটা ভিন্নতর মেজাজ এনে দিয়েছেন। লেনিকা তাঁর

ছবিতে অনেক ক্ষেত্রে কোলাজ প্রথায় কাজ করেন যেখানে তিনি নানাবস্তুর মূর্তি কেটে ঘন কালো রঙে তার চার দিকে ঘিরে নেন এবং খোদাই করা পটভূমিকার সামনে সেই সব মূর্তিগুলোকে রেখে তার ছবি তোলেন। লেনিকার 'রাইনোসেরাস' একটি বিখ্যাত এ্যামিমেটেড ফিল্ম। আয়োনেস্কোর বিখ্যাত নাটক অবলম্বনে লেনিকা এই ১১ মিনিটের ছবিটি নির্মাণ করেছেন। একালে বহু শিল্পী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অনেক গম্ভীর, তত্ত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত বিমূর্ত ভাবনামূলক বিষয়বস্তুকে এ্যানিমেশন ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করছেন। সাম্প্রতিককালে এ্যানিমেশন চলচ্চিত্র এক চূড়ান্ত শিল্পোন্নত স্তরে পৌঁছে গেছে। তাই এখন আর আমরা এ্যানিমেশন ছবি থেকে কেবল আমোদ ময় পক্ষান্তরে অনেক গভীরতর ব্যঞ্জনা আশা করতে পারি। ফ্রান্সে কাজ করার সময় ওয়ালেরিয়ান বরোজিক কয়েকটি আসাধারণ এ্যানিমেটড ছবি করেছিলেন। যেমন 'Dom'। এতে দেখা গেছে যে একটা কৃত্রিম মাথার চুল ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং টেবিলে রাখা যাবতীয় বস্তু গিলে ফেলতে থাকে। আপেল, এক বোতল দুধ এবং এমনকি সবশেষে কাচের বোতলটিও সে গিলে ফেলে। রেনেসাঁস ছবিতে বারোজিক অদ্ভুতভাবে 'রিভার্স মোশান' ব্যবহার করেছেন। দুটি ছবিই এ্যাভাণ্ট থীমের এবং চূড়ান্ত শিল্প সাফল্য লাভ করেছে। একালে যেখানে চলচ্চিত্র মাধ্যমে এক সেকেণ্ডে চব্বিশটি ফ্রেমের গতি প্রবাহিত হয়, সেখানে কার্টুন ছবিতে প্রতিটি ফ্রেমের এক একটি আলাদা আলাদা ছবি গৃহীত হয়। কতোবেশী সময়, সূক্ষ্মতা, ধৈর্য ও মননের মাধ্যমে এ্যানিমেশন চলচ্চিত্র তার নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছে সেটা একালের যে কোনো উন্নত কার্টুন ছবি দেখলেই বোঝা যায়। ডিজনের হাতে যে কার্টুন ছবির অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছিল আধুনিক চলচ্চিত্রকাররা ও কার্টুন শিল্পীরা তাকে এক মহান স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র নির্মিতিরূপে চরিত্র দান করেছেন।

চলচ্চিত্রের নাটকীয় উপাদান

চলচ্চিত্রের প্রধান প্রণালী প্রথমাবধি নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত। নাটকে যেমন, চলচ্চিত্রেও ঠিক তেমনি মানবিক জীবনের রূপকে তুলে ধরা হয়, যেগুলো বিশেষভাবে জীবন্ত, গভীর এবং প্রত্যক্ষ। নাটকের বিশিষ্ট কতকগুলো গুণ-ধর্মকে অবলম্বন করেই চলচ্চিত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু তবু উভয়ের মাধ্যমগত পার্থক্য আছে। একটির প্রধান মাধ্যম মঞ্চ। অপরটির প্রধান উপকরণ ক্যামেরা। নাটক যেমনই হোক মঞ্চ ছাড়া যেমন তার কোনো স্বরূপ ফুটে উঠবে না, তেমনি ঘটনাপ্রবাহ যেমনই হোক চলচ্চিত্রে তাকে ক্যামেরার মাধ্যমে ধরে রাখতে হবে। মঞ্চস্থ নাহলে নাটকের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। তেমনি ক্যামেরা ছাড়া চলচ্চিত্রের অস্তিত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন কোনো পরিচালক মানুষের ব্যক্তিত্বের কোনো স্বরূপকে ছবির পর্দায় তুলে ধরতে চান, সেই মানুষের প্রবণতা ও লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য ও ধারণাকে প্রতিফলিত করতে পরিচালক কতকগুলো নাটকীয় গঠনের সাহায্য নেন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যের রূপ দেন। এক্ষেত্রে নাটকের মতোই প্লট, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি চলচ্চিত্রের মধ্যে থেকেই যায়। এবং এক্ষেত্রে চিত্র পরিচালককে কিছু নির্দিষ্ট ভঙ্গির দৃশ্যকোণ নির্বাচন করতে হয় যাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় বলা হয় শট্। এরপর আছে সম্পাদনা যার মাধ্যমে তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে দৃশ্যগ্রাহ্য ক'রে তোলেন। অবশ্য যখন কোনো চলচ্চিত্র শিল্পের স্তরে বিচরণ করে তখন চলচ্চিত্রের আঙ্গিক ও অন্তর্দৃষ্টি পাল্টাতে পারে। এবং এই পরস্পর ক্রিয়াশীলতা মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনধারার স্তরকে অবলম্বন করেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক উপাদান হিসেবে চলচ্চিত্রে নাটকের প্রাথমিক উপকরণগুলো কাজ ক'রে যায়।

নাটকের ক্ষমতাশালী উপকরণগুলো অবলম্বন করেই শিল্পের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রবেশাধিকার ঘটেছে। তবু উভয়ের মধ্যে আঙ্গিকগত, প্রকরণগত এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্য মূলতঃ চলচ্চিত্রের নিজস্ব কতকগুলি গুণের জন্য, কতকগুলি অন্য মিশ্রিত উপাদানের জন্য সূচিত হয়েছে।

সমধর্ম কয়েকটি শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগাযোগ সম্পর্কে একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেই চলচ্চিত্র ও নাটকের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি করা যাবে। চলচ্চিত্রে দৃশ্যগ্রাহ্য চিত্রকল্পের যে প্রবণতা রয়েছে তা বিশেষভাবে তাকে চিত্রশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে তোলে। চলচ্চিত্র এবং চিত্রশিল্প উভয়েই প্রাথমিকভাবে একটা জীবনের প্রতিচ্ছবিকে একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে রূপদান করে। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে উভয় ফ্রেমবদ্ধ চিত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। চিত্রশিল্পে ব্যবহৃত ফ্রেম বিচ্ছিন্নভাবে এক নির্দিষ্ট রূপের পরিচয় দেয়। চলচ্চিত্রের ফ্রেমবদ্ধ চিত্রকল্প অনেকটা তাৎক্ষণিক পরিবেশের স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলে। চিত্রশিল্পের ফ্রেমের মধ্যে অনড় অটল ভাব। চলচ্চিত্রের ফ্রেমের বস্তুর মধ্যে সর্বদা একটা গতির আভাস আছে। যখন আমরা চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখি দরজা দেওয়া একটি ঘর, তখন স্বভাবতই আমরা সচেতন হয়ে যাই যে নিশ্চয়ই ঐ দরজার পারে ঘরের ভেতরে কিছু আছে। এই আকাঙ্ক্ষা এবং সচেতনতা বস্তুতঃ একমাত্র ক্যামেরার চলাফেরার জন্যই মনে হয়। অবশ্য চিত্রকল্পের নিজের স্বার্থেই তা চলচ্চিত্র এবং চিত্রশিল্পে উভয় মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় বস্তু। তবু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই দৃশ্যগ্রাহ্য প্রতিমূর্তি চরিত্র ও গল্পের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়।

চলচ্চিত্র ও সংগীতের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে একটা চলচ্চিত্রের বিভিন্ন চিত্রকল্পের গতি এবং সিকোয়েন্স সংগীতের সময়বদ্ধ স্বরলিপির বিন্যাসের অনুরূপ। উভয় শিল্পই ছন্দের সঙ্গে সংসৃষ্ট যা ভিন্নভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপি (Notes) এবং চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে দৃশ্য (Shots)। কিন্তু সবচেয়ে প্রভাবশালী বিষয়বস্তু হিসেবে চলচ্চিত্রেত্রের যে উপাদানটি সবচেয়ে মুখ্য এবং বৃহৎ তা হ'লো এর নাটকীয় উপাদান মূলতঃ যা এর প্রধান পার্থক্যরূপে সূচিত। উপস্থাপনা ব্যাপারটাই হ'ল নাট্যশিল্পের আসল উপকরণ এবং তা চলচ্চিত্রের প্রাথমিক সম্পর্ক, যা তাকে মঞ্চের নাটকের গুণধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

নাট্যধর্মী উপস্থাপনার দুটো পরস্পর ক্রিয়াশীল অংশ আছে। একটি হ'ল অভিনেতার শারীরিক উপস্থিতি, অপরটি হ'ল গতির বর্তমান কাল। নাটকের যা কিছু ঘটনাসংঘটন্ পাত্রপাত্রীদের দ্বারা গল্পের মাধ্যমে আমাদের চোখের সামনে ঘটে। তাই নাটক সব সময়ে বর্তমান কাল (Present Tense) হিসাবেই ধরা দেয়। মানে সবকিছুই এই মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে। যার জন্যে

সমালোচক বলেছেন 'A play is What takes place'.' একটা চূড়ান্ত উদাহরণ নেওয়া যাক পিরোন্দেল্লোর 'Six Characters in search of an Author'' (নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র) নামক নাটক থেকে। এখানে আমাদের সামনে একটা রঙ্গমঞ্চসুলভ পরিস্থিতি গড়ে ওঠে প্রথমেই, যখন দেখি প্রকৃত অভিনেতারাই বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করছে এবং যাঁরা মুখ্য নাটকের চরিত্র এবং সেইসঙ্গে আর একটা নাটকের মহলা দিচ্ছে। আর সব ব্যাপারটাই ঘটছে একই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের উপর আমাদের সামনে। উপরন্তু মুখ্য নাটকের অভিনেতারা অন্য আর একটি যে কাল্পনিক নাটকের রূপদান করছে, তার উদ্দেশ্য হ'ল তাদের এই ঘটনাসংঘটন যেন নাটকের আকারে আমাদের সামনে হাজির হয়। এইভাবে যখন মূল নাটকের সবশেষে ঐসব কাল্পনিক চরিত্র-গুলোর একজন ডুবে মারা যায়, অপর একজন নিজেকে গুলি করে, আত্মহত্যা করে তখন দর্শকরূপে আমাদের আবেগ আরো জটিল মিশ্রণে সমগ্র ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ঠিক এইভাবে গদারের ছবিতে নাটকের প্রত্যক্ষতা ও চরিত্রের প্রতি আমাদের সচেতনতা সম্পর্কে কতকগুলো চিত্তাকর্ষক কৌশল লক্ষ্য করা যায়। গদার প্রায়ই তাঁর ছবিকে কতকগুলো স্বতন্ত্র বৃত্তাংশে ভাগ করেন যাতে ক'রে কিছু সময়ের জন্য আমরা চরিত্রের অধ্যাস বা মায়ায় মগ্ন হয়ে পড়ি ; ঠিক তখনই গদার হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন, এবং একটা তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করেন, আর সেইসঙ্গে লিখিত খসড়া বা অন্যকোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু প্রদর্শনে চলে যান, কখনো আবার দার্শনিক মতের ধারাবিবরণী দিতে থাকেন বা ছবির পর্দায় সরাসরি চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এইভাবে ছবির চরিত্রের ব্যক্তিগত স্বাভাবিক সংশ্রব দর্শকদের সঙ্গে একধরনের যোগাযোগ গড়ে তোলে। যদিও আমরা চরিত্রগুলো থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি এবং অভিনেতাদের অভিনেতাই ভাবছি, তবু আমাদের মধ্যে এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে অভিনেতারা ব্যক্তিগতভাবে ছবির সমগ্র ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত যা তাঁরা তাঁদের অভিনয়ের মাধ্যমে আপেক্ষিকভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। গদারের এই জাতীয় সাক্ষাৎকার আর কিছুই নয় একটা খেলনার বস্তুর মতো যা নাটকের 'বর্তমান কাল' সম্বন্ধে সচেতন করে। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে পুরোনো আমলের নাটকে বিগতকালের কোনো ঘটনাকে নাটকের চরিত্ররা মঞ্চের ওপর দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করতো। কিন্তু আধুনিক-

কালের নাটকের উন্নতির ফলে সর্বকালের ঘটনাকেই নাটকের একই বিবর্তন সময়ে আরো প্রত্যক্ষ ভাবে দেখানো হয়। চলচ্চিত্রে সময়ের এবং স্থানের আরো শিষ্ট ব্যবহারের ফলে এই ব্যাপারটা ফ্ল্যাশব্যাক-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের স্থায়িত্ব ও আকারকে ধরে রাখতে পারে। এমনকি আজকাল চলচ্চিত্রের এই ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি নাটকের ক্ষেত্রেও অনেক প্রভাব বিস্তার করেছে।

চলচ্চিত্রের গতানুগতিক ধারায় ফ্লাশব্যাক প্রথায় প্রথমে বর্তমান ঘটনা ও পাত্রপাত্রীকে দেখিয়ে তারপর আগেকার ঘটনা উপস্থাপনা হ'ত এবং সেটা শেষ হ'লে আবার প্রথম ঘটনাসংস্থানে ফিরে আসা, এই ছিল রীতি। আজকাল সিনেমার আধুনিকীকরণের ফলে অনেক সময় প্রথমেই বিগত ঘটনা ও সময়ের কিছু স্মৃতিকে প্রথমে দেখিয়ে তারপর বর্তমান কালের কার্যকারণের ব্যাপার দেখানো হচ্ছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ সিডনী লুমেটের 'পনব্রোকার' ছবিতে প্রথমেই নায়কের নাৎসী কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পের তিক্ত নিপীড়নের স্মৃতি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, কিন্তু তারপরে যতই বর্তমানকালের নানা কার্যকারণ গতি লাভ করতে থাকে ততই তাকে বিগতকালের স্মৃতি দহন করে। আবার আধুনিক কোনো কেনো ছবিতে বর্তমানকালের ঘটনার সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঘটনাকেও চিত্রায়িত করা হচ্ছে। এই নোতুন রীতিটা সার্থকভাবে দেখা গেছে আলা রেণের 'দি ওয়ার ইজ্ ওভার' ছবিতে, যেখানে একজন ক্লান্ত পেশাদারী বিপ্লবী ভবিষ্যতে কী ঘটবে তার অনুমান করছেন এবং তাঁর অনুমানকে বর্তমান কালের গল্পের অংশ হিসেবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে এই নোতুন কৌশল চরিত্রের বর্তমান মানসিক অবস্থা, তাঁর উদ্বেগ, সংশয় ও অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটিকে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে ভীষণ সাহায্য করেছে।

পরিশেষে বলা যায় চলচ্চিন্তা হ'ল প্রত্যক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ। সেইসঙ্গে সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতার ব্যাপার। অন্য দিকে নাটক হ'ল বহুর মিলিত প্রচেষ্টা। নাটক লেখেন একজন বা একাধিক মানুষের দ্বারা রচিত হতে পারে, তার বাস্তব রূপ দেন অন্যরা এবং নাটকটাকে নিয়ে প্রযোজনা করেন আর একজন এবং শেষে অভিনীত হয় আর একদল কর্তৃক। অন্যদিকে আবার নাটক মাত্রই একটি বিশিষ্ট জনসমষ্টির সামনে এক বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে সেটি প্রযোজিত হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র একই সঙ্গে নানাস্থানে একই বস্তু অসংখ্য মানুষের সামনে প্রদর্শিত হতে পারে। মূলতঃ নাটকীয়

সব উপাদানের সূত্র ধরে আবির্ভূত হলেও চলচ্চিত্র আর নাটক বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই একে অপরের থেকে ভীষণভাবে পৃথক হয়ে পড়েছে। চলচ্চিত্রের কোনো কাল নেই। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্রে এ সবই এক বিশেষ প্রবাহিত-বর্তমান কালের মধ্যে যুক্ত হয়ে পড়েছে। নাটক অন্য অর্থে দর্শক সাধারণের সামনে চরিত্রের শরীরী উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। চলচ্চিত্রের পাত্রপাত্রীরা দর্শকদের ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে। কিন্তু নাটকের চরিত্ররা সব সময়ে দর্শকদের সামনে শরীরী উপস্থিতিতে বিচরণ করেন।

চলচ্চিত্র : শ্রুতি ও ধ্বনিকল্প

বিস্তীর্ণ আখের খেতে ওরা দুজন দাঁড়িয়েছিল কৌণিকভাবে। মেয়েটির হাতে একটা আখের ছোট অংশ, ছেলেটি একটা আখ গাছের ধারে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি প্রশ্ন করে "এই আখ খাবি ?" হঠাৎ দূরে কিসের শব্দ হয়, ছেলেটি পাশে সরে গিয়ে টেলিগ্রাফের পোষ্টে কান পাতে, মেয়েটি কাছে সরে আসে। তারপরের দৃশ্যে সমগ্র পর্দা জুড়ে খোলা আকাশ দেখা যায়। তীব্র বাঁশীর শব্দ ক'রে ট্রেনটা মাঠের দূরবর্তী অংশ দিয়ে চলে যায়। দুজনে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে দূরে মিলিয়ে যাওয়া ট্রেনটার দিকে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠে আখের খেতের আলো-ছায়ায় ওরা দুজন প্রথম ট্রেনের শব্দ শোনে।

বাস্তবিকপক্ষে, 'পথের পাঁচালী'র উপরোক্ত দৃশ্যাংশটি ছাড়াও, সমগ্র 'অপু-ত্রয়ী'তেই শব্দ ব্যবহারের অভিনবত্ব চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠায় উপনীত হয়েছে। 'অপু-ত্রয়ী'র বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে (Sequence) ট্রেনের দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শব্দগত ইমেজ (Audic-visual-montage) বহুভাবে ছবির মূল সুরকে মহিমান্বিত করেছে। 'অপুর সংসারে' জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ অপু ট্রেনের চাকার তলায় যখন আত্মহননে উদ্যত তখন আমরা, দর্শকবৃন্দ, প্রথমে ট্রেনের হৃদয়বিদারী শব্দ শুনি, ট্রেন ক্রমে নিকটতর হয়—কিন্তু ট্রেনকে ফ্রেমের মধ্যে না এনে হতাশায় অপুর মুখাবয়বকে পরিচালক সমগ্র Screen জুড়ে প্রতিভাসিত করেন। হঠাৎ একটি শূয়োরের তীব্র আর্তনাদ শোনা যায়, ফ্রেমের একপাশে দণ্ডায়মান অপুর মুখমণ্ডলে আলো-ছায়ার দীপ্তি ছড়িয়ে দ্রুতবেগে একটি ট্রেন চলে যায়। স্থানীয় লোকেরা ট্রেনের চাকায় মৃত শূয়োরটিকে ধরাধরি ক'রে সরিয়ে নিয়ে যায়।

চলচ্চিত্রে শব্দের এই ধরনের ব্যবহার বিশেষভাবেই ছবির অন্তর্নিহিত ছন্দকে বুঝতে সাহায্য করে। তাই চলচ্চিত্রে শব্দের প্রয়োগ, পুনর্যোজনা ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিচালককে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়। প্রাক্-তিরিশের নির্বাক ছবির পর্বে দৃশ্যের নিহিত গতি ও ভাব অনুধাবনে শব্দ সংযোজনার যে অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, তিরিশোত্তর সবাক ছবিতে নানাভাবে শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত প্রয়োজনের সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

আমাদের বাস্তবজগতের গভীর দৃষ্টিশক্তির মতই আমাদের শ্রুতিও নির্বাচিত ক্ষেত্রের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। আমরা যদি একই সঙ্গে সব কিছুকে দেখতে ও শুনতে চাই তাহলে কোনোকিছুই সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না—না রূপকল্পনার আস্বাদন, না শ্রুতির মাধুর্য। চলচ্চিত্রে শব্দের গ্রহণ ও প্রতিযোজনায় সব সময় স্রষ্টাকে এই বিষয়টির উপর নজর রাখতে হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অন্যতম একটি; শ্রুতির গ্রহণ ক্ষমতার ওপর তাই একটি ছবির গুণাগুণ বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। অনেক সময় দেখা গেছে যে, একটি ছবি অত্যন্ত অভিজাত শিল্পোকুলোদ্ভূত হয়েও শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে কুলভ্রষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অরূপ গুহঠাকুরতার 'বেনারসী' ছবির নাম করা যায়। শব্দ ব্যবহারের অসাবধানতায় ছবিটির শিল্পত্বের হানি ঘটেছে অনেক পরিমাণে।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক সিগফ্রেড ক্রসার তাঁর "The Nature of Film" গ্রন্থে চলচ্চিত্রে শব্দ ব্যবহারের ত্রিবিধ দীর্ঘ ও জটিল বর্ণনায় বলেছেন যে সাধারণতঃ (ক) সমকালীনত্ব ও অসমকালীনত্ব (Synchronism and asynchronism) (খ) সমান্তরতা—প্রতিবিন্দু (Parallelism and Counterpoint) এবং (গ) অবিকল ও ভাষ্যসম্বলিত শব্দ যোজনার (actual and commentative sound) মাধ্যমে সবাক চলচ্চিত্রের মাধুর্য বিকশিত হয়।

একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, চলচ্চিত্র পরিচালক শব্দের কৃত্রিম নিবন্ধনে সক্ষম, এই সামর্থ্য শুধুমাত্র তাঁর স্বকীয় প্রয়োজনের জন্যেই কেবলমাত্র সংঘটিত হয় না, পরন্তু ছবির অন্তর্গূঢ় বিষয়বস্তু অনুসারে শব্দের ঘনত্ব, বহুত্ব, ঐকতানের পরিবর্তনে অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জনেও সহায়তা করে।

ছবিতে যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পনার সাহায্যে অনেক অভিনব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়, তেমনি ছবির পাত্রপাত্রীর সংঘটিত ক্রিয়াক্রমের সঙ্গে অন্বিত সুষ্ঠু শব্দ প্রয়োগও সময় শিল্পোন্ন প্রতীক সৃষ্টিতে সক্ষম। পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত 'সুভা ও দেবতার গ্রাস' ছবির 'সুভা'র অংশে সুভার মূক মনোবেদনা ও আত্মযন্ত্রণা, প্রিয় বিড়ালের মৃত্যুতে তার মর্মপীড়ন ইত্যাদির প্রকাশে পরিচালক সুভার বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির (Expression) সঙ্গে নেপথ্যে ক্রমান্বয়ে বেত্রাঘাতের শব্দ প্রয়োগে উক্ত ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অনুরূপভাবেই ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে নীতা যখন তার প্রেমাস্পদের বাড়ীতে আর্থিক সাহায্যের আশায় গিয়ে তার প্রতি প্রেমাস্পদের অবিশ্বাস ও প্রবঞ্চনা লক্ষ্য ক'রে দুঃখের অর্ঘ বুকে নিয়ে বাড়ীর পথে ফেরে—

তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময়ে নেপথ্যে পূর্বকথিত বেত্রাঘাতের শব্দ শোনা যায়। এখানে যে Audic-visual-montage-এর ব্যবহার তা ছবির চরিত্রের কার্যকারণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িয়ে গেছে।

শ্রুতিকেন্দ্রিক এই যে ধ্বনিকল্পের সৃষ্টি, এতে একটি ছবির শিল্পগত ফলশ্রুতি নির্ভরশীল। আমাদের বোধের স্বাধিকারে শ্রুতি যে পরিমাণ বিদ্যমান বা যে পরিমাণে তা আমাদের কাছে গ্রহণ সীমায় রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা করেই ছবিতে শব্দের প্রয়োগ, বর্জন, হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো বা প্রতিযোজনা করার মধ্যেই পরিচালকের শিল্পগত উৎকর্ষতা নিহিত রয়েছে। কিন্তু আমরা সবাক চলচ্চিত্রের এত বিপুল উৎকর্ষতার যুগসীমায় উপনীত হয়েও ছবিতে সংযোজিত শ্রুতি ও তার ধ্বনিকল্পের আস্বাদনে খুব বেশীদূর এগোতে পারি নি। তাই বিশ্ব-বিশ্রুত চলচ্চিত্রবিদ্ বেলা বালাজ দুঃখ ক'রে বলেছেন :"The sound film has educated our ear—or might and should have educated it—to recognize the timbre of sound. But we have less progress in our visual education." (Bela Balazs : film An Anthology/Edited by/Daniel Talbot-page—211) আর এই কারণেই অনেক সময় আমরা ছবিতে প্রযুক্ত শব্দের পরীক্ষামূলক ব্যবহারকে ভাল মনে গ্রহণ করতে পারি না) আর আমাদের এই অক্ষমতার আলস্যকে পরিচালকের নির্বুদ্ধিতায় সংক্রামিত করি। আসলে চলচ্চিত্র যে মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় দুটি ইন্দ্রিয় আস্বাদনের পরিণাম : দৃষ্টি ও ধ্বনিকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত এক শিল্প-মাধ্যম, একথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। ব্যবহারিক জগতের যে দৃশ্য-ক্রম ও যে শব্দক্রমের উপলব্ধিতে আমরা অভ্যস্ত—তাকেই পরিচালক ছবিতে দৃষ্টিগ্রাহ্য ইমেজ ও শ্রুতিবাহিত ধ্বনিকল্পে পরিণত করেন। এরজন্য তিনি বহু-ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ ও সময়বিশেষে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটান। অতিরিক্ত শব্দের প্রযুক্তীকরণ যে ছবিতে অনেক সময় ফলপ্রদ হয় তার বহু নিদর্শন আছে। উদাহরণস্বরূপ স্ট্যানলি ক্র্যামার পরিচালিত "Judgement at Nuremberg" ছবির একটি অংশ উল্লেখ্য। অভিনেতা স্পেন্সার ট্রাসি একাকী শূন্য ময়দানে ভ্রাম্যমান, একদা যেখানে বিপুল সমাবেশ সংঘটিত হয়েছিল। শব্দানুসরণে (Sound track) আমরা নাৎসী সংগীত ও প্রগল্ভ বক্তৃতা শুনি যা সমগ্র নির্জন ঐ রঙ্গভূমিতে অনুরণিত হয়। এখানে এই অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ এই বিশেষ Sequence-এ ছবির অন্তর্নিহিত

ভাবগম্ভীরতাকে বাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত শব্দ প্রয়োগে অভিনবত্ব দান করেছে। হিচককের "Strangers on a Train" ছবির একটি অংশে মেলার প্রাঙ্গণে একটি মেয়ে নিহত হয়। তখন নেপথ্যে Sound track-এ এক বিশেষ একঘেয়ে সুর ধ্বনিত হয়। ছবির শেষে হিচকক উক্ত হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিকে মনে পড়িয়ে দেবার জন্য এই ধ্বনিকল্পকে প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। অতি সামান্য শব্দ প্রয়োগের দ্বারাও যে অনেক সময় ছবির চরিত্রের বিশিষ্টতা ধরা পড়ে তার চমৎকার নিদর্শন আছে ওরসন ওয়েলসের "Citizen Kane" ছবির একটি অংশে: কেণের দ্বিতীয় পক্ষের অসার মস্তিষ্কসম্পন্ন স্ত্রী ম্যারী আলেকজান্দার যখন কেণের সঙ্গে নির্বোধ বিবাদ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন একটি তোতাপাখীর কর্কশ চিৎকার শোনা যায়, যা বিশেষ ভাবেই ম্যারীর চরিত্রের এক তীক্ষ্ণ ব্যাখ্যার রূপ রেখে যায়। দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতীকের মতোই একটি চরিত্রের মানসিক অবস্থা, কার্যকারণঅন্বিত তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনে দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতীকের মতোই মন্ময়গতভাবে (Subjectively) চলচ্চিত্রে শব্দের ব্যবহার ঘটতে পারে।

চলচ্চিত্র শব্দের প্রয়োগে ধ্বনিকল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে সর্বদা চরিত্র ও ঘটনা সংস্থানের দূরত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়। অর্থাৎ কোন ঘটনা সংঘটিত হবার প্রাক্কালে চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক বস্তুসংস্থান কিভাবে, কি অবস্থায় রয়েছে -তার পরিপ্রেক্ষিতেই পরিচালককে তথাকার Local Sound, এবং তাঁর স্বকপোলকল্পিত শব্দ প্রয়োগে দর্শকের শ্রুতিতে সব মিলিয়ে অভিনব ধ্বনিকল্প গ'ড়ে তুলতে হয়।

সবাক চলচ্চিত্রের জন্মলগ্নের পর থেকেই একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নির্বাক যুগপর্বের অনেক ছায়াছবির নেপথ্যে শব্দ যোজনায় যে চারুত্ব লক্ষিত হ'ত, আধুনিক যুগপর্বের বাকসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রে সেই শব্দ যোজনা আশাতীত সাফল্য-শিখরে উপনীত হয়েছে। ঋত্বিকঘটকের কথায়: "মূক চলচ্চিত্র প্রগলভ হ'তে চেয়েছে—সশব্দচিত্র সে আয়তন বাড়িয়ে দিয়েছে, মন্ময় হয়ে গেছে, অন্য একটা কিছু খোঁজার মধ্যে।"

অর্থাৎ বর্তমানে চলচ্চিত্র যে শিল্প দ্যোতনার সীমায় পৌঁছেছে সেখানে শব্দ দৃষ্টির একত্র মিলন অবশ্যম্ভাবী। এবং তাদের পারস্পরিক মেলবন্ধনের

আত্যন্তিকতাও চরম। কেননা তারা একে অপরের পরিপূরক। কবি যেমন উচ্চারণ করেছেন :

"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
গন্ধ সে চাহে ধূপের রহিতে জুড়ে
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।"

তেমনি চলচ্চিত্রের দৃষ্টি ও শ্রুতি ক্রমান্বয়ে একই বৃত্তপথে পরিক্রমা করছে, সেখানে তাদের নিপুণ সহ-অবস্থান ঘটছে—জন্ম নিচ্ছে নতুন সৃষ্টিধর্মী শিল্পোন্নত ছবি। তাই এখন শুধু দৃষ্টিই নয় ধ্বনির দ্যোতনার স্বাদ গ্রহণে আমাদের শ্রুতির সাধনায় সচেষ্ট হ'তে হবে।

"এপারের করতালি ওপারের মাঠের ভিতর,
অজান্তে রেখে যায়, ছায়াদীর্ঘ হ'লে।
বৃক্ষ-সীমানা ছুঁয়ে, প্রসারিত ধ্বনির বিবর,
শব্দ প্রতীক হয়, শ্রুতি ফিরে গেলে।।

চলচ্চিত্র ঃ সম্পাদনা

সিনেমার মূল কথা হ'ল সম্পাদনা। প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক একবার বলেছিলেন যে "সিনেমা বিভিন্ন শিল্পকে ধার ক'রে তাদের একত্রিত ক'রে। স্বতন্ত্র রূপ দেয় সম্পাদনা।" অর্থাৎ পরিচালক তাঁর ক্যামেরার মাধ্যমে যা কিছু বাহ্য দৃশ্য বস্তুকে গ্রহণ করেন, সম্পাদক তাকেই প্রসঙ্গানুক্রমে সাজিয়ে একটা সুগ্রথিত রূপ দান করেন, তখনই গড়ে ওঠে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পরূপ। এদিক থেকে এই সম্পাদনা ব্যাপারটার ওপর একটা ছবির শিল্পগুণ ভীষণভাবে নির্ভর করে। পরিচালককে তাই চলচ্চিত্রের সম্পাদনা ব্যাপারটাও ভালোভাবে জানতে হয়। সম্পাদনা হ'ল সেই প্রক্রিয়া যা সিনেমার Time ও Space কে নিয়ন্ত্রিত করে। চলচ্চিত্রের নিজস্ব একটা সময় ও কাল আছে যা বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংস্থানকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে। সম্পাদনার মাধ্যমে এই সময় ও স্থানকাল একটা সুবিহিত চেহারা পায়। পরিচালকের স্বকীয় চিত্রনাট্যের মধ্যে সম্পাদনা ব্যাপারটা নিহিত থাকে। পরিচালক তাঁর ভাবনা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ক্যামেরার কোন্ (angle) নির্বাচন করেন, যেখানে তাঁর ইচ্ছার গ্রহণ ও বর্জনে অনেক কিছু বস্তু বাদ পড়ে আবার অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু সংযোজিত হয়। সম্পাদক পরিচালকের নির্ধারিত চিত্রনাট্যের নির্বাচন পদ্ধতির ক্রমকে অনুসরণ করে সমগ্র ছবিটাকে সাজিয়ে তোলেন। সাধারণ কথায় বস্তুজগতের ঘটমান ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রিত করার নামই সম্পাদনা। এই নিয়ন্ত্রণ শব্দ, শ্রুতিকল্প, সংলাপ, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে উঠতে পারে। বিখ্যাত রুশ পরিচালক পুদভকিন্ এই বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের যে "The film is not shot, but built." এই কথাটির মধ্যেই সম্পাদনা ব্যাপারটির ইংগিত আছে। আসলে চলচ্চিত্র কেবল দৃশ্যের সমবায়ই নয়, পরন্তু সুগ্রথিত, সুসংহত একটা সমগ্র দৃশ্যরূপ। সম্পাদক চলচ্চিত্রের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের এই সমগ্রতা দান করেন। তাই একটা ছবির শিল্পকৃতিত্বে তাঁরও অবদান কম নয়। পরিচালক কাহিনী অনুযায়ী, বক্তব্য অনুযায়ী যে অসংখ্য দৃশ্যকে ক্যামেরার মাধ্যমে গ্রহণ করেন তাঁর প্রত্যেকটি দৃশ্যের এক একটা

নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে। সম্পাদক পুরো ছবির স্যুটিং শেষ হ'লে বিভিন্ন দৃশ্যের সংখ্যা মিলিয়ে পুরো ছবির কাহিনী বা বক্তব্যটিকে একটি অর্থপূর্ণ শরীর দান করেন। চলচ্চিত্রে সম্পাদনা তাই একটি বিশেষ ছন্দ এনে দেয়। কোনো কোনো চলচ্চিত্রবিদ বলেছেন "Editing is nothing, but rearrangement of shots. It not only reproduces; it reconstitutes and re-creates." অর্থাৎ সম্পাদনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অতিরিক্ত মাত্রা সংযুক্ত হয়। একটি ছবির দৃশ্য গ্রহণকালে সর্বদা ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় না। আগের ঘটনার সঙ্গে পরের ঘটনার অনেক দৃশ্যও অনেক সময় একসঙ্গে ক্যামেরায় গৃহীত হয়। সম্পাদককে মূলতঃ প্রতিটি দৃশ্যের পূর্বে গৃহীত ক্রমিক সংখ্যাগুলিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। ধরা যাক একটি লোক একটি বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠছে। এমন কোনো বিধান নেই যে পর্দায় ঐ লোকটির দোতলায় আরোহন পর্যন্ত সমস্ত কার্যকলাপটিকে দেখাতে হবে। হয়তো প্রয়োজনবোধে লোকটির সিঁড়িতে ওঠার পরের দৃশ্যেই আচমকা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃশ্য ক্রমে চলে গিয়ে পুনরায় ঐ আগের দৃশ্য সংস্থানে ফেরা যাচ্ছে যেখানে হয়তো দেখা যাবে যে লোকটি সিঁড়ি থেকে উঠে এসে একটি দরজায় করাঘাত করছে। অর্থাৎ লোকটির বাড়ীর দ্বিতলে আরোহন পর্বটি এইভাবে ভেঙে দেখানো যায়। চলচ্চিত্রের এই সময়ের ব্যবহারটা নির্ভর ক'রে সম্পাদকের কাঁচির ওপর। চিত্রনাট্যের কাট্, জাম্পকাট্ Mix ইত্যাদি ব্যাপারগুলোও সম্পাদনার মাধ্যমে ঘটে। অর্থাৎ ফিল্মের দৈর্ঘ্যকে কেন্দ্র করেই এই জাম্পকাট, কাট ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ছবির পর্দায় প্রতিফলিত হয়। মিক্স ব্যাপারটি যদিও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় তবু সম্পাদককে Mix-এর অনুপাতে ফিল্মের দৈর্ঘকে সংরক্ষিত রাখতে হয়। এদিক থেকে চলচ্চিত্রে যে Manipulation of time and space সংক্রান্ত ব্যাপার আছে, সম্পাদককে সে সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

চলচ্চিত্রের সম্পাদককে সংগীতের ছন্দ সম্পর্কে অবহিত হ'তে হয়। ছন্দ অর্থাৎ Rythm সম্পর্কে জ্ঞান সম্পাদকের অপরিহার্য বস্তু। অনেক ছবিতে দেখা যায় যে কোনো বিশেষ গান বা তালের ছন্দ অনুযায়ী দৃশ্য গঠন করা হয়েছে। অর্থাৎ গানের তালে তালে বিভিন্ন দৃশ্য গঠিত হয়েছে। এ কাজটি সম্পাদককেই করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'West side story', 'Hallo Dolly' উদয়শংকরের 'কল্পনা' ইত্যাদি ছবির নাম করা যায়।

এ সব ছবিতেই তালের মাত্রা (Beat) অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড দৃশ্য গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সম্পাদনার সময় সম্পাদককে ছন্দের ঝোঁকটিকে লক্ষ্য রেখে সেই অনুপাতে মেপে মেপে ফিল্ম কাটতে হয়েছে। যদিও সম্পাদনা মূলতঃ ক্যামেরার কাটিং-এর ওপরই নির্ভর-শীল। প্রত্যেকটি খণ্ড মুহূর্ত, বিশেষ বিশেষ সিকোয়েন্সের শেষে, একটি প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাবার মাধ্যবর্তী মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রে 'কাট' পদ্ধতিটি পরিচালকের অন্যতম সম্পদ। সিনেমার সম্পাদক একটি ছবির সামগ্রিক সম্পাদনা করার কালে পরিচালকের এই দৃশ্যগত অজস্র কাটিংকে আদ্যন্ত অনুসরণ ক'রে একটা কাহিনীসূত্র বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন—যার থেকে গড়ে ওঠে এক অখণ্ড শিল্পরূপ।

রুশ-পরিচালক শিল্পাচার্য আইজেনস্টাইন ছবির সম্পাদনায় একটি বিশিষ্ট রীতি প্রবর্তন করেছিলেন যেটি চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'মন্তাজ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই 'মন্তাজ' সম্পাদনারই একটি বিশেষ রীতি যা পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে আইজেনস্টাইনেব মন্তাজ এবং পুদভ্‌কিন্‌ কথিত চলচ্চিত্র সম্পাদনারীতি এক নয়। চলচ্চিত্রের প্রথম দিকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার জন্য পরিচালকরা Mix বা Dissolve এবং একটি দৃশ্য শেষ হয়ে আর একটি দৃশ্যের সূচনার জন্য Fade out এবং Fade in ব্যবহার করতেন। সেই সময় সিনেমায় আরো কতকগুলো টেক্‌নিক ব্যবহার করা হ'ত যেমন Wipe ও iris-in। আধুনিক-কালে এগুলির ব্যবহার খুব কমে এসেছে। যদিও অত্যন্ত প্রয়োজনে এগুলিকে কেউ কেউ একালেও কাজে লাগান। সেটা নির্ভর করে ছবির গতি ও ঘটনার তাৎপর্য অনুযায়ী। এই সবকটি টেক্‌নিকই সম্পাদনার মাধ্যমে নির্দ্ধারিত হয়। Fade out, Fade in, Mix, iris-in, ইত্যাদি সবই ফিল্মের দৈর্ঘকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, যেটি নিয়ন্ত্রণ করেন স্বয়ং সম্পাদক। বিশ্ববিশ্রুত চিত্রপরিচালক গ্রিফিথ এবং আইজেনস্টাইনের সবকটি ছবিই সম্পাদনার নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ-যোগ্য। গ্রিফিথের 'ইন্‌টলারেন্স' ছবির একটি দৃশ্য পর্যায় আছে যেখানে দেখা যায় যে ব্যাবিলন আক্রান্ত হলে অনেক উঁচু পাঁচিল (প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মত দৈর্ঘ্য) থেকে মানুষেরা নীচের মাটিতে পড়ছে। এটি, দুটি দৃশ্য পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যটি খুব দূরের থেকে নেওয়া যেখানে দেখা যায় যে একটি মানুষ খুব উঁচু স্থান থেকে সজোরে নীচের ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হ'ল। এইখানে সাধারণতঃ 'ডামি' ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় দৃশ্যটি খুব কাছ থেকে নেওয়া যেখানে

দেখা যায় যে পাঁচিলের নীচে একটি মানুষ ওপর থেকে পড়ল এমনভাবে যে দেখে মনে হ'ল যেন অত্যন্ত উঁচু স্থান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে মারা গেল। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খুব কম উঁচু স্থান থেকে আসল মানুষটি নীচের দিকে লাফিয়ে পড়ে। দৃশ্যে কেবল তার লাফানোর ব্যাপারটি গৃহীত হয়, যেখানে মানুষটির পড়াটাকেই রাখা হয়। এখন এই দুটি দৃশ্যকে এমনভাবে সম্পাদক জোড়া লাগান যে দর্শকদের মনে হয় যেন ঐ অতি উঁচু পাঁচিলের শীর্ষদেশ থেকে একটি মানুষ নীচের মাটিতে পড়ে গেল। এই দৃশ্য-কৌশলটিকে সিনেমার ভাষায় বলা হয় 'Cheat shot'. একালের চলচ্চিত্রে slow motion, Freeze, Accelerated motion ইত্যাদি সব বিষয়গুলিই সম্পাদনার সুষ্ঠু কৌশলে নির্ণীত হয়। সবাকছবির জন্মের পর থেকে চলচ্চিত্রে সম্পাদকের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। সেখানে ছবির শব্দের সঙ্গে, সংলাপের সঙ্গে ও সাংগীতিক ছন্দের সঙ্গে Visualকে ঠিকমতো একত্রিত করায় তাঁর দায়িত্ব থাকে। শব্দের সঙ্গে দৃশ্যপ্রতিমার এই সমাপতন প্রাথমিকভাবে সম্পাদক তাঁর 'মুভিওয়ালা' মেশিনেই সম্পন্ন করেন তারপর রেকর্ডিং ষ্টুডিওতে একাধিক চ্যানেলে গোটা ছবির সাউণ্ড ও shot কে প্রয়োজন মতো মেলানো হয়।

এককথায় চলচ্চিত্র সম্পাদনা হ'ল সেই রীতি, যা চলচ্চিত্র পরিচালকের নির্বাচন, গ্রহণ-বর্জনের একমাত্র মাধ্যম। পরিচালকের স্বাধীন ইচ্ছে অনুযায়ী কোনো দৃশ্য বা দৃশ্যক্রমের গুরুত্ব ও পরিবর্জন সম্ভব হয় এই সম্পাদনার মাধ্যমে। প্রয়োজনে নোতুন কোনো বাড়তি দৃশ্যও অনেক সময় পরিচালক মূল ছবির সঙ্গে জায়গা মতো জুড়ে দিতে পারেন এবং মূল ছবির কোনো দৃশ্যকে একেবারে পরিত্যাগও করেন। এ সবই সম্ভব সম্পাদনা কৌশলের দৌলতে, উপরন্তু সম্পাদনার মাধ্যমে গোটা ছবিতে একটা বাঞ্ছিত গতি এসে পড়ে। শিথিল সম্পাদনার দরুণ অনেক ক্ষেত্রে ছবিতে গতির অকারণ মন্থরতা ছবির শিল্পসৌন্দর্য নষ্ট করে। তাই সম্পাদককে আদ্যন্ত ছবির পরিণতি ও অভিব্যক্তিটিকে খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হয়। spatial, temporal, logical, intellectual, emotional—এই সবরকমের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সম্পাদনা ব্যাপারটা অপরিহার্য। তাছাড়া একটি দৃশ্যের মধ্যে ও একাধিক দৃশ্যের অন্তর্বর্তী নাটকীয় ক্রমপরিণতি বোঝা যায় সম্পাদনার মধ্য দিয়ে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ডকুমেন্টারী চিত্রনির্মাতা গ্রিয়ারসন একবার চমৎকার একটি কথা

বলেছিলেন : "You photograph the natural life, but you also, by your juxtaposition of detail, create an interpretation of it." আসলে সম্পাদনা হ'ল তাই যা দৃশ্যের সূক্ষ্ম উপাদানগুলোকে যথাযথস্থানে প্রার্থিত সান্নিধ্যে উপস্থাপন ক'রে এক সামগ্রিক রূপ দান করে।

চলচ্চিত্রে প্রতীক

যেমন সাহিত্যে, চিত্রকলায় বা অন্যান্য সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতীক প্রয়োগের সার্থকতা, তেমনি চলচ্চিত্রেও প্রতীকের একটা মর্যাদা আছে। যদিও চলচ্চিত্র অন্যান্য যেকোনো শিল্প-আঙ্গিক অপেক্ষা মানব মনে দ্রুত আবেদন জাগাতে সক্ষম। একটা কবিতা বা গল্পের মধ্যে সন্নিবেশিত বিভিন্ন প্রতীকের অর্থে পৌঁছতে যেমন পাঠকদের একাগ্রীকরণ প্রয়োজন, চলচ্চিত্রের প্রতীক অনুধাবনে তা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় চিত্রকল্প বা প্রতীক গঠিত হয় ভাষার কাঠামোর ওপর আর চলচ্চিত্রে সেই প্রতীক দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ লাভ করে। আসলে সিনেমায় প্রতীক ব্যঞ্জনার কাজটুকু সম্পন্ন করে। প্রতীকের নিজস্ব পরিধি সীমিত, কিন্তু তারমধ্যে দিয়েই একটা গভীর অর্থের আভাস পাওয়া যায়। শিল্প মাত্রই তার মধ্যে কিছুটা Abstraction থাকে, কেননা শিল্পের সব শাখার সৃষ্টির মধ্যেই শিল্পীর স্বকীয় মননের প্রতিফলন ঘটে। সেইজন্যে শিল্পীর অভিব্যক্তিতে সবটুকু কথিত হয় না, অতিরিক্ত ইঙ্গিতের ওপরই তা নির্ভর করে। প্রতীক সিনেমায় সেই ইঙ্গিতের কাজ করে। কিন্তু সিনেমা এমনই একটা শিল্পমাধ্যম যে পরিচালক যখন দর্শকদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে প্রতীক প্রয়োগে কোনো সূক্ষ্ম ছবি ফুটিয়ে তুলতে চান, তখন তাঁকে উক্ত প্রতীকপ্রয়োগের আপাত পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁকে Creation অপেক্ষা Result-এর ওপরই লক্ষ্য রাখতে হয়। কেননা, অস্পষ্ট দুর্বল অথবা অসংলগ্ন প্রতীক প্রয়োগ ছবির মূল সৌন্দর্য উপলব্ধির পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়ায়। বিদেশী কবি ইয়েটস্ বলেছিলেন: "A symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame."

মারাত্মক কথা। আসলে প্রতীক ব্যাপারটাই হ'ল এইরকম। তাই একটা ছবির অকথিত মর্মবস্তুর স্বরূপ ব্যাখায় বিশেষ বিশেষ প্রতীকের প্রয়োজন হয়।

প্রতীক সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল যে প্রতীক আমাদের অনুভবের মধ্যে যে ধারণার সৃষ্টি করে সেটার সংখ্যা এক নয়, প্রতীক অসংখ্য প্রতিধ্বনির জন্ম

দেয়। যার ফলে আমাদের ভাবনার মধ্যে একই সঙ্গে অসংখ্য ভাবনা, অনেক ধারণার সৃষ্টি হয়। প্রতীকের মধ্যে অনেক অপ্রকাশিত অর্থ একসঙ্গে কাজ করে। প্রতীকের সঙ্গে আর একটা ব্যাপার জড়িয়ে থাকে সেটা হ'ল মানুষের পূর্বলব্ধ কিছু ধারণা যেগুলো প্রাত্যহিক জীবনের নানা সংশ্রব থেকে গড়ে ওঠে। সিনেমার প্রতীক প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষ্যণীয় যেটা নির্ভর করে দর্শকের বোধের স্তরের ওপর। দর্শক যদি নিজের স্মৃতি থেকে, সত্তা থেকে বা মগ্ন চৈতন্যের সংগ্রহ থেকে প্রতীকের ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ ক'রে না নিতে পারেন তবে প্রতীক কেবল একটা নিছক ইঙ্গিত হিসেবেই থেকে যাবে। কোনো গভীর অর্থ জ্ঞাপনে অসমর্থ হবে। তাই চলচ্চিত্রের প্রতীক বুঝতে দর্শকদের একটু সচেতন হওয়া চাই। মূলতঃ দর্শকের দৃষ্টিকে সজাগ রাখতে হবে। চলচ্চিত্রে প্রতীক একসঙ্গে অনেকগুলো দৃশ্যকে দর্শকদের চোখের সামনে সাজিয়ে দেয়। একটা দৃশ্যে একটা বিশিষ্ট প্রতীক একই সঙ্গে আমাদের সামনে অনেক ঘটনা অনেক মুহূর্ত, অনেক দৃশ্যের সূচনা করে যার থেকে আমরা প্রতীক প্রয়োগের তাৎপর্যে চলে যেতে পারি।

এখানে আমাদের বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যের Association কাজ করে। মনস্বী চলচ্চিত্র বিদ্ আইনেস্টাইন প্রসিদ্ধ জাপানী কবিতা হাইকু উদ্ধৃত করে চলচ্চিত্রের প্রতীক ব্যাখ্যা করেছিলেন যার থেকে আমরা প্রতীক সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পেতে পারি। হাইকু কবিতায় আছে—

An evening breeze blows :
The winter ripples
Against the blue heron's legs.

এই কবিতার প্রত্যেকটা লাইনই সিনেমার নিজস্ব ভাষায় ভাবা যায়। তিনটে লাইনে আলাদা চিত্র আছে। আবার তিনটে মিলিয়ে পুরো একটা দৃশ্যক্রম। চলচ্চিত্রের পরিচালকের ক্ষেত্রে এই তিনটে লাইন নানাভাবে দেখা দিতে পারে।

তিনি এই পুরো ব্যাপারটাকে চলচ্চিত্রেরপর্দায় কিভাবে রূপ দেবেন সেটা নির্ভর করছে তাঁর নিজস্ব ক্যামরা সঞ্চালনের ওপর। এই তিনটে দৃশ্যের যেমন ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ আছে তেমনি তিনটে দৃশ্য একত্রে একটা সমগ্র ভাবকেও প্রকাশ করছে। সেটা হ'ল একটা বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ। সমগ্র প্রকৃতি যে একটা নিত্য অনন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে সেই ভাবটাও এই তিনটে লাইনে পরিস্ফুট। অর্থাৎ বাস্তবিক জগতের সময়টা কিভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে

সেটাকে পরিচালক ইচ্ছে করলে একটা মূল প্রতীকের আশ্রয়েও দেখাতে পারেন। দৃশ্য হিসেবে এগুলো কেবল তিনটে পরস্পর আলাদা চরিত্র নিয়ে বিরাজ করছে কিন্তু পরিচালক ইচ্ছে করলে ছবিতে কোনো চূড়ান্ত ঘটনা বা একটা নাটকীয় দৃশ্যপর্যায়ের পর এই শান্ত সমাহিত প্রাকৃতিক দৃশ্যটিকে জুড়ে দিয়ে ছবির চরিত্র বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সেটা নির্ভর করছে ছবির গতি, ঘটনা ও বিষয়বস্তুর পরিণতির ওপর। প্রসঙ্গতঃ আন্তনিওনির 'ব্লো-আপ্' ছবির একটা দৃশ্য পর্যায় স্মরণ করা যেতে পারে। নায়ক রাত্রির অন্ধকারে একটা মৃত্যুরহস্যকে জানবার জন্যে পূর্বে আসা এক পার্কে প্রবেশ করে। তখনকার পার্কের পরিবেশটি ছিল এমন—ছবির ফ্রেমে পার্কের গাছের পাতাগুলি শিরশির ক'রে কাঁপছে, ওপরে দিগন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ, চারপাশে নিথর নিস্তব্ধতা, জনমানবশূন্য পার্কে নায়ক একটি মৃতদেহের সন্ধান করছে। গাছের পাতা নড়ার শব্দ ভিন্ন অন্যকোনো শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। আবার ছবির ফ্রেমে নায়কের চিন্তান্বিত মুখমণ্ডল, ব্যাকগ্রাউণ্ডে পার্কের রহস্যময় নিঃসঙ্গতা। এই সবকটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য যেমন এক একটা মুহূর্তের ভাবকে ফুটিয়ে তুলছে তেমনি সবমিলিয়ে একটা গূঢ় অর্থকে বহন করছে। প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের চোখের আড়ালে কত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে, মানুষ তার খবর রাখে না। প্রকৃতি কিন্তু পূর্বাপর অনড় অটল। রহস্য রহস্যই থেকে যাচ্ছে।

'পাখীর নীড়ের মতো চোখ' এই অতিবিখ্যাত কবিতার পংক্তিটি মনে পড়লেই প্রতীক সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু মনে হয়। প্রথমেই পাখীর নীড়ের আকার তার মাধুর্য, তার স্বাভাবিক কারুকার্য তার সঙ্গে নারীর চোখের সাদৃশ্য। সবমিলিয়ে আমাদের স্মৃতি কল্পনা কাজ করতে থাকে। কিন্তু সিনেমার পর্দায় যখন আমরা একটা প্রতীক লক্ষ্য করি তার আবেদন আমাদের মনের জগতে তৎক্ষণাৎ কাজ করে। এখানে সিনেমার প্রতীক যেহেতু Visual অর্থাৎ দৃশ্যগ্রাহ্য তাই অনেক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ যেহেতু সিনেমায় যাবতীয় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ আমাদের চোখের সামনে এখনই ঘটে যাচ্ছে তাই সিনেমার প্রতীকও ঠিক তেমনি ভাবে প্রবাহিত বর্তমান কালের অনুষঙ্গে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছে। ফেলিনির বিখ্যাত লা দল্‌চে ভিতা'র শুরুই হচ্ছে এক অসাধারণ প্রতীকময়তায়। পাথরের বিরাট একটা যীশু মূর্তিকে হেলিকপ্টারে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই মূর্তির প্রলম্বিত ছায়ার নীচে বিভিন্ন বাড়ীর ছাদে, ছায়াময় গলিপথের ধারে ধারে একাধিক নরনারী আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

অর্থাৎ আধুনিক পাপবোধ, রীতিহীনতা, যৌনতার অসীম হাহাকারকে পরিচালক যীশুমূর্তির চলমান ছায়ার দ্বারা বিধৌত করছেন। আধুনিক সিনেমার প্রতীক প্রয়োগে এটি একটি স্মরণীয় নিদর্শন।

প্রতীকের মধ্যে একটা ব্যাপকতার ভাব থাকে। সিনেমায় এক একটা খণ্ড খণ্ড দৃশ্যাংশে একাধিক প্রতীকের প্রয়োগ ঘটে। চলচ্চিত্র যেহেতু অসংখ্য খণ্ড দৃশ্যের সমবায়ে গ'ড়ে ওঠে তাই তার প্রতীকও এক একটা খণ্ডের মধ্যেই ব্যঞ্জিত হয়। চলচ্চিত্রে প্রতীক প্রয়োগের সময় পরিচালককে যে বিষয়টার সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে হয় তা হ'ল ঘটনার পূর্বাপর যোগ। হঠাৎ কোনো অবিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্ন প্রতীকের দ্বারা ছবির কোনো মর্মবস্তু প্রকাশ করা যায় না। পরিচালক প্রয়োজনবোধে একটি দৃশ্যে বা একটি দৃশ্যক্রমে (Sequence) যখন কোনো বিশেষ প্রতীকের আশ্রয় নেন তখন তাঁকে আগে ও পরের দৃশ্যাংশের ঘটনা ও পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষ সজাগ থাকতে হয়। নাহলে প্রতীক প্রয়োগ অর্থহীন হ'য়ে পড়বে। এখন কয়েকটি ছবির স্বতন্ত্র প্রতীক প্রয়োগের নিদর্শন উল্লেখ করলে সিনেমার প্রতীক সম্বন্ধে উপলব্ধি হবে। গ্রিগরি চুখরাই পরিচালিত 'Forty first' ছবিতে যুদ্ধক্লান্ত, পথ পরিশ্রান্ত এক তৃষ্ণার্ত সৈনিক রুক্ষ, কঠিন মরুভূমির মধ্যে প্রহরারত অবস্থায় উপবিষ্ট। ক্লান্তিতে তার চোখ জুড়ে আসছে। মিক্স-এর মাধ্যমে পরের দৃশ্যেই আমরা দেখি একটি ছোট পর্ণকুটীর, চারপাশে মনোরম ফুলের সমারোহ, অগ্রপ্রান্তে ঝর্ণার স্বচ্ছ জলপ্রবাহ : এর পরের দৃশ্যেই আবার আমরা পূর্ব দৃশ্য সংস্থানে ফিরে যাই যেখানে ঐ তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরীকে অপর একজন সৈনিক জাগিয়ে দিচ্ছে। এখানে প্রচণ্ড রুক্ষতা, তৃষ্ণা, দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত পরিশ্রান্ত সৈনিকের ধ্যানচিন্তায় বিভিন্ন সুকুমার, স্নিগ্ধ, কোমল বস্তুর উপস্থাপনায় মানুষের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের আকাংখাকে পরিচালক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবিতে নদীর ধারে অনসূয়া ও ভৃগুর মানসিক সাযুজ্যতার পর এক সময় ক্যামেরা ভাঙা রেল লাইনের ওপর দ্রুত গতিতে ট্রাক ক'রে অন্ধকারে মিশে গেছে। এখানে ছিন্ন রেল লাইনকে পরিচালক বিভক্ত বাংলার প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। সত্যজিতের 'জলসাঘর' ছবিতে অসাধারণ কয়েকটি প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেগুলো চলচ্চিত্রে ইমেজ ব্যবহারের কুশলতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। বাড়ীর বাইরে জমিদার দাঁড়িয়ে আছেন। দূরে তাঁর হাতী ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় কারখানার মালিকের লরির ধোঁয়ায় তাঁর হাতী আবৃত হয়ে যায়। অর্থাৎ

ক্রমশঃ সামন্ততন্ত্রের পতন ও সেই সঙ্গে 'ইন্‌ডাস্ট্রীয়াল একসপ্যানসান'কে সত্যজিৎ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সত্যজিতের 'অপরাজিত' ছবির একটি পর্যায়ে যেখানে হরিহরের মৃত্যু ঘটছে, সেখানে সত্যজিৎ এক অতুলনীয় ইমেজের মাধ্যমে মানবজীবনের চিরায়ত মৃত্যুর স্বরূপ ফুটিয়েছেন। হরিহরের প্রশ্বাস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, সর্বজয়া অন্তিম মুহূর্তে হরিহরের মুখে গঙ্গাজল ঢেলে দিচ্ছে ; আর যে মুহূর্তে হরিহরের মৃত্যু ঘটলো, কাশীর গঙ্গার ঘাটের সংলগ্ন কোনো এক মন্দিরের উঁচু চত্বর থেকে একদল পায়রা নিঃসীম দিগন্তে মিলিয়ে গেল। আজ পর্যন্ত বাংলা ছবিতে মৃত্যুকে এইভাবে এত অর্থবহ ভাবে কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সত্যজিতের আগে পর্যন্ত বাংলা ছবিতে প্রদীপের জ্বলন্ত শিখার হঠাৎ নিভে যাওয়ার মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুকে বোঝানো হ'ত যেটা সিনেমার অত্যন্ত স্থূল প্রতীক। সত্যজিতের 'নায়ক' ছবিতে যে প্রতীকের উপস্থিতি তা চূড়ান্তরূপে আধুনিক মননের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। মানসিক অস্থিরতাজনিত আত্মচিন্তার ফলস্বরূপ টাকার বিশাল পাহাড়ের ওপর অরিন্দমের স্বপ্নভ্রমণ। ছবিতে দেখা গেছে অরিন্দম একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে রাশীকৃত টাকার ওপর হেঁটে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ বিরাটাকৃতির কংকালের হাতের মডেলে রাখা টেলিফোনের ক্রমান্বয় ধ্বনি। অরিন্দম ভয়ে পালাতে চায় কিন্তু পারে না। টেলিফোনের আওয়াজ তাকে আরো ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। নিরুপায় অরিন্দম ধীরে ধীরে টাকার চোরা ঘূর্নিতে ডুবে যায়। অতি পরিচিত শংকরদা এসেও তাকে টেনে তুলতে পারে না। একদিকে অরিন্দমের আকাংখিত স্বপ্নময় ভ্রমণ অপরদিকে টেলিফোনের ধ্বনিকল্পে কর্মজগতে ফিরে যাবার সেই ক্লান্তিকর আহ্বান। উভয়ের টানাপোড়েনের দ্বন্দ্বের ভাবসৃষ্টিতে উক্ত প্রতীক কল্পনাটি অনবদ্য।

সিনেমায় পরিচালকের সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে তাঁর ব্যবহৃত প্রতীক যেন অতি সাবজেক্‌টিভ হয়েও দর্শকদের কল্পনার জগতে পৌঁছতে পারে। সিনেমায় সাবজেক্‌টিভ প্রতীক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে সত্যজিতের 'অপুর সংসার' ছবিতে। অপর্ণার অকাল মৃত্যুতে নিদারুণ শোকে মুহ্যমানা অপর্ণার মায়ের বিপুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কাটিং এর মাধ্যমে পরবর্তী দৃশ্যে সমুদ্রের উন্মত্ত, উত্তাল ঢেউয়ের তীরভূমিতে আছড়ে পড়ার দৃশ্য প্রতীকী গূঢ়তায় অনবদ্য। 'অতিথি' ছবির শেষ দৃশ্যে তপন সিংহ একটি প্রয়োগ করেছেন যেটি সিনেমার ক্ষেত্রে খুব স্থূল হয়ে পড়েছে। সিনেমার পর্দায় এই ধরণের প্রতীক

ছবির শিল্পত্ব নষ্ট করে। বালক তারাপদ বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি সহজাত আকর্ষণ-বশতঃ কোনো ঘরের বাঁধনেই আবদ্ধ হতে চায় না। কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবুর আশ্রয়ে কিছুদিন স্থিত হলেও বেশীদিন তাঁর মন টেঁকেনা এবং মতিলালবাবু তাঁর কন্যার সঙ্গে তারাপদর বিয়ে স্থির করলে এবং তারাপদর মা ও ভাই কাঁঠালিয়ায় পৌঁছলে দেখা যায় তারাপদ বিশ্বজননীর আহ্বানে আবার ঘরছাড়া হয়েছে। শেষ দৃশ্যে তারাপদ একটি পালতোলা নৌকায় আবার কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। ক্যামেরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে নৌকোর পালের গায়ে আঁকা এক তুরন্ত হরিণকে ফ্রেমে আবদ্ধ করেছে বিশ্ব-প্রেমিক তারাপদ প্রকৃতিকে আস্বাদনের চঞ্চলতা মূর্ত হয়েছে ঐ হরিণের প্রতীকে। কিন্তু প্রতীক প্রয়োগটি ঠিক 'সিনেমাটিক' হয়ে ওঠে নি। প্রতীকের ব্যবহারটি খুব সাধারণ স্তরেই রয়ে গেছে। প্রতীকের মধ্যে যে সংহতি থাকে এর মধ্যে সেটি অনুপস্থিত। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে অনেক শিল্প শ্রেষ্ঠ ছবিতে অনেক সময় জটিল প্রতীক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় যেগুলো অনুধাবনে চলচ্চিত্রে দর্শকের দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। বার্গম্যান যেমন তাঁর 'ওয়াইল্ড ষ্ট্রবেরিজ' ছবিতে পেরেকের আঘাতে হাতের রক্ত ক্ষরণের মধ্য দিয়ে যীশুর রক্তক্ষরণের প্রতিভাস রচনা করতে চেয়েছেন, 'লা দলচে ভিতা' ছবির শেষ দৃশ্যপর্বে ফেলিনি যেমন এক বাভৎস সামুদ্রিক মাছের কুৎসিত চোখের দৃশ্য সংযোজনের মধ্য দিয়ে গোটা পাশ্চাত্যের নৈশ উন্মত্ততা, ব্যাভিচার, সভ্যতার বিকৃতময় রূপকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই সব প্রতীক আধুনিক সিনেমা শিল্পের বিশিষ্ট সম্পদ। চলচ্চিত্র মাধ্যমটি যত আধুনিক হচ্ছে তার শিল্প ব্যাকরণও ততো নোতুন আঙ্গিকে নিজের চরিত্র গ'ড়ে নিচ্ছে, সুতরাং আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে স্রষ্টা কখন কীভাবে সভ্যতা, ইতিহাস আর উপকথার সূত্র থেকে তাঁর চিত্রকল্প তৈরী করে নিচ্ছেন। কারণ চলচ্চিত্র একালের একমাত্র গতিময় শিল্পমাধ্যম যেখানে দর্শকের দৃষ্টির সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার পরিধি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

মন্তাজ

শিল্পের ইতিহাসে এমন কিছু সংজ্ঞা থাকে যা বহুকালের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেও জীর্ণ হয় না। শিল্পের এইসব সংজ্ঞা স্বকীয় বিশিষ্টতায় বিভিন্নকালে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করলেও তার মৌল প্রতিপাদ্যটা বরাবর এক থেকে যায়। চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে 'মন্তাজ' এই জাতীয় একটা সংজ্ঞা। সংজ্ঞা না বলে একে সিনেমার একটা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া বলাই সংগত, কারণ এই ব্যাপারটা সিনেমার একটা উল্লেখযোগ্য রীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই রীতির নাম হ'ল সম্পাদনা। অর্থাৎ 'মন্তাজ' মূলতঃ সিনেমার সম্পাদনার একটা অংগ। 'মন্তাজে'র বৈশিষ্ট্য, রীতি এবং কাঠামো নিয়ে চলচ্চিত্রবিদ্‌দের মধ্যে মতান্তর আছে। বহুজন এর বহু ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু প্রাথমিক শর্তে 'মন্তাজ' কি সে নিয়ে সকলেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাহ'ল মন্তাস্তর ভাষায়: All, in fact, that 'montage' means is 'editing', the arrangements of shots, মন্তাজ' শব্দটি মূলতঃ ফরাসী। কিন্তু রুশ চলচ্চিত্রকারেরাই প্রথম এই শব্দটির শিল্পগত তাৎপর্য প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই রীতির অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একে একটা যুক্তিসংগত প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে 'মন্তাজ' নিয়ে সারা বিশ্বে যত আলোচনা যত আলোড়ন হয়েছে তা সবই এই রাশিয়ান মন্তাজ রীতির তত্ত্বকেন্দ্রিক। লিও কুলেশভই প্রথম যিনি রাশিয়ায় 'মন্তাজ' শব্দটির আমদানী করেছিলেন। তাঁর পূর্বে এই শব্দটি রাশিয়ার চলচ্চিত্রকারদের কাছে অজানা ছিল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে কুলেশভ একটি ছবি করেছিলেন, নাম ছিল 'The Project of Engineer Prite' এটাই প্রথম রুশ চলচ্চিত্র যা মন্তাজ রীতির অনুষঙ্গে তৈরী হয়েছিল। অবশ্য কুলেশভ নিজে 'মন্তাজে'র প্রথম আবিষ্কারক রূপে মার্কিন চলচ্চিত্রকার গ্রিফিথের নাম করেছেন; তাঁর কথায় "Historically, I think it was Griffith. But the credit for the first theoritical studies on 'montage' must perhaps go to me." কুলেশভ দীর্ঘকাল 'মন্তাজ' নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন যা 'কুলেশভ

এফেক্ট' নামে বিখ্যাত হ'য়ে আছে। এখানে মন্তাজের আলোচনায় একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে মার্কিন পরিচালকরা মন্তাজকে সাধারণভাবে বিভিন্ন দৃশ্যের একই সঙ্গে দ্রুত আনস্তর্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যা ডিজলভস, ওয়াইপস্ ও নানা অপটিকাল প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁদের ছবিতে সংঘটিত হ'ত। অনেকে 'মন্তাজ' বলতে আবার সাধারণতঃ সুপার ইম্পোজিসনকেই বোঝেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে মন্তাজের তাৎপর্য আরো গভীর। মূলতঃ 'মন্তাজ' হ'ল সেই রীতি যা বিভিন্ন শিল্পভাবনা, বিভিন্ন অনুভূতি, বিবিধ গঠনরূপ ও দৃশ্যকে এমনভাবে একত্রে মেলায় যা থেকে একটা অখণ্ড কল্পনা প্রতীত হ'য়ে ওঠে। 'মন্তাজ' তাই বিশেষভাবেই চলচ্চিত্রকারের স্বকীয় সমুন্নত কল্পনা শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কুলেশভের পরে বিশ্ববিশ্রুত পরিচালক আইজেনস্টাইন 'মন্তাজ' নিয়ে বহু পরীক্ষা করেছেন এবং চলচ্চিত্রের ব্যাকরণে মন্তাজের একটা তাত্ত্বিক দিক খুলে দিয়ে গেছেন। আইজেনস্টাইন 'মন্তাজ' বলতে বুঝতেন 'সংঘাত'। দুটি বিপরীতধর্মী খণ্ডাংশের মধ্যবর্তী সংঘর্ষই তাঁর কাছে 'মন্তাজ'রূপে প্রতীত হ'ত। দুটি বিপরীত ধরনের দৃশ্যের সংঘাতে যে নোতুন রূপের জন্ম হয়, তাকেই আইজেনস্টাইন 'মন্তাজ' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ছবিতে দুয়ের বেশী একাধিক দৃশ্যের ক্রমঅন্বিত যে পরিণতি দেখা যায় তাও মন্তাজের অঙ্গ। আইজেনস্টাইনের 'পোটেমকিন' ছবিটি মন্তাজের এতাবৎ শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে এখনও স্মরণীয়। ছবির তৃতীয় সিকোয়েন্সের শেষের দিকে জাহাজ এবং সমুদ্র তীরবর্তী বিভিন্ন দৃশ্যে দ্রুত কাটিং এই মন্তাজ রীতিতে গড়ে উঠেছে। যেখানে তিনি কখনো জাহাজে কখনো তীরের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুতদৃশ্যকে নিয়ে গেছেন এমনভাবে যেখানে একটা নাটকীয় সংশ্লেষ পরিণত হয়েছে। জাহাজ এবং সমুদ্রতীরের সবকটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের আনস্তর্য (succession) থেকে দর্শকরা সহজেই জনতার বিদ্রোহ ও সংঘবদ্ধতার সুন্দর একটা পরিচয় লাভ করে। এই ছবির চতুর্থ পর্যায় অর্থাৎ বিখ্যাত 'ওডেসা'র সিঁড়ির দৃশ্যে মন্তাজের রীতি এক চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এখানে প্রথমে আইজেনস্টাইন উৎফুল্ল জাহাজের নাবিক এবং তীরের জনতার ভীড়ের দৃশ্যের মধ্যে ইন্টারকাট্ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি এই অংশে একটা টাইটেল ব্যবহার করেছেন 'suddenly' এবং দর্শকরা সত্যিই 'হঠাৎ' দেখে যে কশাক সৈন্যরা আচমকা ওডেসার সিঁড়ির শীর্ষদেশে উপস্থিত যেখানে জনতারা এক জায়গায় সংঘবদ্ধ। এবারের দৃশ্য : কশাকরা আক্রমণ শুরু করে, অন্যদিকে পোটেমকিন জাহাজের

নাবিকরা বিশাল এক কামানের গোলা নিক্ষেপ করে কশাকদের প্রধান কার্যালয়ের দিকে, যেখানে কশাকদের ঐ রঙ্গভূমিটা ধ্বংস হ'য়ে যায়। এই সমস্ত দৃশ্যাক্রমের মধ্য থেকে আইজেনস্টাইন একটা চূড়ান্ত সিন্‌থেসিসে পৌঁছে গেছেন যা তাঁর একান্ত অভিপ্রেত ছিল, অর্থাৎ দর্শকদের দৃষ্টির সামনে একটা দুর্দমনীয় সংঘাত গড়ে তোলা। এই সমগ্র আক্রমণের ব্যাপারটাই অসংখ্য ইন্টারকাটের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এই দৃশ্য পর্যায়ে আইজেনস্টাইন অসংখ্য খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের সমবায়ে একটা দ্বন্দ্ব গড়ে তুলেছেন যা সম্পাদনার নিজস্ব ছন্দ অনুযায়ী একটা অখণ্ড সৌন্দর্য লাভ করেছে. কশাকরা সিঁড়ির ওপর থেকে নীচের দিকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে, ভীত সন্ত্রস্ত জনতা দিক্‌বিদিকে ছোটাছুটি করছে, মধ্যে মধ্যে এক একটি স্বতন্ত্র খণ্ড দৃশ্যে মানুষের পড়ে যাওয়া, একাকিনা এক জননী নাচে নেমে আসা জনতার ভীড়ের মধ্য দিয়ে ঠেলে ওপরে উঠতে চেষ্টা করছেন, তিনি উঠছেন, সৈন্যরা নীচে নামছে, তাদের সম্মিলিত পা সিঁড়িতে পড়ে থাকা নিশ্চল মৃতদেহগুলির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে. একটি বাচ্চা সমেত প্যারাম্বুলেটর দ্রুত সিঁড়ির ওপর থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, এরই মধ্যে একই দৃশ্যের অনেকবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পুরো ব্যাপারটাকে নাটকীয় গতিবেগ দেবার জন্যে। উল্লিখিত এই একাধিক টুকরো টুকরো দৃশ্যের সমবায়ে যে সংঘাতের জন্ম হয়েছে তা মূলতঃ একটি দীর্ঘ সিকোয়েন্সের চূড়ান্ত সিদ্ধিরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আইজেনস্টাইনের মতে সম্পাদনার মাধ্যমে ওপরের সবকটি দৃশ্য থেকে একটা অখণ্ড দ্যোতনার সৃষ্টি হয়, তাইই হ'ল মন্তাজ, যা ছবিতে এক বিশেষ প্রার্থিত ছন্দ এনে দেয়। এখানে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে আইজেনস্টাইন মনে প্রাণে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাই তাঁর মতে 'মন্তাজ' অর্থে বিশেষভাবে বিভিন্ন বিরোধী সংশ্লেষই (Synthesis) হ'ল আসল ব্যাপার।

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবিতে একটা অনবদ্য 'মন্টাজে'র দৃশ্য আছে যেখানে মূলতঃ সুপারইম্পোজিশনের মাধ্যমে মন্তাজ গড়ে উঠেছে। চারু একটি পত্রিকার নিবন্ধ রচনার জন্য বিষয় ভাবছে, তার স্মৃতি কাজ করছে, পর্দায় ভেসে উঠেছে একই সঙ্গে একাধিক দৃশ্য, তার শৈশবের গ্রামের স্মৃতি, চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, গাজনের বাজনা, সঙ, চড়কের নানা উপকরণ, একই সঙ্গে কাজ আর দৃশ্য অর্থাৎ ধ্বনিকল্প আর চিত্রকল্প মিলে একটা মূল ব্যাপারে পৌঁছানো—চারুর শৈশব এক মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠছে, পর্দার বুকে একে একে অনেক দৃশ্য চিত্রিত হবার পর

দর্শকরা শুধু চারুকে দেখে সে তার কাঙ্খিত রচনা লিখতে শুরু করে। রুশ পরিচালক পুদভকিন যে রীতিতে 'মন্তাজ' গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন আইজেনস্টাইন তার বিরোধী ছিলেন। পুদভকিনের মতে দুটি দৃশ্যের সম্পাদিত সমন্বয়ে যে ব্যাপারটি গড়ে ওঠে সেখানে A+B উভয়ই বজায় থাকে। আইজেনস্টাইন তা মানেন না, তিনি বলেন A+Bর সংযোগে যা সৃষ্টি হবে তা উভয়ের অংশও নয় আবার যোগফল AB একসঙ্গেও নয়, তা হ'ল সম্পূর্ণ এক নোতুন ব্যাপার অর্থাৎ 'C' চলচ্চিত্রে তাই 'মন্তাজে'র ক্ষেত্রে দৃশ্য নির্বাচনের ওপর ভীষণ গুরুত্ব দিতে হয়। কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ দৃশ্য যুক্ত হবে, কোন্ খণ্ড দৃশ্যকে প্রয়োজনে একাধিকবার একইভাবে বারবার দেখানো হবে, এ সবের পিছনে কল্পনাশক্তি ও শৈল্পিক যৌক্তিকতা থাকা চাই নাহলে সমগ্র দৃশ্যক্রম (sequence) থেকে কোনো মৌলিক ফলশ্রুতি বেরুবে না। 'মন্তাজ' হ'ল সিনেমা শিল্পের সবচেয়ে দুরূহ এবং শক্তিশালী কৌশল। এর মাধ্যমে ছবিতে একটা গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। অধিকাংশ রুশ পরিচালকরা মন্তাজের এই ফোর্সকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চিত্ত উন্মোচনের স্বার্থে ছবিতে কাজে লাগিয়েছেন। কারণ বিপ্লবী রাশিয়ার যুদ্ধোন্মাদ পরিবেশের মধ্য থেকেই অধিকাংশ পরিচালকরা চলচ্চিত্র মাধ্যমটির প্রকৃত শিল্প তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। আইজেনস্টাইন মন্তাজের রীতির জন্য মুল চারটি উপকরণের উল্লেখ করেছিলেন যেমন 'মেট্রিক মন্তাজ,' 'রিদ্‌মিক মন্তাজ' 'টোনাল মন্তাজ' এবং 'ওভার টোনাল মন্তাজ' এছাড়া তিনি 'ইন্‌টালেকচ্যুয়াল মন্তাজ' নামে আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিলেন। প্রথম অর্থাৎ শেষোক্ত মন্তাজ রীতির ক্ষেত্রে তিনি শব্দ ও চিত্রের সংঘাত ও সান্নিধ্যের ফলশ্রুতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চলচ্চিত্রে 'মন্তাজ' ব্যাপারটি যেভাবে এসেছে সাহিত্যের মধ্যে বহু আগেই তার বীজ নিহিত ছিল অন্য অর্থে। টলস্টয় তাঁর একটি চিঠিতে এই 'মন্তাজ' রীতির উল্লেখ করেছিলেন একটি ভিন্ন শব্দে, তাঁর কথায় 'connection'। টলষ্টয় সিনেমার মাধ্যম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবহিত ছিলেন না, কেননা চিঠিটা যে সময়ে লেখা তখন সিনেমার জন্মই সূচিত হয়নি। কেবল টলষ্টয় নয়, পুশ্‌কিন, হেমিংওয়ে ও আরো অনেকের সাহিত্য রচনায় মন্তাজের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। পুশ্‌কিনের যে কোনো কবিতাই একেবারে দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে যেন ভাগ করা, ঠিক চিত্রনাট্যের মতো, এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে অসংখ্য মন্তাজের ধারণা। কুলেশভ, আইজেনস্টাইন প্রমুখ চলচ্চিত্রকারেরা যে প্রাথমিক শর্তে এইসব সাহিত্য উপাদান থেকে চলচ্চিত্রের 'মন্তাজ' তৈরীর

ব্যাপারটা ভেবেছিলেন এরকম মনে করা অসঙ্গত নয়।

একটা আধুনিক বাংলা ছোট গল্পের শেষ কয়েকটি লাইন থেকে আমরা মন্তাজের একটা সরলীকৃত স্বরূপ বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। এ গল্পের লাইনগুলোতে লেখক আত্মিক দ্বন্দ্বের শেষে স্বামী-স্ত্রী মিলনের মধ্য দিয়ে একটা অপূর্ব 'Filmic Montage' রচনা করেছেন যার বর্ণনা হুবহু সিনেমার দৃশ্যের মতো। ''স্বরূলের বুকে মুখ রেখেছে তুফু, তুফুর মনে হচ্ছে সে এখন সেই তিতিরপুরের ছোট বাড়িতে, আমলকির পাতা ঝরে যাচ্ছে, পুকুরের বাঁশে মাছরাঙা বসে আছে, ধান ক্ষেতে অফুরন্ত রোদ ঝলমল করছে, শম্পা এসে উঠোনে দাঁড়িয়েছে, চুড়িওয়ালা বেগুনি রঙের চুড়ি নিয়ে এসেছে, তুফু পড়া তৈরী করছে—

'মারাঠা দস্যু আসিছেরে ঐ
করো করো সবে সাজ।

কাঁসার জামবাটিটা দুহাতে ধরে তুফু দুধ খাচ্ছে, ওর ঠোঁটে সর লেগে যাচ্ছে, আর স্বরূলের বুকে একটা অতল স্পর্শ অন্ধকারের গভীর নির্জনতার কি আশ্চর্য ভাবে তুফু যেন ক্রমেই হারিয়ে যেতে থাকে, ক্রমেই সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যেতে থাকে।" আইজেনস্টনাইন 'যে Intellectual Montage'-এর কথা বলেছেন, ওপরের রচনার মধ্যে তাই রয়েছে, খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলির বর্ণনা থেকে একটা মন্তাজের স্বরূপ গড়ে উঠেছে। এখানে বর্ণনার মধ্যে শব্দ ও চিত্র যুগ্মভাবে জুড়ে আছে। তুফুর শৈশব, গ্রামের স্মৃতি, প্রকৃতি চেতনা, সেখান থেকে স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্যে বর্তমানের চেতনা যেন এক মুহূর্তে মিলেমিশে একাকার। ওপরে টুকরো টুকরো সবকটি ছবির সংঘাত, দ্বন্দ্ব, নৈকট্য মিলিয়ে যে চূড়ান্ত image তৈরী হয়েছে, মন্তাজের জন্ম সেখানেই। সবাক ছবি তৈরী হবার পর থেকে নির্বাক যুগের মন্তাজ ধারণার শব্দ একটা বিশেষ প্রতীক রূপে গৃহীত হচ্ছে। বুনুয়েলের ইদানীংকার ছবি, আন্তোনিয়োনির ছবি, ঋত্বিক ঘটকের ছবি ও সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এই শব্দকেন্দ্রিক 'মন্তাজ' লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক শর্তে মন্তাজের জন্ম দৃশ্যকল্পের অনুসঙ্গে সূচিত হলেও একালে শব্দের প্রয়োগ তাকে এক নোতুন তাৎপর্য দান করেছে।

আভাঁ গাদ্‌

প্রত্যেক শিল্পে এক একটি বিশিষ্টকালে কিছু সংখ্যক মানুষ নোতুন রীতি ও অভিনব প্রকাশভঙ্গির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলেন। এঁরা হলেন এক ধরনের রীতির প্রবক্তা। এরা হলেন আভাঁগাদ্‌ শিল্পী। শিল্পের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এঁরা সম্পূর্ণ নোতুন, অচেনা এবং পরীক্ষাধর্মী প্রকরণের প্রতি কৌতূহল প্রকাশ করেন। এঁদেরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন সময়ে এক একটা আন্দোলন। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আভাঁগাদ্‌ সেই ধরনের একটা আন্দোলন।

অই আভাঁগাদ্‌ আন্দোলনের জন্ম ফ্রান্সে। এর সময় সীমা ছিল ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত। এর পর আর ঠিক এই ধরনের ছবি তৈরী হয়নি, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই সময়ে প্রায় ১৯৩৩ অথবা ১৯৩৪ সালের সময় পর্বে ফরাসী সিনেমা তার পুরোনো অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রচেষ্টা প্রদর্শন করলো। এবং এই সময়ে প্রায় হঠাৎ বলতে গেলে ফরাসী কমার্শিয়াল সিনেমায় কিছুটা উন্নতি দেখা গেল এবং একদল তরুণ পরিচালক ডকুমেণ্টারী ছবি করতে লাগলেন আর আভাঁ গাদ্‌ সবে মাত্র স্টুডিও চত্বরে প্রবেশ কোরেছে। এটা ছিল সেই সময় যখন জাঁ ভিগো, জাক প্রিভেৎ এবং মার্শেল কার্ন্‌, রেনে ক্লেয়ার আর জাঁ রেনোয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজে নামলেন। আর এটা সেই ঐতিহাসিক সময় যখন দর্শকেরা বেশ কয়েকটি অসাধারণ ছবি দেখে সিনেমার প্রকাশভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সময়কার ছবিগুলো ছিল Zero da Conduite, La Maternella, Le Grand Jeu, Lac aux Dames, Toni Le Dernier, Milliardaire Jenny, L' Atalante, এই সবকটি ছবিই বলতে গেলে আভাঁ গার্দীয় উত্তরাধিকারের অকাট্য প্রমাণ। এই আভাঁ গাদ্‌ আন্দোলনের মুখ্য দুটো প্রবণতা ছিল। প্রথমতঃ সিনেমার প্রথাগত রীতি থেকে বেরিয়ে আসা অর্থাৎ বিষয় বস্তুর নবীকরণ এবং দ্বিতীয়তঃ নোতুন আঙ্গিক-প্রকরণ প্রয়োগের মাধ্যমে সিনেমার নন্দনতত্ত্বের দিক খুলে দেওয়া। এই ব্যাপারটা খুব লক্ষণীয় যে যখনই বিষয় এবং আঙ্গিক একে অপরের থেকে ভিন্ন পথে চলেছে তখনই আভাঁ গাদ্‌ আন্দোলনের মৃত্যু ঘটেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে কাজ করে, চলচ্চিত্রের

ক্ষেত্রে এই আভাঁ গার্দের জন্য তেমনি সনাতন চিত্র আলোচনার বিরোধী ক্ষেত্র প্রস্তুতের হাতিয়ার হিসেবে। স্মরণ রাখা যেতে পারে ১৯২০ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত দেলুক, কান্‌দো, মুসিনাক্‌, রেনে ক্লেয়ার এবং রোবেয়ার দেস্‌নো প্রমুখেরা সিনেমায় শিল্প সম্ভাবনার প্রতি মননশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা এটা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে চলচ্চিত্রের সম্ভাবনাময় যা কিছু উপকরণ, এর ব্যাকরণ, নন্দনতত্ত্ব, সবকিছুকে দুঃসাহসিকতায় ব্যবহার করতে হবে যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সবকিছু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণকে প্রকাশ করতে পারে। সমসাময়িকভাবে কিছু সংখ্যক নবীন চলচ্চিত্রকারেরা দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পকে কারিগরি উপকরণের মাধ্যমে গ্রহণ করতে উৎসাহী হলেন। তাঁরা আবার বললেন যে সিনেমা হল কবিতার মত মর্মগ্রাহী, বাস্তবতা এবং নীতিবাদের মধ্যবর্তী সংযোজক ভাঙতে হবে, ডকুমেণ্টারী ও কাহিনীমূলক বর্ণনার রীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করতে হবে, সনাতন রীতিতে কাহিনী বলা চলবে না। দরকার পড়লে চিত্র পরিচালককে তাঁর মনোমত রূপকল্প গড়ে নিতে হবে—প্রকৃতির হুবহু নকল চলবে না। মনে রাখা যেতে পারে যে এই আভাঁ গার্দীয় আন্দোলনের এইসব নবীন শিল্পীদের বক্তব্যের অনুরণন আধুনিক কবিতা এবং চিত্রশিল্পের মধ্যে লক্ষণীয় ভাবে বিদ্যমান ছিল। এবং ১৯১৪র প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কিউবিজম, দাদাইজম, সুররিয়ালিজম্‌, এক্সপ্রেসনিজম্‌, কনস্ট্রাটিভিজম, বিমূর্ত চিত্রকলা ইত্যাদির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের মধ্যে আভাঁ গার্দীয় লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আভাঁ গার্দ্‌ চলচ্চিত্র আন্দোলনের পটভূমিকা রূপে সেই সময়কার ফ্রান্সের ফিল্ম সোসাইটিগুলির সক্রিয় সংযোগের কথাও স্মরণীয় যেমন, Le club des Amis du Septieme Art, Le Cine-Club de France, Tribune Libre du Cinema'. এগুলি কেবলমাত্র বৃহত্তর দর্শকদের মধ্যে নোতুন ভাবনার আলোই ছড়িয়ে দেয়নি, পরন্তু অনেক পরীক্ষামূলক ছবি দর্শকদের মধ্যে দেখিয়ে ব্যাখ্যাও করেছে। কিন্তু ১৯২৮ এর পর আভাঁ গার্দ্‌ আন্দোলনে সিনে ক্লাবগুলির ভূমিকা প্রায় শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ক্লাবগুলিতে যেসব ছবি প্রদর্শিত হতে থাকে সেগুলি তুলনায় অনেক নিরেশ এবং কম পরীক্ষামূলক। দেলুককে প্রথম আভাঁ গার্দ্‌ পরিচালক রূপে গণ্য করা হয়। আবেলগাঁস ছবিতে চূড়ান্ত সেণ্টিমেণ্ট আর অতিকথনের দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। আপস্‌ত্যাঁ ছিলেন দুর্লভ শিল্প সম্পর্কে গুণী ব্যক্তি কিন্তু টেক্‌নিকের সৌখীনতায় তাঁর সিনেমার দৃষ্টি

কোন্ নির্বাচন বহু ক্ষেত্রে অযৌক্তিক পরিবেশ গড়ে তুলতো। এঁদের মধ্যে লেরবিয়ের ছিলেন বিপ্লবী চিন্তার শিল্পী। এই গোষ্ঠী কেবল কিছু সুন্দর বিক্ষিপ্ত চিত্রঅংশ রেখে গেছেন তাঁদের কয়েকটি ছবির মধ্যে। তাঁর মধ্যে আবেল গাঁসের La Rouee (১৯২২) আপসত্যাঁর Coeur Fidels (১৯২৩) লেরবিয়ের পরিচালিত Feu Mathias Pascal (১৯২৫)। উল্লেখ্যএই সময়ে রেনে ক্লেয়ার, জঁ৷ রেনোয়া, ফায়দার, কাভাল্‌কান্তি এঁরা আভাঁ৷ গার্দীয় আন্দোলনে-সত্যিকার নোতুন চিন্তার আমদানি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একমাত্র আপস্তঁ্যা যিনি পরবর্তী সময়ে ডকুমেণ্টারী ছবির মাধ্যমে নিজের শিল্পবাসনা প্রকাশের প্রকৃষ্ট পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। আর অন্যান্যরা অর্থাৎ দ্বিতীয় আভাঁ৷ গার্দ্‌ গোষ্ঠীর বাকীরা তাঁদের প্রথমদিককার সর্ববিধ প্রবর্তনীর উদ্দীপনা পরিত্যাগ ক'রে কমার্শিয়াল ছবির জগতে আত্মতৃপ্তি খুঁজতে নেমে যান। তৃতীয় আভাঁ৷ গার্দ্‌ চলচ্চিত্র পর্বের শুরু রেনে ক্লেয়ারের কমার্শিয়াল ছবি Paris Qui Dort ও মানরে পরিচালিত Le Retour a la Raison ছবি দুটি দিয়ে। Th Evening of the Bearded Heart প্রথম ছবি যেটি স্বাভাবিক আর্থিক সহযোগিতার বাইরে নির্মিত হয়েছিল এবং কোনো প্রকার কমার্শিয়াল প্রবণতাও ছিল না। এইসময় থেকেই রেনেক্লেয়ার, জঁ৷ রেনোয়া এবং কাভালকান্তি প্রমুখেরা আভাঁ৷ গার্দীয় ছোট ছবি এবং কমার্শিয়াল দীর্ঘ কাহিনীচিত্র উভয় রীতির মধ্যেই পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এর সব ক্ষেত্রেই তাঁরা চেষ্টা করছিলেন যাতে ক'রে দর্শকরা তাদের ভাবনা চিন্তাকে অনেক সহজে অনুধাবন করতে পারে।

আভাঁ৷ গার্দ্‌ চলচ্চিত্র আন্দোলনের পিছনে মূলতঃ দুটি স্পষ্ট প্রবণতা কাজ করেছে। প্রথমতঃ কাব্যিক মেজাজে প্রতিদিনকার কাজকে রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেখানে যুক্তিবাদী প্রখরতার সবসময় প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ, আরেকদল ছিলেন যাঁরা আলোকচিত্রের দৃষ্টিকোণে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে বিভিন্ন বস্তুসমূহকে অস্বাভাবিকভাবে বা তাদের স্বরূপকে ভেঙেচুরে, নানাভাবে বিমূর্তভাবে প্রকাশ করতে উদ্যোগী ছিলেন। আভাঁ৷ গার্দ্‌ চলচ্চিত্রে এই দুটি ধারার প্রায়ই মিলন দেখা যেত। অনেকেই স্লো মোশন এবং ট্রিক ফটোগ্রাফীর পক্ষপাতী ছিলেন। Rien que les Heures (১৯২৫)এ ছবিতে কাভাল্‌কান্তি ডকুমেণ্টারী পদ্ধতির সূচনা করেন যেটি এখনও ভিগোর A Propos de Nice ছবির থেকেও অনেক বেশী দর্শককে প্ররোচিত করেছিল। আর এই সময়েই বলা যেতে পারে যে ক্লেয়ার এবং রেনোয়া তাঁদের কমার্শিয়াল ছবিতে যে ধ্যানধারণাকে

পরিব্যাপ্ত করেছিলেন তার উত্তরাধিকার এসেছিল আভাঁ গার্দ আন্দোলন থেকেই। এই প্রসঙ্গে Le Voyage Imaginaire এবং Le Fantome du Moulin Rouge উল্লেখযোগ্য। রেনোয়া তাঁর La Fille de L'Eau ছবিতে প্রথম স্বপ্নকে দেখালেন যথার্থ স্বপ্নের আঙ্গিকে। এমনকি ফায়দারের কমার্শিয়াল ছবিও আভাঁ গার্দের দ্বারা প্রভাবিত।

চতুর্থ গোষ্ঠীর আভাঁ গার্দীয় চলচ্চিত্রের সূচনা ১৯২৮ থেকে। এই পর্বের ছবি একদিকে আভাঁ গার্দীয় শিল্পচিন্তার সর্বোচ্চ স্তর স্পর্শ করেছে, তেমনি অন্যদিকে এর ক্রম অবনতিও লক্ষ্যণীয়। এই বছরেই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি, একজন অজ্ঞাত সহকারী চিত্রপরিচালক লুই বুনুয়েল এবং অপরজন সুররিয়ালিষ্ট চিত্রকার সালভাদোর দালি দুজনে মিলে নন্দনতাত্ত্বিক জগতে আলোড়ন তুললেন তাঁদের Un Chien Andalou ছবি দিয়ে। সমগ্র ছবিটাই একটা মানসিক আবেশের ছবি। কিছু স্মৃতি, কিছু স্বপ্ন, কিছু বিকৃত চিন্তাকে বুনুয়েল এ ছবিতে দুঃসাহসিক আঙ্গিকে প্রকাশ করলেন। সিনেমা কেবল সুখকর দৃশ্যাবলীতে দর্শককে মোহিত করবে না, প্রয়োজনে সিনেমা ভয়ংকর, ক্রুর চিন্তাকেও দর্শকদের বোধের জগতে পৌঁছে দিতে পারে। এর এক বছর আগেই জেরমেন দুলাক ও সুররিয়ালিস্ট কবি আন্তোনিন আর্তুয়ার চিত্রনাট্য নিয়ে একটি কাব্যিক ছবি তৈরী করেছিলেন 'La Coquille et le Clergyman', তবে ছবিটি একেবারে ব্যর্থ হয় অ্যালেক্স অ্যানিনের খুব খারাপ অভিনয়ের জন্য। এই সময় পর্বে যে ভাস্বরতা চলচ্চিত্রে একাধিপত্য করেছে তা ছিল বুনুয়েল প্রবর্তিত মানবিক অনুভূতির চূড়ান্ত আবেগ। এ সময় যেসব ছবি তৈরী হয়েছিল তার অধিকাংশই যেমন মানরে পরিচালিত Le Mystere du Chateau du De, কাভালকান্তির La Petite Lili (১৯২৮) ও Le Petit Chapaperon Rouge (১৯২৯) জরিস ইভানসের Rain (১৯২৮) জেরমেন দুলাকের Disque No. 957 (১৯২৯) এগুলিতে বুনুয়েলের তীব্র আবেগ প্রবণতার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু বুনুয়েলের দ্বিতীয় ছবি The Golden Age (১৯৩০) এবং অন্যান্য প্রচেষ্টা আভাঁ গার্দীয় আন্দোলনে তেমন দীপ্তি ছড়াতে পারে নি।

এই অবস্থায় আভা গার্দ আন্দোলন প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। সকলেই এই সময়ে নোতুন আর এক আঙ্গিক অনুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর ১৯৩০ এর মার্চ মাসে রোবেয়ার দেস্‌নো আভাঁ গার্দ আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করেন। ১৯৩১এ আর কোনো নোতুন আভাঁ গার্দীয় ছবি

দেখা যায় নি। ১৯৩২ সালে বুনুয়েল ডকুমেন্টারী ছবি নির্মাণে ব্রতী হলেন তাঁর Land without Bread ছবির মাধ্যমে এবং জাক প্রিভেৎ ও পিয়ের প্রিভেৎ দুই ভাই, দুই নবীন তৈরী করলেন এক ব্যঙ্গচিত্র It's in the Bog। যেটি নোতুন ধরনের দুঃসাহসিকতা প্রমাণ করল। এ ছবির দর্শক মিলল না বটে তবে এক বিশেষ দীক্ষিত দর্শকের সম্ভাবনাকে সূচিত করলো। এই ছবিটি সেইসময় থেকেই প্রত্যেক সিনে ক্লাবের বিশিষ্ট সম্পদ রূপে স্থান পেল এবং আভাঁ। গার্দ ঐতিহাসিক শিল্পান্দোলনের বিদায় সূচিত করলো।

সিনেমা ভেরিতে

একটা শিল্প জন্ম নেবার পর থেকেই ক্রমাগত তার পরিবর্তন হ'তে থাকে। এক যুগ থেকে আর এক যুগের সময়ে পৌছতে না পৌছতেই বিভিন্ন শিল্পীরা শিল্পের শরীর সীমায় নোতুন নোতুন টেকনিক প্রয়োগ করতে থাকেন। বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক প্রকরণেও একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। চলচ্চিত্র শিল্পেও এ ব্যাপারটা তার জন্মলগ্ন থেকেই দেখা যাচ্ছে। 'নিওরিয়ালিজম্'-এর মতো 'সিনেমা ভেরিতে' ব্যাপারটাও অনেকটা শিল্প আন্দোলন হিসেবেই গণ্য হয়ে এসেছে। এই শব্দটির জন্ম ফ্রান্সে। অবশ্য এই বৈচিত্র্যের জন্য ফ্রান্স একাকী কৃতিত্বের অধিকারী নয়। কেননা 'সিনেমা ভেরিতে'র পূর্বাভাস আমরা বহু পূর্বে চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে রুশ পরিচালক ভার্তভের চিত্রকর্মের মধ্যে দেখতে পাই। ভার্তভ্ চেয়েছিলেন তথাকথিত বাস্তবতা ও রীতিপ্রিয়তা সম্পর্কিত যাবতীয় দুর্বোধ্য ধারণাগুলিকে সরিয়ে দিতে। তাঁর ১৯২৯-এ নির্মিত' The Man with the Movie Camera ছবিটিতে প্রাত্যহিক বাস্তবতার সাধারণ প্রামাণিকতা থেকে আরো গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। আসলে ফ্রান্সে ষাট দশকের প্রারম্ভে চলচ্চিত্রবিদ্‌রা যে শিল্প-রীতিকে 'সিনেমা ভেরিতে' নাম দিয়েছিলেন সেটা মূলত তিরিশ বছর পূর্বের ভার্তভ্ প্রবর্তিত 'কিনো প্রাভদা (Cinema Truth) বিশেষণটির ফরাসী অনুবাদ। তবে ভার্তভ্ যেখানে কঠিন বাস্তবের ওপর অত্যন্ত বেশী জোর দিয়েছিলেন যেখানে জীবনের অমিশ্রিত উপাদানটাই ছিল মুখ্য, সেখানে ফরাসী সিনেমা ভেরিতের চলচ্চিত্রকাররা জীবনের কঠিন, রুক্ষ এবং যথাযথ উপকরণের সঙ্গে জীবনের ঔচিত্যবোধকে যুক্ত করলেন, কেবল জগতের বস্তুগত দিকটাই নয়, তার ভাবগত বিষয়টিও যথার্থ মূল্যে চিহ্নিত হল। ভার্তভ্ ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে তাঁর, 'কিনো প্রাভদা' পর্বের যেকটি ছবি করেছিলেন তার প্রায় সবকটিই সমকালীন ঐতিহাসিক নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলিতে চলচ্চিত্রের 'ডকুমেণ্টরী' পদ্ধতিটাই প্রধান ছিল। ভার্তভ্ তাঁর স্বকীয় চলচ্চিত্র পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চারণ করেছিলেন :

…"I am eye, I am a mechanical eye.

I, a machine, am showing you a world, the likes of which only I can see. I free myself from today and forever from human immobility.

…This is I, apparatus, manoeuvring in the chaos of movements, recording one movement after another in the most complex combinations."

ফরাসী সিনেমা ভেরিতের আঙ্গিক প্রকরণেও ভার্তভের উক্ত কথাগুলি মূলমন্ত্রের মতো কাজ করেছে। আসলে ফরাসী চলচ্চিত্রকাররা 'সিনেমা ভেরিতে' সংজ্ঞায় যে শিল্প প্রত্যয়কে চিহ্নিত করলেন সেটি হল ডকুমেন্টারী সিনেমা নির্মাণের আর একটি অভিনব দিক। এখানে বস্তু জগতের দৃশ্য গ্রহণে বস্তু ও তৎসংশ্লিষ্ট চরিত্রদের সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে পরিচালকরা অনেকক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবনা-চিন্তা আরোপ করতেন, যা অনেকাংশে সাধারণ চরিত্রদের অচেতন রসিকতার ওপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ত। ফলতঃ অনেক ক্ষেত্রে যেমন একদিকে সিনেমা ভেরিতে স্টাইলে নির্মিত ছবিতে প্রামাণিকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি বজায় থাকতো তেমনি অন্যদিকে সেগুলিতে সাহিত্যরসের থেকে সাংবাদিকতার ইংগিতই বেশী ফুটে উঠত। জাভাত্তিনীর Mysteries of Rome, 'জঁ্যা রোশের' Chronique d'un etc, কিংবা ক্রিস মার্কারের 'Le Joli Mai' ছবিগুলি এই জাতীয়। ভার্তভ্ মূলত তাঁর চলচ্চিত্র-জীবন শুরু করেছিলেন এক প্রচণ্ড আদর্শ আর সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে। তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, উৎসাহ, উদ্ভাবনশক্তি, লেনিনীয় মতবাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে ভার্তভ্ তৎকালীন রুশ চলচ্চিত্রে বিপ্লবী শিল্পীরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত Cinema Truth বা সিনেমা ভেরিতের আদর্শ পরবর্তীকালের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে হুবহু অনুসৃত না হলেও ফ্রান্স, আমেরিকার 'সেনিমা ভেরিতে'র শিল্পীরা যেভাবে চলমান জীবনকে দেখাতে চেয়েছিলেন তাতে বস্তু সত্যের পাশাপাশি মানুষের রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার ইংগিতও ব্যাপকমূল্যে স্বীকৃত হয়েছিল। 'সিনেমা ভেরিতে' প্রথার সঙ্গে বিগত যুগের ডকুমেন্টারী চিত্রনির্মাণ প্রথার কিছু যোগসূত্র থাকলেও আধুনিককালে সিনেমা ভেরিতে বলতে যা বোঝায়, তাতে বিগত যুগের ঐ চলচ্চিত্র নির্মাণ-প্রথার একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ

আমেরিকার রিচার্ড লেককের নাম করা যায় যিনি প্রামাণিকভাবে ১৯৪৮ সালে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির Lousiana Story তে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করাকালীন তাঁর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু লেককের নিজস্ব চলচ্চিত্রকর্মে তিনি ফ্ল্যাহার্টির দৃষ্টিভংগি এবং সিনেমা টেকনিক খণ্ডন করে এক স্বকীয় রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। লেকক্ এবং তাঁর সহকারীরা দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতি দৃশ্যের কম্পোজিশন, তার শিল্পগত অর্থ এবং ছবির সামগ্রিক তাৎপর্য নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন এবং এর ভেতর দিয়েই তাঁদের সিনেমা-নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে একটা পরিণত শিল্পভূমিকা তৈরী হয়ে গেল। লেকক ও তাঁর শিল্পীগোষ্ঠীর কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে Life পত্রিকার সাংবাদিক ড্রিউ লেককের ছবি প্রযোজনা করতে শুরু করলেন এবং ড্রিউকে প্রযোজকরূপে পেয়ে লেকক সম্পূর্ণ নোতুন এক শিল্পরীতি গড়ে তুললেন যেখানে টেলিভিশনের সাংবাদিক ভংগিও যথার্থ শিল্পোত্তীর্ণ হ'য়ে উঠল। লেককের নোতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন যা কিনা চলচ্চিত্রকারকে আলো, ট্রিপড, তার ইত্যাদি সব সরঞ্জাম ছাড়াই অনেক স্বাভাবিক চলাফেরার সুযোগ দিল এবং সেইসঙ্গে মরিস এনজেল, ডন পন্ বেকার প্রমুখ উৎসাহীদের প্রচেষ্টায় সিনেমা ভেরিতের একটা নির্দিষ্ট চরিত্র ফুটে উঠল। মূলতঃ সিনেমা ভেরিতের সামগ্রিক শিল্পাদর্শই ছিল সেই সনাতন কষ্টকর ৩৫ মিলি মিটারের ক্যামেরার ব্যবহার বর্জন ক'রে তার যায়গায় ১৬ মিলি মিটারের অনেক হাল্কা এবং সহজ-ব্যবহার্য ক্যামেরার প্রচলন করা। এতে এক ধরনের চিত্রগত গুণ হয়তো ক্ষুণ্ন হত বটে কিন্তু অনেক কম খরচে, একার পক্ষে কাজ করা যায় এমন ক্যামেরায় শিল্পীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব তথ্য ও সত্যের দৃশ্যগ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। চলচ্চিত্রে প্রকৃত ঘটনা সংস্থান তার যাবতীয় খুঁটিনাটি সমেত ধরা দিল। সেই সঙ্গে লেককের নোতুন হাল্কা ধরনের সমলয় (Synchronous) শব্দগৃহী-যন্ত্রের কৌশলী প্রয়োগ প্রকৃত ঘটনাস্থানের বস্তু, কাল ও পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, নানাবিধ শব্দকে এমন যাথার্থ্যে বিধৃত করতে সক্ষম হ'ল যা চলচ্চিত্র নির্মাণের আরো দিক খুলে দিল। সিনেমা ভেরিতের চলচ্চিত্রকাররা যে পন্থায় কাজে নেমেছিলেন তাতে ক'রে যে কোনো ঘটনা, যে কোনো স্থান, এমনকি গাড়ীর ভেতরও শব্দ, সংলাপ-আলোকচিত্রে দৃশ্যগ্রহণে কোনো বাধাই ছিল না। দু'জনের একটা দল—এক জনের হাতে বহনীয় ক্যামেরা, অপরজনের হাতে টেপরেকর্ডার—যার ফলশ্রুতি চূড়ান্ত বাস্তবের এক অবিকৃত প্রতিচ্ছবি। ভেরিতের পরিচালকরা এইভাবে

কাজ করেছেন। এবং বলা বাহুল্য চলচ্চিত্রকার এই পর্ব থেকেই যথার্থ শিল্পমূল্যে চিহ্নিত হলেন। তাঁর চেতনা, শিল্পবোধ, আর পরিবেশন নৈপুণ্য এখন থেকে তাঁর সমকালীন বস্তুবিশ্বের সত্যের দ্বারা পরীক্ষিত হ'তে থাকলো। তিনি তাঁর শিল্পের মধ্যে দিয়ে কতোটা খাঁটি, তাঁর শিল্প পরাকাষ্ঠায় মানুষের অস্তিত্ব কতোটা যাচাই হচ্ছে এসব প্রশ্ন একই সঙ্গে স্রষ্টা আর দর্শকের মনে দেখা দিতে লাগলো। সিনেমা ভেরিতে যেমন একদিকে কৃত্রিম নাটকীয়তা, অভিনয় আর অনর্থক সেন্টিমেন্টকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তেমনি সেইস্থানে প্রকৃত জীবন সম্বন্ধ বাস্তবতার জন্য এই ভেরিতের পরিচালকদের অনেক বেশী জীবননিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী হতে হয়েছে।

রীতি হিসেবে লেকক্ যে 'সিনেমা ভেরিতে' আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সেখানে সাধারণ কমার্শিয়াল সিনেমার যাবতীয় যান্ত্রিক ব্যাপারগুলি এবং তার নেতৃত্ব বর্জনই ছিল মুখ্য। লেককের মতে একটি ছবিকে যথার্থ 'সত্য' রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হ'লে তার পরিচালককেই সেই ছবি সম্পাদন করতে হবে। পরিচালক ব্যতীত অন্য কেউ সেই ছবির সম্পাদনা করলে পরিচালক ঠিক কোন্ দৃশ্যের কতোটা স্থায়িত্ব চাইছেন বা কী গতিতে তাঁর ছবিতে বস্তু ঘটনাস্থানের বাস্তবতাকে বহন ক'রে এক চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হচ্ছে—এসব ব্যাপারগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ষাট দশকে ফ্রান্সে এই 'সিনেমা ভেরিতে'র এক নোতুন পরীক্ষা দেখা দিয়েছিল। এর প্রবক্তা ছিলেন জ্যাঁ রোশ্। মূলতঃ একজন জাতিতত্ত্ববিশারদ রোশের প্রথমদিকের ছবিগুলিতে আফ্রিকার আদি-বাসীদের দেশাচার স্থান পেয়েছিল। প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্র-নির্মাণকৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং নান্দনিক সম্পর্কবর্জিত রোশ্ একদিক থেকে তার চলচ্চিত্রনির্মাণে বিষয়বস্তুর ওপর অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপে স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রথমদিকের পূর্ণ দৈর্ঘের ছবিতে পাত্র-পাত্রীদের ছবির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট ক'রে দেখাবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রোশ্ এডগার মরিনের সহযোগিতায় Chronicle of Summer ছবিটি তোলেন। এ ছবিতে রোশ্ সনাতন ফরাসী ভাবপ্রকাশে সমাজসচেতন অনুসন্ধিৎসা প্রয়োগ করেছেন এবং একাধিক সাক্ষাৎকার জুড়েছেন। এদিক থেকে রোশ্ কখনোই লেককের মতো ক্যামেরাকে কেবল নিরাসক্ত দর্শক হিসেবে ভাবতে পারেন নি। এবং তাঁর La Pytamida humaine যেটি বহুজাতি সমন্বিত এবং আফ্রিকান বিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে এবং La Punition ছবিটি যার দৃশ্যাবলী

প্যারিসের রাস্তায় গৃহীত হয়েছে এগুলিতে রোশ, অপেশাদার অভিনেতাদের তাৎক্ষণিক গঠিত দৃশ্যক্রম গড়ে তুলেছেন, কিন্তু যে ব্যাপারগুলি তিনি ছবিতে রেখেছেন সেগুলি ঐ অপেশাদার অভিনেতাদের বাস্তবজীবনের অঙ্গীভূত বিষয়। এইভাবে সিনেমা ভেরিতের শিল্পীরা স্বার্থকভাবে বস্তু ও তথ্যের সমন্বয় করেছেন। লেকক এবং রোশ্ কর্তৃক নোতুনভাবে রূপান্তরিত সিনেমা ভেরিতে অনেকক্ষেত্রে সাধারণ সিনেমার পরিশিষ্টের বেশী সক্রিয় হয় নি। এবং এই আন্দোলনকে সমস্ত রকমের নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপ্লব বলা চলবে না। কিন্তু এই শিল্প প্রথা সিনেমার বাস্তবতার পরিধিকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সেকথা মানতেই হবে। এর দ্বারা ক্যামেরায় গৃহীত দৃশ্যাবলী পরিচালকের খেয়াল-খুশিতে গ্রথিত কাল্পনিক প্রতিচ্ছায়ার পরিবর্তে ঘটনা এবং পরিবেশের একেবারে জলন্ত সত্যটাকে দর্শকদের সামনে হাজির করেছে। যেভাবে বস্তুজগতে প্রতিনিয়ত যে ঘটনা ঘটে থাকে, ভেরিতের পরিচালক তাকে আসল তাৎপর্যে রূপ দিতে প্রয়াসী হলেন। এদিক থেকে উত্তরকালের সিনেমা আন্দোলনে 'সিনেমা ভেরিতে'র একটা আদর্শগত অবদান আছে।

নিও রিয়ালিজম্

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইওরোপের মাটিতে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও মানুষের মননচিন্তনে যে নোতুন চেতনার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে ক্রান্তদর্শী কবি শিল্পীরা নবজীবনের উল্লাস লক্ষ্য করেছিলেন। চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস এখনও একশো বছর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তারই মধ্যে তার জন্মের, প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এই শিল্প চেতনায় এক দারুন আঘাত এল। সময়টা ১৯৪৪ সাল। নাৎসী বাহিনী কবলিত ইতালীর বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে জার্মানদের তাণ্ডবলীলায় তখনো ছেদ পড়েনি। এদিকে মিত্রবাহিনী তার আফ্রিকা জয়ের পর্ব প্রায় সমাপ্ত ক'রে এনে ইতালীতে প্রবেশ করেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, ফ্যাসীবাদী মুসোলিনি ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিলের সমর্থন হারিয়েছেন, জার্মানরা তাঁকে ইতালীর পুতুল-শাসকরূপে ব্যবহার করছেন, মুসোলিনীর স্বক্ষেত্রেও চরম দাঙ্গা উপস্থিত। ইতালীর স্বদেশী যোদ্ধাদের সঙ্গে মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট সমর্থকদের বিবাদ তখন চরমে। এই অবস্থায় মুসোলিনী পরাজিত, গৃহযুদ্ধের তমুলকাণ্ডে পর্যুদস্ত অবস্থায় ইতালী পরিত্যাগ করলেন। আর এক দিকে ঠিক এই রকম রাজনৈতিক অবস্থার অন্তরালে জন্ম নিল চলচ্চিত্রের এক মহান শিল্পমন্ত্র—**নিও রিয়ালিজম**। ইতালীয় পরিচালক **রোসেলিনি** Rome, open City নামে একটি ছবি নির্মাণ করলেন। এতে তিনি নাৎসীদের বিরুদ্ধে রোমের অধিবাসীদের প্রতিরোধের কাহিনী বিবৃত করেছেন। প্রায় সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে গৃহীত এ ছবির পাত্রপাত্রীরা রোমেরই জনসাধারণ, কিছু নাৎসী সৈনিক এবং যাঁরা প্রকৃতভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের নারকিয়তা যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়, সেই সব বহু মানুষের মিলিত সহযোগিতার ফলশ্রুতি ছবিটিকে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মহান করেছে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বস্তুতঃ নিও রিয়ালিজম্, তার তত্ত্বগত কারণে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি একটি শিল্পদর্শন। নিও রিয়ালিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালকদের মূল শ্লোগান ছিল 'Take the camera out into the streets' এবং বাস্তবিক রোসেলিনি তাই ই করেছিলেন। জীবন যেমন, তাকে সেই ভাবে যথাযথ ছবির পর্দায় তুলে ধরলেন পরিচালক। সেই

সঙ্গে যুক্ত হ'ল শিল্পীর সহজাত মানবিকতা, ন্যায় ও সত্যের মূল্যবোধ, জীবন নিগূঢ় ভালোবাসার সহজ সরল গভীর প্রতিচ্ছবি। বস্তুতঃ দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত বাস্তবের কুৎসিত স্বরূপটা শিল্পীদের সামনে নোতুনভাবে উন্মুক্ত হ'ল। শিল্পীরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক জগৎ এবং জীবনটাকে স্বকীয় জীবনবোধের দ্বারা প্রত্যক্ষ করলেন এবং চলচ্চিত্রের পর্দায় তাকে অগণিত মানুষের সামনে তুলে ধরলেন। এই ইতালীয় Nec-realism বা 'নয়া বাস্তবতার' অনুসঙ্গেই চলচ্চিত্র শিল্পের শরীর সীমায় কতকগুলি লক্ষণ ফুটে উঠল, যেমনটি তার আগে আর এইভাবে দেখা যায়নি। বিভিন্ন বিন্যাসে ব্যক্তি চেতনার জাগ্রত প্রকাশ, মানুষের প্রাত্যহিক উত্থান-পতন, বিচ্ছিন্নতাবোধ উৎকেন্দ্রিকতা, মানবিক মূল্যবোধের নবমূল্যায়ন এই সবই ইতালীয় সিনেমায় নয়া বাস্তবতার অবদান। ইতালীয় নিও রিয়ালিষ্ট পরিচালকের শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে ছবিতে সমাজ সচেতনার ছাপ পড়লো। এক অর্থে তাই Nec-realism হ'ল একটি শিল্পাদর্শ। এর মূল মন্ত্র ছিল জীবনকে দেখতে হবে বাস্তবসম্মত দৃষ্টি দিয়ে। 'This is the way things are' অর্থাৎ এই আমাদের জীবন, এই তার চলমান ধারা। এরই মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের নিত্য উপাদান অজস্র ভঙ্গিতে ছড়িয়ে আছে। তাকেই ধরতে হবে, অনুভব করতে হবে, গভীর মমত্ববোধে এই জীবনের সত্যকার স্বরূপের পরিচয় প্রদান করতে হবে। যুদ্ধের বিধ্বংসী লীলার কালে ইতালীর স্টুডিওগুলি ভেঙে চুরমার হ'য়ে গিয়েছিল। অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ শিল্পীরা স্টুডিওর কৃত্রিম চত্বর পরিত্যাগ করে, সমস্ত রকমের মেকী আধুনিকতার ফ্যাশান ছেড়ে যুদ্ধোত্তর ইতালীর পথের ধূলোয় নেমে পড়লেন, উদ্দেশ্য একটিই—দরিদ্র, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত জনসাধারণের মুখের মিছিলে জীবনের বাস্তবরূপটির সন্ধান করা। এই শিল্পাদর্শের উৎস খুঁজলে আমরা দেখতে পাবো যে ঊনিশ শতকী যুক্তিবাদী যে সব ইতালীয় লেখকবৃন্দ যেমন গিওভান্নি ভারগা, লুইগি কাপুয়ানা, আন্তনিও ফোগাজ্জারো, এডমাণ্ডো ডি আমিকি প্রমুখেরা যে বাস্তবসম্মত শিল্প ধারার প্রচেষ্টায় তাঁদের সাহিত্যের আন্দোলন অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন, চলচ্চিত্রের নিও রিয়ালিজম্‌, সেই ভাবধারারই এক ধরনের নব অভ্যুত্থান। এমন কি এইসব সাহিত্যিকরা সময়ে অসময়ে নয়া বাস্তববাদী ইতালীয় চলচ্চিত্রকারদের বহুভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। যদিও রোসেলিনির Rome, Open City ছবিটিকেই এই আন্দোলনের প্রথম অভিব্যক্তিরূপে চলচ্চিত্রবিদরা গ্রহণ ক'রে থাকেন। কিন্তু এই Neo realism

সংজ্ঞাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ইতালীয় ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার উমবার্তো বারবারো, ১৯৪৩ সালের জুন মাসে একটি লেখায়। তাঁর কথায় "If we in Italy wish to abandon once and for all our trashy histories, our rehashes of the 19th Century and our trifling Comedies, we muss try the Cinema cf realism." আর এই উক্তির প্রথম সার্থক শিল্প প্রকাশ ভিসকন্তির 'Ossessione' ছবিতে ১৯৪২ সালে। এ ছবিতে ইতালীর নোতুনরূপ উদ্ঘাটিত হ'ল চরম রূঢ় বাস্তবতায় যেখানে তার দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, তার অতীতের আড়ম্বর আর বর্ণোজ্জলতার স্মৃতি রোমন্থনে ভারাক্রান্ত। এ ছবিতে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা যা পরিচালকের ত্রিতল অভিজ্ঞতার দ্বারা বিধৃত। এই অর্থে ইতালীয় 'নয়া বাস্তবতার' শুরু বলা যেতে পারে এই ছবি দিয়েই। এটি ভিসকন্তির ট্রিলজির প্রথম পর্ব। এর পরবর্তী সবকটি ছবিতেই ভিসকন্তি জীবনে বস্তুতান্ত্রিক দিকটিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর শিল্পসন্ধিৎসায়। ছবিটি ১৯৪২ সালে নির্মিত হলেও এটি সর্বপ্রথম জনসাধারণের সামনে মুক্তি পায় ১৯৪৬ সালে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে এটি দেখানো হয় যেখানে রোসেলিনীর Rome, Open City, ব্লাসেত্তির Un Giorno nella Vita এবং লাতুয়াদার Il Bandito ছবিগুলিও ছিল। এই ছবিগুলিই প্রথম প্রতীচ্য দর্শকদের 'নয়া বাস্তবতার' সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিল। চলচ্চিত্রে এই নিও রিয়ালিজম আদর্শের জন্মের একটা বড় কারণও ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন বহু ইতালীয় পরিচালক তৎকালীন রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপন করেছিলেন, ভিসকন্তি স্বয়ং স্বদেশীদের সাহায্যের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্যতম নিও রিয়ালিস্ট অগ্রদূত ডি সিকা—লিখেছেন— "The war was a decisive experience for us all. Each of us felt the wild urge to sweep away all the worn-out plots of the Italian Cinema and to set up our Camears in the midst of real life, in the midst of all that struck us with dismay.,' ডি সিকার 'Bicycle Thieves' ছবিটি এই শিল্প প্রত্যয়ের অনন্য দৃষ্টান্ত। ১৯৪৮ সালে নির্মিত এই ছবিটি নিও রিয়ালিস্ট শিল্পান্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম। সহরের বুকে দরিদ্র পিতা ও পুত্রের একান্ত অসহায়ের মতো অপহৃত সাইকেল খুঁজে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে পরিচালক সমসাময়িক ইতালীয় মানুষের নৈতিক অধঃপতন, নীচতা, নাগরিক জীবনের সভ্যতার অন্তরালবর্তী পঙ্কিলতা

আর গ্লানির কবলে নিরীহ সাধারণ দরিদ্র মানুষ কেমন বিপর্যস্ত হয়, তার মর্মস্পর্শী স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন সংবেদনশীল জীবননিষ্ঠতায় ও শিল্পিত সৌন্দর্যে। নিও রিয়ালিস্ট পরিচালকরা জীবনের স্বরূপ সন্ধানে, কাহিনীর বেড়াজালে, কৃত্রিম ভাবুকতায় কোথাও চলচ্চিত্রের শিল্পমাত্রা ব্যাহত করেন নি। জীবনের নাটকীয় উপাদান এবং গভীর কাব্যময় অনুভূতি উভয়কেই পরিচালকরা গ্রহণ করেছেন কিন্তু পরিমার্জিত শিল্পাঙ্গিকে তার প্রকাশ হয়েছে অনন্য। 'বাইসাইকেল' থীভস্-এর আগেই ডি সিকা 'Shoeshine' নামে ছবিটি তোলেন ১৯৪৬ সালে, যার মধ্যে যুদ্ধ কবলিত ইতালীর কালোবাজারের একটা সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। ১৯৪৬ সালে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিচালক লুইজি জাম্পা নির্মাণ করলেন To Live in Peace। ১৯৪৭ সালে তুললেন Angelina, ১৯৪৮-এ ভিসকন্তি নির্মাণ করলেন The Earth Trembles, তরুণ জেলেদের দৈনন্দিন জীবনকাহিনী তাদের শোষকদের নৈতিকতা, শোষণ, জেলে সমাজের প্রেক্ষিত, তাদের পারিপার্শ্বিকতা, দারিদ্র্য, ক্রোধ ও আত্মযন্ত্রণা নিয়ে নির্মিত এ ছবি নিও রিয়ালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য হয়। নিও রিয়ালিজমের গোড়ার দিকে শিল্পীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী একটা প্রবণতা ভীষণ সক্রিয় ছিল। মানুষের অস্তিত্বের লড়াই, যুদ্ধ আর শান্তি এই ত্রিবিধ বিষয়ের পরিক্রমায় যুদ্ধ নৃশংসতা, ধ্বংস এবং পরিবেশ চেতনার অনুসন্ধানটাই চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে বেশী মাত্রায় কাজ করেছিল। পরের দিকে শিল্পীরা বাস্তব জীবনের পটভূমিতে ব্যক্তি মানুষের দুঃখ দুর্দশা, আত্মিক সংকট, মনস্তত্ত্ব, নির্দিষ্ট পারিবারিক ঘটনাকেন্দ্রিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আধুনিক সমাজজীবনের চেহারাটা ছবিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং এখান থেকেই 'নয়া বাস্তব' ইতালীয় ছবিতে একটা নোতুন মাত্রা সংযুক্ত হয়—ব্যক্তি চেতনার বিবিধ বিকাশ। আসলে যুদ্ধ স্তিমিত হয়ে যাবার পর পরিচালকরা মানবিক জীবনের যুদ্ধোত্তর সাধারণ সমস্যা, নিয়ে চিন্তিত হতে শুরু করলেন। ডি সিকা তুললেন 'উমবার্তো ডি', রোসেলিনি নির্মাণ করলেন 'ইওরোপা ফিফটি ওয়ান'। ব্যষ্টিজীবনের মুকুরে সমষ্টি জীবনের অনবদ্য আলেখ্য। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে 'নিও রিয়ালিস্ট' আন্দোলনের সবচেয়ে মহত অবদান মানবিক দয়া, এর নিষ্ঠা ও এর স্টাইলের কঠোর শিল্পসংযম। ডি স্যান্টিস পরিচালিত Tragic Hunt ছবির ডাকাত তাড়ানোর প্রতিরোধ, কিংবা Bitter Rice ছবির মৃতদেহের উপর তার সহকর্মীদের দ্বারা মুঠো ভর্তি ক'রে চাল ছড়িয়ে যাওয়া, 'উমবার্তো ডি'

ছবির সেই নৈরাশ্য পীড়িত বৃদ্ধের আত্মহনন ও বেঁচে থাকার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। কিংবা 'বাইসাইকেল থীভস'-এর বাবার করুণ বিপর্যস্ত হাতে বাচ্চা ছেলেটির হাত মেলানো—এই সব অসংখ্য আশাবাদী দৃশ্যকল্প যুদ্ধোত্তর মানুষকে সত্য ও ন্যায়, জীবননিগূঢ় ভালোবাসার প্রতি এগিয়ে দিয়েছে। নিও রিয়ালিস্ট ছবিগুলির এই ইতিবাচক দিকটা আধুনিক সিনেমায় বিশেষ মর্যাদায় চিহ্নিত। জীবনের গভীর সত্য প্রত্যক্ষ করে নিও রিয়ালিস্ট পরিচালকরা জীবন যৌবন, তার উচ্ছল প্রকাশ, সূক্ষ্ম হাস্যরস, সমাজের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ আর চরিত্রের কাব্যিক মেজাজকে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে লাটুয়াদার 'The Mill on the River' রেনাটো কাস্টেলানির Sotto il Sole di Roma' 'Springtime' এবং 'Two Penny worth of Hope'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে 'নয়া বাস্তববাদ'-এর পরোক্ষ ফলশ্রুতি সত্যনিষ্ঠ জীবন-বোধের উন্মোচন। যদিও এই আন্দোলনের পথিকৃৎ যাঁরা তাঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ ছিলেন না। ভিসকন্তি স্বয়ং অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। তবু এঁরা প্রত্যেকে কৃত্রিম স্টুডিও রিয়ালিজম্ পরিত্যাগ ক'রে, 'তারকা সিস্টেম' ভেঙে দিয়ে একেবারে জনপদের সাধারণ মানুষদের তাঁদের ছবির পাত্রপাত্রীরূপে নির্বাচন করেছেন বহু ক্ষেত্রে। ছবির কাহিনীও সহজ-সরল আঙ্গিকে তার প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু প্রকাশ করতো, কোনো ফ্ল্যাসব্যাক ব্যবহৃত হ'ত না, এমন কি জাঁকজমকপূর্ণ কোনো দৃশ্যাবলীর অবতারণাও হ'ত না। পরিচালকরা বেশির ভাগ লং শট ব্যবহার করতেন যাতে ক্লোজ-আপে চরিত্রের মুখের সূক্ষ্ম ভাব-প্রকাশ দরকার না হয়। কারণ ছবিতে অধিকাংশই অপেশাদার অভিনেতারা কাজ করতেন এবং ছবিগুলোও তোলা হ'ত অনেকটা ডকুমেন্টারী ভঙ্গিতে। স্থান ও কালের যতদূর সম্ভব প্রামাণিকতা রক্ষা করার প্রচণ্ড বাসনা ছিল তখনকার পরিচালকদের প্রধান শিল্পধর্ম। বস্তুতঃ সিনেমা যে 'director's medium' এ ব্যাপারটা তখন থেকেই প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। হয়ত সূক্ষ্ম রসবিচারে দেখা যাবে তখনকার অনেক ছবিরই সুষ্ঠু সমাপ্তি নেই। কেননা তখনকার পরিচালকরা জোর ক'রে কোনো কায়দা-কানুনে কোনো প্রকরণ বা শিল্পের টেকনিকের চ্যালেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন নি। পরন্তু বহমান জীবনের অস্তিত্বের লড়াইয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রামশীল সাধারণ মানুষের চরিতকথা রচনা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁদের শিল্পে তাঁদের স্বকীয় আত্মানুসন্ধান আছে, স্বীয় ন্যায়-অন্যায় বোধের আয়নায় তাঁদের চারপাশের জগৎ ও জীবনটাকে খুঁটিয়ে যাচাই করেছেন,

অনুভব করেছেন—তাঁদের উপলব্ধ সত্য পরম শিল্পিত স্বভাবে সিনেমার পর্দায় অনবদ্য রূপ পেয়েছে। 'We sought to redeem our guilt', 'We strove to look ourselves in the eyes and tell ourselves the truth, to discover who we really were and to sek salvation." এই পরম আত্মবিশ্লেষণ সেকালের চলচ্চিত্রকারদের সিনেমার শিল্প ইতিহাসে অমর করেছে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে মুসোলিনীর আমলে ইতালীতে বহু স্টুডিও বর্তমান ছিল এবং অর্থে বিলাসে, আলোয়-রঙে, নামী দামী অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফ্যাশানের ভীড়ে ইতালীর সিনেমাজগৎ জমজমাট ছিল। কিন্তু সেখানে জীবনের প্রকৃত রূপটা ছিল নির্বাসিত। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ধ্বংসের মারণোৎসব সমস্ত চুরমার ক'রে দিলে স্বাভাবিকভাবেই শিল্পীরা আত্মসচেতন হলেন। তাঁদের পথে নামতেই হ'ল। যুদ্ধ তাঁদের প্রেরণা দান করেছিল নিঃসন্দেহে কিন্তু তাঁদের অন্তরের শিল্প তাগিদটাও কত ব্যাপক ছিল তার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে এই পর্বের বহু ছবিতে।

অঙ্কের হিসেব কষলে দেখা যাবে যে ইতালীর এই নিও রিয়ালিস্ট আন্দোলনটি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বছর ছয় সাত টিঁকে ছিল। অর্থাৎ সমালোচকদের মত অনুযায়ী ১৯৪৫-এর রোসেলিনির 'Rome, Open City' থেকে শুরু ক'রে ১৯৫১র ডি সিকার 'Umberto D' পর্যন্ত সময়কাল। কিন্তু এই সীমিত সময়কালের যে কটি ছবি ইতালীর পরিচালকরা বিশ্ব দর্শকদের দান করেছেন তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিল্প প্রভাব অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক। 'নয়া বাস্তববাদী' ইতালী সিনেমা যখন পূর্ণ উদ্যমে চলেছে তখন কেউ কেউ মূল আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। যেমন ডি স্যান্টিসের Bitter Rice ছবিতে নায়িকা সিলভানা ম্যাঙ্গানোকে যেমনভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তা নিও রিয়ালিষ্ট আন্দোলনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে নষ্ট করেছে। ছবিতে তার কমার্শিয়াল ভঙ্গির যৌন ইঙ্গিত-মূলক নাচের দৃশ্যগুলি বেমানান হয়ে গেছে। ছবির প্রতিপাদ্যের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। কিন্তু তবু পরিচালকের বক্তব্যের অপরিহার্যতাকে কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। খুব নির্মম ভঙ্গিতে ইতালীতে আসা ভিনদেশী ধানক্ষেতের কর্মীদের জীবনালেখ্য রচনা করতে গিয়ে পরিচালক কোথাও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। তিনি যেটুকু আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তেমন বিচ্যুতি আমরা আরো পরবর্তীকালে পেয়েছি ডি. সিকার Two Women ছবিতে। এ ছবিতে ডি সিকা এক ধরনের

রোমাণ্টিকতায় আক্রান্ত ছিলেন। ভিসকন্তি ১৯৬০-এ তোলেন Rocco and his Brothers'। এ ছবিতেও ভিসকন্তি সেই শুরুর পর্বের নিও রিয়ালিষ্ট ফোর্মকে ধরে রাখতে পারেন নি। যদিও ছবিটি বিষয়বস্তু ও নির্মাণের কৌশলে বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। কিন্তু অতিরিক্ত প্যাশন, ব্যভিচারের বাস্তবসম্মত প্রকাশ ভংগি, রোকো চরিত্রের যুক্তিনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠায় পরিচালক ছবিটিকে সব মিলিয়ে ঐ পর্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের সমস্তরে নিয়ে যেতে পারেন নি। নিও রিয়ালিষ্ট আন্দোলনের প্রভাব যেমন একদিকে উৎকৃষ্ট বাস্তব সম্মত ছবি তৈরীর আহ্বান জানিয়েছে তেমনি কিছু পরিচালককে উল্টো পথেও নিয়ে গেছে। অনেকটা ভিসকন্তির 'রোকো এ্যাণ্ড হিজ ব্রাদার্স' ছবিটির ঢঙে তুরস্কের ছবি Conquerers of the Golden Cityতে বাস্তবসম্মত হতে গিয়ে এ'ছবির পরিচালক বেশী ক'রে মানুষের যৌনবিকারকেই দেখিয়েছেন। জীবনের অন্যান্য সমস্যার তুলনায় আধুনিক Sex exploitationকেই পরিচালক প্রধান্য দিতে গিয়ে ছবির শিল্পত্ব ব্যাহত করেছেন। অনেক পরবর্তীকালে, ১৯৫৭ সালে নির্মিত **আন্তনিওনির 'ইল গ্রিদো'** ছবিতেও নিও রিয়ালিজমের স্পর্শ আছে। ছবির ঘটনাসংস্থান, পাত্র-পাত্রীর শ্রেণীগত অবস্থান, সর্বোপরি একেবারে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের চারিত্রিক মূল্যায়ণে সহজ-সরল প্রকৃতি ও অনুভূতির সত্য প্রকাশিত হয়েছে যা একেবারে নিও রিয়ালিজমের শিল্পধর্ম। সুতরাং একেবারে নির্দিষ্ট ক'রে তাত্বিক বিচারে এই নিও রিয়ালিষ্ট আন্দোলনের কোনো সময় সীমা বেঁধে দেওয়া আমাদের মনে হয় সঙ্গত নয়। কেননা এটি মূলতঃ একটা আদর্শের উন্মোচন, একটা জাগ্রত চেতনার প্রকাশ রূপে সক্রিয় হয়েছিল। একালেও যাঁরা উক্ত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্তত জীবনের সত্যিকার চেহারাটার কথা ছবির পর্দায় তুলে ধরতে প্রয়াস পাবেন আমরা তাঁদের স্বাগত জানাবো। নিও রিয়ালিষ্ট আন্দোলনে একা কেবল পরিচালকই নন, তাঁদের সঙ্গে সমান পারদর্শিতায় খাঁটি চিত্রনাট্যকারেরাও হাত মিলিয়েছিলেন। জাভাত্তিনীর মতো একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রনাট্যকার বা সেচ্চি ডি এ্যামিকো, পিয়েরো তেল্লিনি, সার্গি ও এ্যামিডি প্রমুখ শিল্পমনস্ক চিত্রনাট্যকারেরা বহুভাবে এই শিল্প আন্দোলনের পিছনে সক্রিয় ছিলেন। জাভাত্তিনী একবার বলেছিলেন খ্রীষ্টের হাতে যদি ক্যামেরা থাকতো তাহলে "He would not shoot fables, however wonderful, but show us the good ones and the bad ones of this world-in actuality, giving, us close ups of those who make

their neighbour's bread too bittere, and of their victims."
একালে যাঁরা বাস্তববাদী সমস্যামূলক ছবি করার জন্য সংকল্প করেছেন বা ইতিমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছেন সেইসব উদ্যোগী শিল্পীরা এই সংলাপগুলিকে আদর্শ বলে মেনে নিলে আশা করি চলচ্চিত্র শিল্পের শিল্প সম্ভাবনা আরো ব্যাপক হবে।

ফ্রী সিনেমা

শিল্প যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল, তার সংজ্ঞা এবং রীতিও প্রতিদিন বদলাচ্ছে। এই দশকের স্টাইল পরবর্তী দশকে নোতুন হ'য়ে উঠছে। আজকের যুগে যে প্রকরণ দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিচ্ছে, ঠিক পরের যুগেই সেটা হয়তো একেবারে বাতিল হ'য়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো একই বিষয়বস্তু নানা যুগে শিল্পীর হাত বদলে অভিনব রূপ গ্রহণ করছে, সমালোচক-শিল্পরসিক-বিদগ্ধজনেরা তার নোতুন সংজ্ঞা নির্ণয় ক'রে দিচ্ছেন। পৃথিবীর সব শিল্পেই এই পালাবদলের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়।

সিনেমার প্রতিপাদ্য যেহেতু জীবনের কথা বলা, তাই প্রাথমিক শর্তেই এ শিল্পে বাস্তবতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সব সময়েই বর্তমান। এখন প্রশ্ন শিল্পী এখানে কীভাবে, কতোটা গভীরতায় জীবনকে দেখবেন ও দেখাবেন। আর তারই ওপর নির্ভর করছে একটা ছবির বাস্তবসম্মত শিল্পগুণ। চল্লিশ দশকের প্রথম দিক থেকে পঞ্চাশ দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত সারা বিশ্বে যেসব উল্লেখযোগ্য সমাজ-বাস্তবতার ছবি তৈরী হয়েছে তাতে ইতালীয় 'নয়াবাস্তবতা'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এবং অনুপ্রেরণা সক্রিয় ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে একদল ব্রিটিশ চলচ্চিত্রকারেরা reality এই ব্যাপারটিকে আর একভাবে প্রকাশ করতে প্রয়াস পেলেন। এঁরা অনেকটা তথ্যচিত্রের ঢঙে কাহিনীচিত্রের নির্মাণে সচেষ্ট হলেন। এঁদের ছবিতে নিটোল গল্পের পরিবর্তে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ধরা দিল তার সমস্ত রকমের খুটিনাটি সমেত। অর্থাৎ এঁদের ছবিতে আর nearness to life' নয়, মানবজীবন একেবারে উন্মুক্ত হ'ল ছবির পর্দায়, দর্শকরা আর এক ধরনের বাস্তবতার আস্বাদ পেলেন। এই দল তাঁদের শিল্পকর্মের নামকরণ করলেন 'ফ্রী সিনেমা'। স্মরণ রাখতে হবে যে এই ফ্রী সিনেমার প্রবক্তারা অন্যপক্ষে প্রকৃত জীবনের অবিকল বিদ্যমান উপকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের বস্তু পুঞ্জের অবিকল অনড় প্রতিচ্ছবিটাই বড় কথা নয়, তাকে কেন্দ্র ক'রে নিজেদের প্রয়োজন মতো জীবনের 'সত্য' খুঁজে বার করতে হবে। এই আন্দোলনের প্রবক্তা দুজন লিণ্ডসে এ্যাণ্ডারসন এবং কারেল

রাইজ ১৯৫৬ সালে এই 'ফ্রী সিনেমা' আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তাঁদের দলে যোগ দেন জ্যাক ক্লেটন, টনি রিচার্ডসন প্রমুখেরা। এই ফ্রী সিনেমার মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিদিনকার চলমান মানবজীবনের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করা। তাই এই আন্দোলনের চলচ্চিত্রকারেরা শহরের জ্যাজ ক্লাব, ইউথ ক্লাব, মেলা, বাজার সর্বত্র তন্ন তন্ন ক'রে জীবনের বাস্তবতার সন্ধান করলেন। তাঁদের ছবিতে কর্মরত মানুষ, পরিশ্রান্ত মানুষের শ্রান্তিবিনোদনের মুহূর্ত কিছুই বাদ পড়লো না। 'ফ্রী সিনেমা'র প্রথম প্রদর্শন ছিল লিণ্ডসে এ্যাণ্ডারসনের 'O Dreamland', কারেল রাইজ এবং টনি রিচার্ডসনের 'Momma Don't Allow' এবং লোরেনজা ম্যাজেত্তির 'Together' এইসব ছবিগুলো। এবং এগুলো প্রথম প্রদর্শনীতেই উল্লেখযোগ্যভাবে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। লিণ্ডসে তাঁর 'Every Day Except Christmas' ছবিতে কাব্যিক মেজাজে কোভেন্ট গার্ডেনের দিনমজুরদের দিনলিপি গ্রথিত করেছিলেন। তাঁর প্রবল বাসনা ছিল ঐ অঞ্চলের শ্রমিকরা তাঁর এই ছবিটি দেখুক যেখানে তাঁরা জীবনের প্রতিটা দিন অতিবাহিত করে সকাল থেকে সন্ধ্যা। পরিচালকের কথায়: I want to make people—ordinary people, not just Top People-feel their dignity and their importance.'

ফ্রী সিনেমার পরিচালকরা তাঁদের শিল্পের মধ্য দিয়ে একটা প্রতিবাদ খাড়া করেছিলেন। তাঁরা তথাকথিত বিশিষ্ট শ্রেণী সীমাবদ্ধ ব্রিটিশ সিনেমার সমান্তরালে তাঁদের শিল্পকে তুলে ধরেছিলেন। এমনিতে সেই সময়কার ব্রিটিশ সিনেমা যা সমকালীন প্রবহমান জীবনবিমুখ ছিল, সেক্ষেত্রে ফ্রী সিনেমার শিল্পীরা সমাজবাদী রূপকার হিসেবে বিবিধ সমস্যা চিত্রণের দায়িত্ব ও সমালোচনার সূত্রপাত করলেন। এই চ্যালেঞ্জ তাঁদের শিল্পিত স্বভাবকে আরো ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ ক'রে তুললো। ফ্রী সিনেমা গোষ্ঠী যেসব তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন তাতে তাঁরা এই মর্মে দাবি জানালেন যে তাঁদের ছবিগুলি 'Concerned with basic human relationships and the problems of establishing communication on a human level.'

উৎকৃষ্ট তথ্যচিত্রের যেটা প্রধান গুণ অর্থাৎ জনপদবাসী তাদের বাসস্থান, কর্মস্থান, ক্ষেত-খামার, কারখানা, হাট-বাজার সমস্ত অবস্থানের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের পর্দায় জীবন্ত হয়ে ধরা দেবে। এ যেন তাদেরই মুখের ভাষ্য আর এক অপরূপ শিল্প মাধ্যমে নোতুন জীবন লাভ করছে। জীবন তখন শুধু বস্তু পুঞ্জের মধ্যেই আবদ্ধ

নয়, অতিরিক্তি কিছু। ফ্রী সিনেমাগোষ্ঠীর চলচ্চিত্র নির্মাতারা তথ্যচিত্রের এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের শিল্পান্দোলন জোরদার করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ফ্রী সিনেমা গোষ্ঠী চলচ্চিত্র নির্মাণের যে নীতিবাদের দিকটিকে তাঁদের শিল্পরীতির অন্যতম অংশরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, একালের সিনেমা শিল্পে সেটি অতি সীমিত আকারে লক্ষিত হলেও ঐ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যমূলক সিনেমাশৈলী কোনো কোনো ভাবে তাবৎ উৎকৃষ্ট তথ্য ও প্রামাণিক চিত্র নির্মাণ পদ্ধতিতে সংক্রমিত হয়ে গেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে শিল্পের ক্ষেত্রে সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অথর থিওরী

চল্লিশ দশকের শেষে ফ্রান্সে আলেকজাণ্ডার আস্ক্রক চলচ্চিত্র শিল্পের স্বনির্ভরতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর 'কামেরা স্টিলো' তত্ত্বকে ঘিরে পরিচালকেরা চলচ্চিত্রের নন্দন নিয়ে সেদিন গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। এই সময় থেকেই চলচ্চিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফ্রান্সে তুমুল আলোচনার ঝড় বইতে থাকে। কিছু নোতুন, চিন্তাশীল প্রথাবিরোধী শিল্পী চলচ্চিত্রের স্বরূপ নিয়ে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁরা জোট বাঁধলেন। এই জোটের মুখ্য সদস্য ছিলেন ত্রুফো, গদার শ্যাব্রল, রোমার এবং রিভেৎ। আর এদের ভাবনার তারুন্যে মন্ত্রগুরুর মতো বিভিন্ন সূত্রে উপকরণ এবং চেতনা জোগাতে লাগলেন বয়োঃজ্যেষ্ঠ বিদগ্ধ চলচ্চিত্রবিদ আঁদ্রে বাজাঁ। তাছাড়া 'সিনেমাতেকে'র অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন এঁরা একত্রে বিভিন্ন সময়ে সিনেমার যে গভীর পাঠ গ্রহণ ক'রে যাচ্ছিলেন তা সব মিলিয়ে এই তরুণ গোষ্ঠীকে পৃথিবীর সিনেমা মানচিত্রে আশ্চর্য ব্যতিক্রমে চিহ্নিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সিনেমার ব্যবহারিক জ্ঞান ও তত্ত্বগত দিকের গভীর অধ্যয়ন থেকে এঁরা ক্রমশঃ অনুভব করছিলেন যে চলচ্চিত্র বহু মানুষের মিলিত ফলশ্রুতি হলেও মূলতঃ এর স্রষ্টা একজন, আর তিনি হলেন পরিচালক। এবং এই সূত্রে একটি ছবির শিল্পগত মানের জন্য পরিচালকের দায়িত্ব অপরিসীম, একথা প্রমাণে এঁরা বিশেষ তৎপর হলেন। ফ্রান্সের এই চলচ্চিত্র সমালোচকেরা সিনেমার একচ্ছত্র স্রষ্টারূপে পরিচালকের শিল্পবোধ ও শিল্পীসত্তাকে নোতুন দৃষ্টিতে যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে ঔপন্যাসিক, কবি, গল্পকার, নাট্যকারের মতোই চলচ্চিত্র পরিচালকেরও নিজস্ব বলার কিছু ব্যাপার আছে। পরিচালক সিনেমার পর্দায় সেই বক্তব্যকে রূপ দেবেন। এখানে ক্যামেরাম্যান, শিল্পনির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেবলমাত্র তাঁর অনুগত সহযোগী। একটা ছবির চূড়ান্ত পরিণতি তাই সম্পূর্ণভাবে পরিচালকের ভাবনা চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, বিশেষতঃ সিনেমামাধ্যমের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিকে আশ্রয় করেই মূর্ত হয়। ছবির ভালো মন্দও তাই পরিচালকের মনীষা ভেদে বিভিন্ন স্তরের হয়। আঁদ্রে বাজাঁই প্রথম সমালোচক যিনি চলচ্চিত্রে পরিচালকের

প্রাতিস্বিক প্রতিফলনের কথা চিন্তা করেছিলেন। এবং ফরাসী নবতরঙ্গের প্রায় সকলেই বাজাঁ কথিত এবং বিশ্লেষিত সিনেমা নন্দনের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে পঞ্চাশ দশকের প্রথমার্ধ থেকেই ফ্রান্সে সিনেমায় পরিচালকের প্রকৃত ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনাকে কেন্দ্র ক'রে একটা তত্ত্ব গড়ে উঠছিল। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেটা 'La Politique des Auteurs' বা 'অথর থিওরী' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। যদিও ক্রফোকেই এই তত্ত্বের প্রধান ভাষ্যকার হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া হয়, তবু এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ফরাসী পরিচালক বিভিন্ন দিক থেকে এর ব্যাখ্যা করেছেন, তাছাড়া এই তত্ত্বকে কাইয়ে গোষ্ঠীর সমষ্টিগত ফসল বলে ভাবলে ভুল হবে। তত্ত্বগত দিক থেকে সকলের মূল শিল্প লক্ষ্য এক হলেও 'অথর থিওরীর' ব্যবহারিক ও পঠন-পাঠনগত বিবৃতি বিভিন্নমুখী ছিল। বাজাঁ, ১৯৫৭ সালে 'কাইয়ে' পত্রিকার সত্তরতম সংখ্যায় ক্রফোর অথর থিওরীকে পুনর্বার এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন "It consists, in short, of choosing the personal factor in artistic creation as a standard of reference and then of assuming that it continues and even progresses from one film to the next." আসলে প্রত্যেক ছবিতে পরিচালকে ঐ 'পারসোনাল ফ্যাক্টর' আবিষ্কার করার সূত্রে কাইয়ে গোষ্ঠীর শিল্পীরা চলচ্চিত্রে পরিচালকের নিজস্বতার সন্ধান করলেন। তাঁরা বললেন প্রত্যেক পরিচালকই নিজস্বতায় স্বতন্ত্র। একটা ছবি দেখলেই যেন চেনা যায় তাঁর স্রষ্টা কে? যিনি তাঁর ছবিতে স্বকীয় শিল্পব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতে পারবেন না তিনি প্রকৃত অর্থে সিনেমার পরিচালক নন। এবং এইভাবে গড়ে উঠল সিনেমার এক একটা গোত্র। কেননা পরিচালকের মানসিকতা অনুসারে ততদিনে সিনেমার বিভিন্নমুখী চরিত্র ফুটে উঠতে শুরু করেছে। তাই কাইয়ের শিল্পীরা 'ওয়েস্টার্ণ'; 'গ্যাংস্টার,' 'ফিল্ম-নোয়া' ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র ধারার ছবির মূল চরিত্র বিশ্লেষণ শুরু করলেন। তাঁদের মননশীল নান্দনিক ব্যাখ্যায় চলচ্চিত্রের শিল্পসংজ্ঞা বিশ্বের দর্শক সমাজে অভিনব লক্ষণে প্রকাশিত হ'ল। শিল্প সমালোচকেরা সিনেমার আগামী সম্ভাবনা নিয়ে নোতুন ক'রে চিন্তার জগতে ডুব দিলেন। এই অথর-তত্ত্বকে আশ্রয় করে দুটি অনুসিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে একের সঙ্গে অপরের স্টাইলের পার্থক্য নির্ণয়ে সাহায্য করলো। প্রথমটি হ'ল পরিচালক এবং দর্শকের মাঝে

সম্পর্ক বিষয়ে। চলচ্চিত্র এখন আর কোনো বিচ্ছিন্ন সিনেমা মাধ্যম নয়। ক্যামেরার অন্তরালে এবং পর্দার সামনে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্কটা অনেকটা আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত হ'ল। এক্ষেত্রে অথর থিওরীর নৈতিক দিকটা বিশেষভাবে বাজাঁর ব্যাখ্যাত বাস্তবতার কাছে ঋণী। দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটি মূলতঃ চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভংগিকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হ'ল। এখানে চলচ্চিত্র একাধিক বিপক্ষতার সারাংশ হিসেবেই প্রতি-ফলিত। সিনেমার অথর এর শিল্পরীতি, তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ, পরিচালক ও দর্শক, সমালোচক ও ছবি এবং সর্বোপরি গদার কথিত সিনেমার পদ্ধতি এবং মত, এই নানা বিপরীত চিন্তা চেতনার সংঘাতমূলক এক ফলশ্রুতিরূপে সিনেমা সংজ্ঞা নির্ণীত হ'ল। আসলে আঁদ্রে বাজাঁর নেতৃত্বে কাইয়ের গোষ্ঠীর শিল্পীরা সিনেমার নন্দনতত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণে শিল্পের দ্বান্দ্বিক ইতিহাস ও শিল্পীর স্বতন্ত্র ব্যক্তি চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। এবং এই প্রসঙ্গে কাইয়ে গোষ্ঠীর পঞ্চ মহারথী অর্থাৎ ত্রুফো, গদার, শ্যাব্রল, রোমার এবং রিভেৎ ক্রমশঃ অথর তত্ত্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় সিনেমার শিল্প শরীর নিয়ে গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন যা ধীরে ধীরে একটা পরিণত শিল্পসূত্রে দানা বেঁধে উঠছিল। একে চলচ্চিত্রবিদ্‌রা সিনেমার 'নৃতাত্ত্বিক সংগঠন' বলে উল্লেখ করেছেন। অথরতত্ত্বের প্রবক্তা ও ধারক বাহকদের মতে সবাক যুগের প্রথমদিকের কিছু ইওরোপীয় ছবি এবং নির্বাক যুগের কিছু ক্লাসিক জার্মাণ, ফরাসী এবং মার্কিন ছবির পরিচালকদের কেউ কেউ চলচ্চিত্রের প্রকৃত 'অথর' রূপে অভিহিত হ'তে পারেন। তবে তাঁরা অধিকাংশ মার্কিন ছবির চটুলতায় বিশেষভাবে পীড়িত ছিলেন। তাঁদের মতে বেশীরভাগ মার্কিন ছবিই প্রযোজকের নামে বিশ্বে প্রচারিত হয়ে এসেছে অর্থাৎ সেখানে ওয়ার্নার ব্রাদার্স, প্যারামাউন্ট, এম, জি. এম ইত্যাদি ষ্টুডিও ফ্যাক্টরী প্রযোজিত ছবিই দর্শকের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। পরিচালকের সেখানে কোনো স্বতন্ত্র শিল্প ভূমিকা গণ্য হ'ত না। কেবল ব্যতিক্রম হিসেবে ফোর্ড, ক্যাপরা, হাওয়ার্ড হক্‌স্‌, ল্যাং, হিচকক, নিকোলাস রে প্রমুখেরা কাইয়ের শিল্পীদের ধারণায় চলচ্চিত্রের প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলে নেওয়া ভালো যে চ্যাপলিন এবং কীটন সম্পর্কে অথর থিওরীর প্রচারকদের স্বতন্ত্র শ্রদ্ধা ছিল যা অন্যভাবে অন্যসূত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে।

থিয়েটারের ক্ষেত্রে পরিচালকের ভূমিকা হয় অনেকটা অর্কেষ্ট্রার দলনেতা হিসেবে, অর্থাৎ তিনি নাট্যকারের মূল রচনাটিকে কেবল মঞ্চে বিশদ ক'রে

ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সিনেমার পরিচালক স্বয়ং লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি ছবির চিত্রনাট্য একজন লেখেন এবং তাকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন অন্য একজন ব্যক্তি। কিন্তু সেখানেও পরিচালকের নিজস্বতার ছাপ থাকে। একই কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে যদি তিনজন পরিচালক ছবি করেন তবে আমরা তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের তিনটি ছবি দেখতে পাবো। সেক্ষেত্রে একই নাটক তিনজন পরিচালকের হাতে মঞ্চে সেই পরিমাণ তিনটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপ নেয় না। কারণ নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে তিনজন পরিচালকের দৃষ্টিভংগির পার্থক্য থাকলেও তাঁরা নাটকটির ব্যাখ্যাধর্মী দিকটির সঙ্গেই জড়িত হয়ে পড়বেন। কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে পরিচালককে পুরো ব্যাপারটাকে শব্দ-সংগীত আলোকচিত্রে ভাবতে হবে। এখানে চলচ্চিত্রের দৃশ্যগত বিপুল স্বাধীনতাই এর পরিচালককে স্রষ্টার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। নাটকের পরিচালক যেখানে নাট্যকারের interpretive লক্ষণ নিয়ে ভাবিত, চলচ্চিত্রের পরিচালককে সেখানে মাধ্যমগত ভিন্নতা ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধার জন্য একটা ছবির সমগ্র Conceptual লক্ষণ নিয়ে ভাবতে হয়। সিনেমার এই বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রকরণের দিকটা অথর প্রবক্তাদের বিভিন্ন ভাবে নাড়া দিয়েছিল। একটি চিত্র নির্মাণের কর্মকাণ্ডে একত্রে অনেকে কাজ করেন। একজনের মূল কাহিনী, চিত্রনাট্যকার হয়তো আর একজন, একজন ক্যামেরাম্যান, একজন সম্পাদক, একজন শিল্পনির্দেশক, সংগীত পরিচালক একজন, একাধিক পাত্র পাত্রী এবং পরিচালক। এখানে এই দলটিকে পুরো চালিত করেন পরিচালক। কার কতটুকু কাজ, কে কিভাবে ছবিটি নির্মাণে সাহায্য করবেন পরিচালকই তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নির্দেশ দেন। তাই অথর তত্ত্বের সমালোচকদের মতে যিনি প্রকৃত অর্থে চলচ্চিত্র 'অথর' হবেন, সিনেমার মাধ্যমের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক এবং যান্ত্রিক প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। এর ব্যতিক্রমে সমস্ত সংগঠনটাই মাটি হয়ে যাবে। কিছু বিশিষ্ট নির্বাক ইওরোপীয় ছবি ও কিছু সবাক ছবি ছাড়া যখন চলচ্চিত্র শিল্প মাধ্যম রূপে আজকের মতো স্বীকৃতি পায় নি, তখন ওরসন ওয়েলসই প্রথম ব্যক্তি যিনি চলচ্চিত্রের তথাকথিত রীতি নীতি ভেঙ্গে চুরে ছবিতে এক অভিনব টেকনিক প্রয়োগ করলেন। তাঁর 'সিটিজেন কেন' ছবিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। ওয়েলস্ যথার্থই একজন চলচ্চিত্র অথর ছিলেন। অথর থিওরীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাইয়ের সমালোচকদের কাছে সিনেমার সামগ্রিক শিল্পচারিত্র্য

বিশ্লেষণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। তাই তাঁরা চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য শিল্প শাখার নন্দন ও ব্যাকরণ নিয়ে বিশেষ আলোচনার অবতারণা করেছিলেন যার অসংখ্য মূল্যবান নিদর্শন 'কাইয়ে দু সিনেমা'র বহু পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক মর্যাদায় বিরাজ করছে। যদি কোনো একটি মৌলিক কারণও এই শিল্পীগোষ্ঠীর জোটবদ্ধতায় সাহায্য ক'রে থাকে তাহ'ল চলচ্চিত্র শিল্প ইতিহাস নির্মাণে এঁদের অনলস সাধনা। আর এই কারণেই নবতরঙ্গের বিভিন্ন সমালোচক ও পরিচালকদের কাছে সিনেমার তত্ত্বগত দিকটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই অন্ততঃ একটা পথ খুঁজছিলেন সেখানে চলচ্চিত্র ও অন্যান্য শিল্পশাখার সঙ্গে মানুষের জীবন কিভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে, কিভাবেই বা তাঁরা চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করবেন, কিভাবে সিনেমা তাঁদের চেতনার পরিবর্তন ঘটায়, কি পন্থায় সিনেমা তাঁদের প্রাত্যহিক অস্তিত্বকে পর্দার বুকে তুলে ধরে, কিভাবেই বা চলচ্চিত্রের ভাষা শিল্পশরীর পায়—এই নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক মনন তাঁদের প্রবন্ধ ও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আর তাঁদের এইসব অভিনব শিল্প জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁরা নিজেরাই অনেকাংশে তাঁদের ছবির মাধ্যমে দিয়েছেন। অথর সমালোচকদের এইখানেই সাফল্য।

এই অথর থিওরীর জন্মলগ্নের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলিকে মনে করলে দেখা যাবে যে ফ্রান্সের চলচ্চিত্রে এই জাতীয় একটা মতবাদের সূত্রপাত সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিক্ষিপ্তির ফলস্বরূপ তখন স্বাভাবিক কারণেই সম্ভাবিত হয়ে পড়েছিল। ১৯৪৪-এ ফ্রান্স যখন স্বাধীন হয়, ফরাসী জনগণ আশা করেছিল যে একটা নোতুন ফ্রান্স এবার জন্ম নেবে যেখানে ন্যায়বিচার, সাম্য এবং সর্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক শাসন চালু হবে। কিন্তু চল্লিশ দশক শেষ হ'তে না হতে ফরাসী প্রতিরোধী নায়কদের বিরুদ্ধে সবরকম অত্যাচার শুরু হ'ল, প্রয়োজনমতো তাদের নিধন করাও চলল। ১৯৪৫-৫০ এর মধ্যে ফরাসী রাজনীতিতে দারুণ পরিবর্তন শুরু হ'ল। ধীরে ধীরে সরকার গোষ্ঠী থেকে শ্রমিক শ্রেণীর সব প্রতিনিধিদের সরিয়ে ফেলা হ'ল। বিভিন্ন ক্লেশ, ঠাণ্ডা লড়াই, বহিরাগত চাপ এবং অ্যাটম বোমার ভয় এবং নোতুন ফ্রান্সের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার দারুণ বিষাদ, সব মিলিয়ে সেই সময় নৈরাশ্য, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি ব্যাপার যে ফরাসী শিল্প বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংক্রামিত হবে, সেটা খুব স্বাভাবিক ছিল। তাই সেই সময়কার মননশীল ব্যক্তি ও শিল্পীরা মানুষের অন্তর্মুখীন চেতনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁদের কাছে মানুষের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের বদলে তার

মানসিক চিন্তা চৈতন্যের গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও লোকোত্তর অনুসন্ধানই মূল্যবান মনে হয়েছিল। আর এই গোটা সময় পর্ব জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট স্বাধীন ফরাসী সরকার গড়ে ওঠার বাধা এবং ইন্দোচীন ও আলজেরিয়ার ঔপনিবেশিক যুদ্ধ মুখ্যতঃ ফ্রান্সকে এক দারুণ টালমাটালের মধ্যে রেখেছিল। তাই পঞ্চাশের শুরুতেই বহু ফরাসী বুদ্ধিজীবী এই বিশ্রী অবস্থায় এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন যে শিল্পকে সমাজগত ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আর এই প্রত্যাখ্যানের ফলস্বরূপ দার্শনিক জঁ পল সার্ত্রকেও তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়। এর থেকে art for art's sake ধারণা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অর্থাৎ ফরাসী শিল্পী সমাজ খুব জোরের সঙ্গে শিল্পের সেই পুরোনো বুর্জোয়া ধ্যান ধারণায় প্রত্যাবর্তন করেন। এবং ব্যক্তি বিশেষই সবকিছু ছাড়িয়ে, এটাই শিল্পের প্রধান সুর হয়ে ওঠে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই অথর তত্ত্বের জন্মের বীজ নিহিত ছিল। ত্রুফো তাঁর প্রবন্ধে প্রথম এই তত্ত্বের উল্লেখ ক'রে ব্যক্তি মানুষের আত্মানানুসন্ধানের কথা বললেন। তিনি বিলি ওয়াইল্ডারের Stalag 17' এর প্রশংসা করলেন এবং বললেন সমস্যার উত্তরণের পথ নিহিত আছে কেবলমাত্র আমাদের মধ্যেই। মানুষই নিজের চেষ্টায় এবং জাগ্রত চেতনায় নিজের আত্মিক সংকটের মোচন করতে পারে, সমাজ নয়। এই অথরতত্ত্ব মূলতঃ ফরাসী চলচ্চিত্র সমালোচনার ধারাবাহিক অগ্রগতির বিশেষ অংশ হিসেবেই চিহ্নিত, যার শুরু রোজার লীনহার্ট, বাজাঁ, আলেকজান্দার আস্ত্রুক এবং জঁ জর্জ আরিওর মাধ্যমে। ১৯৫১-৫৮ পর্যন্ত কাইয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই তত্ত্ব নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক চলে। ঐতিহাসিক ভাবে প্রধানতঃ দুটি দিক থেকে চলচ্চিত্রবিদেরা এই তত্ত্বের বিচার করে থাকেন। প্রথমটি হ'ল এর নান্দনিক দিক যেখানে শিল্পের দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশ হ'ল তথাকথিত মার্কিন ছবি সম্পর্কে অথর সমালোচকদের নোতুন মূল্যায়ন। বস্তুতঃ ফরাসী অথর তাত্ত্বিকেরাই সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সৃজনশীল মার্কিন পরিচালকদের ছবি নিয়ে একেবারে সিনেম্যাটিক আলোচনা শুরু করলেন এবং তাদের শিল্প-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই নিকোলাস রে, হিচকক, ফোর্ড, ল্যাং, হাওয়ার্ড হক্‌স, কিং ভিদর বিশেষ ভাবে এবং অন্যত্র কাজান, ওয়াইল্ডার প্রেমিংগার, জিনেম্যান প্রমুখেরা নোতুন মর্যাদা পেলেন। তত্ত্বগত ভাবে এর প্রবক্তারা সমাজের অংশীদার হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের চেয়ে মানুষের সূক্ষ্ম মানসিক দিকটাকেই বেশী মূল্য

দিয়েছিলেন। তাঁরা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সম্পর্ক চেতনা এবং মানসিক উত্তরণের প্রতি বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। অথর তাত্ত্বিকেরা প্রাথমিক ভাবে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একেবারে তাদের নিজস্ব মত ও ধারণাকে ছবিতে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের মতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পরিচালক তাদের শিল্পকর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ ক'রে সিনেমা তৈরীর নানাবিধ কলাকৌশল সম্পর্কে ক্রমশঃ অভিজ্ঞ হওয়ায় সচেষ্ট হলেন। তাঁরা প্রয়োজনমত বিষয়বস্তু অনুযায়ী বহুবিধ রীতি এবং প্রয়োগ-প্রকরণ অবলম্বনে বিশ্বাসী ছিলেন। এক্ষেত্রে অথর তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। কিছু পরিচালকের কথা তাঁরা বললেন যাঁরা একাধিক স্টাইলের অনুবর্তন করে থাকেন। যেমন মার্কিন ফ্রেড জিনেম্যান, ফ্রান্সের রেনে ক্লেমঁ, ইতালীর আলবার্তো লাতুয়াদা। জন ফোর্ডে'রও দুটি বিশিষ্ট স্টাইলের কথা শোনা গেল—একটি তাঁর Open air রীতি যেমন 'স্টেজকোচ' ছবিতে আছে, অন্যটি 'expressionistic' যেমনটি আছে 'দ্য ইনফরমার' ছবিতে। তাছাড়া অথর ভাষ্যকারেরা ছবি তৈরী ক'রে প্রমাণ করলেন যে বিষয়বস্তু সামান্য হলেও শিল্পীর প্রকাশের গুণে সেই বিষয়ই মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

অর্থাৎ এখানে তাঁরা সিনেমার 'টেকনিক্যাল পারফেক্‌শানের' ওপর গুরুত্ব দিলেন। তাঁদের মতে দক্ষ পরিচালকের হাতে যে কোনো বিষয়ই অভিনব হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ ছবিতে পরিচালকের সিনেমা মাধ্যম সম্পর্কে গভীর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানই হ'ল মুখ্য। অবশ্য এই বিশ্লেষণ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে বাজাঁর মত পার্থক্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ সমাজগত ভাবে অথর তাত্ত্বিকেরা তিরিশ ও চল্লিশ দশকের সেই সব প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা হারালেন যাঁরা সমাজের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল এবং মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে ভালো চোখে দেখেন নি। অথর তাত্ত্বিকেরা একালের আধুনিক জীবন যন্ত্রণার শরিক ছিলেন বলেই একক ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে তাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পর্দার বুকে তুলে ধরলেন। তাঁদের কাছে সমাজের চেয়ে ব্যক্তির প্রাতিস্বিকতাই বেশী মূল্যবান। এদিক থেকে অথর থিওরীর প্রবক্তরা অনেকাংশে আধ্যাত্মিক ছিলেন। তাঁরা বললেন একটি ছবি মূলতঃ পরিচালকের দৃষ্টিভংগির রূপ প্রকাশ করবে এবং এখানে তিনি পার্থিব বিষয়বস্তুর সমাহারে ছবিতে একটি মাত্র কাহিনীই বিবৃত করবেন এবং সেটা হবে কোন একজন নারী বা পুরুষের গল্প যে কিনা নিঃসঙ্গ মানসিক অবস্থায় (Solitude Morale) বন্দী। অর্থাৎ গল্প আরম্ভ হবে একটি চরিত্রের একে-

বারে একাকী বিচ্ছিন্নতায়। আর এই সূত্রে তাঁরা নিকোলাস রে পরিচালিত Johny Guitar, হিচককের Strangers on a Train, রোসেলিনির Europe 51, এই কয়েকটি ছবির সূচনা দৃশ্যের ব্যাখ্যায় চরিত্রের নিঃসঙ্গতার প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অথর তত্ত্বের প্রকরণগত দিকে বাজাঁ প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি ছবিতে ডীপ ফোকাসের ব্যবহারে ওরসন ওয়েলসের বৈপ্লবিক প্রয়োগ নৈপুণ্য ব্যাখ্যা করলেন। ডীপ ফোকাস দ্বারা চলচ্চিত্রে কি ধরনের বাস্তবতার জন্ম হয় একথা বিশ্লেষণ করলেন তিনি। বাজাঁ তথ্যচিত্রসুলভ বাস্তবতার জন্য বিশেষ ভাবে রোসেলিনি, ডিসিকা, ভিসকন্তি, লাতুয়াদার ছবির আলোচনা করলেন। বাজাঁর মতে পরিচালক হলেন বাস্তবের নিক্রিয় লিপিকার। বাজাঁ যে ক্ষেত্রে সকল বস্তুনিচয়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও বিশ্বের ঐশ্বরিক গতি প্রকৃতির প্রকাশস্বরূপের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন, সেখানে অথর সমালোচকেরা ব্যক্তি বিশেষের আত্মিক দহন ও মনন পরিক্রমার গভীরে ডুব দিলেন। বাজাঁ যেখানে ছবিতে ডীপ ফোকাস, প্রলম্বিত দৃশ্য গ্রহণ (long take), ঘটনা ও দৃশ্যক্রমের আপেক্ষিক গুণ ইত্যাদি ব্যাপার উল্লেখ করলেন, মূল অথর তাত্ত্বিকেরা 'Mise en scene' বিষয়টির ওপর জোর দিলেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে ছবির উপকরণ, সমস্ত রকম কার্যকারণ, পাত্রপাত্রীর আচার আচরণ, সেট, আলো, ক্যামেরা ইত্যাকার সব বিষয়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনাই হ'ল একটি ছবির প্রাণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাইয়ে গোষ্ঠীর সমালোচকেরা বাজাঁর মতকে সমর্থন করেছেন যেমন গদার বাজাঁর অনুসরণে এই ধারণা পোষণ করতেন যে একটি ছবি কেবল ঘটনার বিবরণ দেবে সেখানে কোনো কিছু ব্যক্ত করা চলবে না। ত্রুফোর মতে ছবিতে এমন একটি দৃশ্যও রাখা চলবে না যা ছবির dramatic progression-এর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। অথর সমালোচকেরা মানুষের শরীর তার অন্তর্মুখী, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে কৌতূহলী ছিলেন। ছবিতে পাত্রপাত্রীর যে আচার আচরণ দর্শকরা দেখেন তা চরিত্রের অন্তর্মুখী চেতনার প্রকাশ মাত্র। গদার সিনেমার এই দিকটির সম্বন্ধে বললেন : "An art of representation, all it knows of interior life are the precise and natural movements of well-trained actors।. মূলতঃ অথর-সমালোচনা খুব সামান্য বিষয়কে অনেক গভীর এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রশ্নে বিশ্লেষণ করার একটা রীতি বলা যেতে পারে। এর সমালোচকেরা

ছবির পর্দায় তাঁদের নিজস্ব ধ্যান ধারণার প্রতিফলন কেমন রূপ নেয় সেটাকেই দেখতে চেয়েছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষ যিনি একাকীত্বের যন্ত্রণায় কাতর, সেই যন্ত্রণা থেকে পালাতে পারেন তখনই, যখন নিজের আত্মানুসন্ধানে সচেষ্ট হবেন, তাঁর নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত হবেন, এবং ইচ্ছে করলে তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ বেদনাকে আর পাঁচজনের মধ্যে ক্রমঅন্বিত চিত্র সম্ভারের মাধ্যমে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন। যেখানে যে ছবিতে অথর তাত্ত্বিকেরা এই জাতীয় কাহিনীর প্রতিফলন দেখেছেন তখনই তাঁরা সেই ছবির পরিচালককে author আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

ছবির অভিনয়ের ক্ষেত্রে অথর প্রবক্তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরা ছবিতে নোতুন অভিনয় ধারার সন্ধান করলেন যা তথাকথিত সিনেমা-এ্যাকটিং থেকে ভিন্ন। এক্ষেত্রে তাঁরা রেনোয়া যেভাবে তাঁর অভিনেতাদের কাছ থেকে অভিনয় আদায় করেছিলেন সেই রীতি এবং স্তানিস্লাভস্কি কথিত অভিনয় পদ্ধতির মধ্যে তাঁদের সমর্থন খুঁজে পেলেন, যা এলিয়া কাজান চল্লিশদশকে তাঁর ছবিতে আমদানী করেন। ত্রুফো যখন প্রথম অথর তত্ত্বের সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন তাতে কয়েকটা বিষয় খুব স্পষ্ট ছিল। প্রথমতঃ তাঁর মতে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক স্লোগান দিয়ে শিল্পের মেজাজ ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। তিনি শিল্পের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই সঙ্গে ত্রুফো ছবিতে জীবনের আশাবাদী রূপ প্রতিফলনে আগ্রহী ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের ফরাসী ছবির প্রবণতার তীব্র বিরোধীতা করলেন যার উৎস ছিল এমিল জোলার 'ন্যাচারালিজম'। ফলস্বরূপ তিনি ফরাসী ছবির নানা অপবিত্র ও কদর্য নাস্তিকতার বিরোধী বিকল্পরূপে 'ক্যাথলিসিজমে'র সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করলেন। ফিল্মের 'অথর' বলতে এর ভাষ্যকাররা সেই পরিচালককেই বুঝতেন যিনি বর্তমান পৃথিবীর দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের মধ্যে মানুষের আশাবাদী অস্তিত্বকে তুলে ধরবেন। একটি মানুষই তাঁর আবেগধর্মে এবং আধ্যাত্মিকতায় তাঁর ওপর চাপানো বর্তমান দুনিয়ার বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে লোকোত্তর জগতে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন।

অথর থিওরীর প্রতিষ্ঠা ও তার ব্যাকরণ ও নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রবক্তারা বিশেষ বিশেষ ছবির আলোচনার অবতারণা ক'রে তাঁদের স্বকীয় মতের সমর্থন করলেন। রেনোয়ার The River, The Diary of a Chambermaid, The Golden Coach, রোসেলিনির Europe 51, Stromboli, হিচককের

বেশকিছু ছবি বিশেষতঃ I Confess প্রভৃতি ছবিগুলো সমালোচকদের দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হ'ল।

অথর দৃষ্টিভংগির অনালোচিত একটি বিষয়ের প্রতি কোনো কোনো সমালোচক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে কোনো কোনো ছবির শিল্পসাফল্যে পরিচালকের পাশাপাশি সেইসব ছবির প্রযোজক এবং চিত্র-নাট্যকারদের নামও স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে মার্ক হেলিংগার, ডেভিড সেলজনিক, স্টানলি ক্রামার, জন হাউসম্যান, হল ওয়ালিস প্রমুখ প্রযোজক এবং ফিলিপ-ইয়র্ডান (আমেরিকা) ব্রায়ান ফরবেস (ব্রিটেন) কার্ল মায়ের (জার্মানী), জাকপ্রেভার্ত (ফ্রান্স), জাভাত্তিনী (ইতালী) চিত্রনাট্যকারদের নাম স্মরণীয়। Portrait of Tennie ছবিতে পরিচালকের পাশেই সেলজনিকের কৃতিত্বটাও অনেকটা। রেনোয়া একবার মন্তব্য করেছিলেন anyone that says 'Les Enfants du Paradis' is Carne's film is crazy. It is Jacque Prevert's. অর্থাৎ পরিচালকের সঙ্গেই অনেক শিল্পমনস্ক প্রযোজক এবং চিত্রনাট্যকার সম্মান পেতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ অনেকে মনে করেন যে গ্রেগ টোল্যাণ্ডের মত ক্যামেরাম্যান এবং হেরম্যান ম্যাঙ্কেউইচের মত লেখককে না পেলে ওরসন ওয়েল্‌স্ 'সিটিজেন কেন' ছবির ঐ চূড়ান্ত শিল্পস্তরে পৌঁছাতে পারতেন কিনা ভেবে দেখার বিষয়। অথরতত্ত্বের সূত্রপাতের পর দুই দশকেরও বেশী পার হয়ে যাবার পর আজ বিশ্বের নানা মহলে এই তত্ত্বের ব্যাকরণগত ও প্রায়োগিক তাৎপর্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। কেউ কেউ এর আংশিক ব্যাখ্যা মেনে নিচ্ছেন। কেউ অথর সমালোচকদের কঠিন বিশ্লেষণকে গ্রহণ করতে পারছেন না। কেউ আবার একই ব্যাখ্যার দ্বন্দ্বমূলক দিক নিয়ে ভাবিত। কারুর কাছে এটা যতোটা তত্ত্বগম্ভীর ততোটা সিনেমা নির্মাণের ব্যবহারিক দিকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়, অন্ততঃ চলচ্চিত্র মাধ্যমটা এখনও সেই স্বাবলম্বীতায় পৌঁছায়নি বলে তাঁদের ধারণা। আধুনিক সমালোচক ভি. এফ. পার্কিন্স মন্তব্য করেছেন—A movie cannot be fully and uniquely one man's creation. কিন্তু তিনি একথা স্বীকার করেছেন যে a good film is necessarily a precise realization of one man's precisely imagined 'vision'. তত্ত্বগত ভাবে পরিচালকই লিখিত চিত্রনাট্যকে সেল্যু-লয়েডে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু এর মধ্য পথে যেসব সহকর্মীরা তাঁকে রূপায়ণে সাহায্য করেন তাঁদের ক্ষমতার কথাটাও ভাবার ব্যাপার। অর্থাৎ এখানে

একটি ছবির ফলশ্রুতিতে কার দায়িত্ব কতটুকু সে প্রশ্ন এসে যায়। অতি সম্প্রতি যে ব্যাপারটি আলোচিত হচ্ছে তাহ'ল একটি ছবিতে পরিচালকের ability এবং involvement সংক্রান্ত প্রশ্ন। অনেকের মতে ছবিতে পরিচালকের আধিপত্য ছবির একক স্রষ্টারূপে নয় বরঞ্চ ছবিতে তাঁর পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণই হ'ল আসল। কাইয়েরের এক সংখ্যায় ম্যাক্স ওফুল বলেছিলেন: There are as many creators to a film as there are people who work on it. My job as director consists of making out of this choir of people a creator of films. অথরথিওরীর অন্যতম ভাষ্যকার রিভেৎ 'সাইট এ্যাণ্ড সাউণ্ড' পত্রিকার ১৯৬৩-র শরৎকালীন সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে অথর-তত্ত্বের তথাকথিত 'প্রখ্যাতি'র বিপক্ষে মন্তব্য করেছেন: "Obviously we—the Cahiers team, with Truffaut as chief spokesman—were responsible for this myth, but we were writing at a time when polemics, shock statements like 'anyone can make film' were a necessary reaction against the rigid stratification which was then strangling cinema . Since 1959 and the birth of New Wave, all these attitudes have been taken much too literally" তাঁর এই বিতর্কিত উক্তি আজ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমালোচক পার্কিন্স আবার একেবারে চলচ্চিত্র নির্মাণের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে উক্তি করলেন: But unless we consider acting and photography to be the whole process of film making, the director is still a long way from the total authorship that is often claimed for him." আজ এই মুহূর্তে অথর থিওরীর ঐতিহাসিক বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে কাইয়ে গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত 'অথর' সমালোচনার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক সুসমন্বয়ের সম্ভাব্যতা নিয়ে গভীর আলোচনার অবকাশ আছে।

নুভেল ভাগ্

১৯৫৯-এর কোনো এক শীতকালীন সন্ধ্যা। কান চলচ্চিত্র উৎসব মরসুমের উদ্দীপনায় মুখর শহর। প্রেক্ষাগৃহের বাইরে অসংখ্য গাড়ী আর মানুষের মিলিত কোলাহল। উৎসবে প্রদর্শিত অসংখ্য ছবির মধ্যে তিনটি বিশিষ্ট ছবি পুরস্কৃত হ'ল। মার্সেল কামুর 'Orfeu Negro' উৎসবের গ্রাঁ পি অর্জন করলো, ক্রুফো 'Four Hundred Blows' ছবিটির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেলেন আর, আলা রেনের 'Hisoshima Mon Amour' ছবিটি International Critics' পুরস্কার অর্জন করলো। ফরাসী চলচ্চিত্রের এক নতুন দিগন্ত দর্শকদের প্রবলভাবে নাড়া দিল। এর কয়েকমাসের মধ্যেই 'নুভেল ভাগ' সংজ্ঞাটি সর্বত্র শোনা যেতে লাগলো। কথাটিকে আবিষ্কার করেন ফ্রাঁসোয়া জিরুদ L'Express পত্রিকার পাতা থেকে। সংজ্ঞাটির ইংরেজী নামকরণ হয় New Wave অর্থাৎ 'নব তরঙ্গ'। ঐতিহাসিক ঘটনাহিসেবে উল্লেখ্য যে এই সময় অর্থাৎ ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ১৭০ জন ফরাসী পরিচালক তাঁদের প্রথম কাহিনীচিত্র নির্মাণ করেন। তার মধ্যে কেবল ১৯৫৯ সালেই চব্বিশজন পরিচালক তাঁদের প্রথম কাহিনীচিত্র তৈরী করেন এবং ১৯৬০ সালে আরো তেতাল্লিশজন।

'নুভেল ভাগ্' বলতে সাধারণভাবে পাঁচজন ফরাসী পরিচালক নিয়ে গঠিত একটা ছোট গোষ্ঠির কথা মনে করিয়ে দেয়। যদিও এঁরা তাঁদের মিলিত প্রয়াসকে কোনো দলের নামে চিহ্নিত করেন নি, তবু ফরাসী সিনেমার এই পঞ্চপাণ্ডবই 'নুভেল ভাগ্' চলচ্চিত্র আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী শক্তিমান এবং প্রভাবশালী শিল্পী ছিলেন। এঁরা হলেন ফ্রাঁসোয়া ক্রুফো, জঁা-লুক গদার, ক্লদ শ্যাব্রল, এরিক রোমার এবং জাক রিভেৎ। এই পাঁচজন প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার গত কুড়ি বছরে প্রায় একশটি ছবি নির্মাণ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকেই চলচ্চিত্র মাধ্যমটির প্রতি প্রায় একই রকম মানসিকতায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন, যার ফলে সকলে মিলে একটা অভিনব দল গড়ে তুলতে এঁদের খুব বেশী সময় লাগে নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এঁরা কেউ কাউকে চিনতেন না। অথচ প্রতিদিন এঁরা 'আভ্‌নিউ দু মেসোঁ'-এর

সিনেম্যাতেক্ ফ্রাঁসেস্-এর ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহে রোজ ছবি দেখতেন। ছবি দেখা চলতো গড়ে আট ঘন্টা ক'রে। পাঁচজনই একে অপরের অপরিচিত, বিভিন্ন দূরত্বে বসে রোজ ছবি দেখেন। একদিন হঠাৎ জঁ। রেনোয়ার 'Le Crime de M. Lange' ছবিটির প্রদর্শনী শেষ হ'লে পাঁচজনের একজন অল্পদূরে বসে থাকা আর একজনের সঙ্গে কয়েকটা সংলাপ বিনিময় করেন, পরে এই দু'জন তৃতীয়-জনের সঙ্গে চায়ের টেবিলে মিলিত হন এবং আবিষ্কার করেন যে তাঁরা তিন-জনেই ছবি করার জন্যে মরিয়া হয়ে আছেন। এই তিনজন অর্থাৎ রিভেৎ গদার এবং ত্রুফো এঁরা কিছু পরে তাঁদের সিনেমা হলের অপর দুই চলচ্চিত্র উৎসাহী দর্শক শ্যাব্রল ও রোমারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং অবিলম্বে পাঁচজনে একত্রে গোষ্ঠী মনোভাব নিয়ে চলচ্চিত্রজগতে অভিনব কিছু করার জন্যে উঠে পড়ে লাগেন। লক্ষণীয় এই যে, ফরাসী চলচ্চিত্রের এই পঞ্চমহারথী প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভাবনা-চিন্তায় ভরপুর ছিলেন। গদার তাঁর অন্তরের ক্রোধ এবং যন্ত্রণা নিয়ে ভাবিত ছিলেন, অপেক্ষাকৃত তরুণ ত্রুফো সিনেমার সমান্তরালে লেখায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁর শৈশব-স্মৃতি তঁকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বকে নোতুন ক'রে চিনে নিতে সাহায্য করেছিল, রোমার চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সীমারেখা নির্ধারণে ব্যস্ত ছিলেন, রিভেৎ নাটকের সঙ্গে সিনেমার একটা বৈপরীত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন, আর শ্যাব্রল তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অদ্ভুত ভীষণতা এবং অপরাধ প্রবণতার বিশ্লেষণে একাগ্র ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্র মাধ্যমে গল্প বিবৃত হওয়ার স্টাইল নিয়ে অসম্ভব রকম ভাবিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে এই পঞ্চপাণ্ডবই আধুনিক ফরাসী চলচ্চিত্রে এক বিপ্লব সৃষ্টি করলেন।

তথাকথিত সমস্ত রকমের রীতিনীতি-কায়দাকানুন পরিত্যাগ ক'রে এঁরা সম্পূর্ণ নোতুন দৃষ্টিতে এবং অভিনব প্রয়োগ প্রকরণে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে ব্যবহারে দুর্জয় সংকল্পে কাজে নামলেন। আর এঁদেরই হাতে ফরাসী 'নবতরঙ্গ' আন্দোলনের দিগ্‌দর্শন ঘটলো। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এঁরা প্রত্যেকেই চলচ্চিত্রের প্রবেশপথে নিজেদের দারুণভাবে গড়ে নিয়েছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গেই অন্যান্য সনাতন দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পরীতির গভীর যোগ ছিল। গদারের ছবিতে চিত্রকরদের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শ্যাব্রলের ল্যাণ্ডস্কেপের প্রতি তীব্র আসক্তি, ত্রুফোর মধ্যে শহরের সময় ও স্থানের স্মৃতিবাহী আলোক পরিবর্তন আসক্তি,

রোমারের সুনির্বাচিত স্থান ও কালের দৃশ্যগঠন এ সবই তাঁদের অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে।

ফরাসী নবতরঙ্গের জন্ম ষাট দশকে হলেও এই আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল বহু আগে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, সমালোচক, চলচ্চিত্রকার আলেকজান্দার আসত্রুক ১৯৪৮ সালে এক বৈপ্লবিক প্রবন্ধ লেখেন যেখানে তিনি সিনেমা নির্মাণের ক্ষেত্রে 'La Camera Stylo' তত্ত্বটির উদ্ভাবন করেন। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের কলমের মতোই চলচ্চিত্রকার তাঁর বক্তব্য ও ঘটনাকে ক্যামেরার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবেন। নুভেল ভাগের পরিচালকরা আসত্রুকের এই ভাষাকেই দশ বছর পরে সার্থক ক'রে তোলেন তাঁদের বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মন দিলে দেখা যাবে যে নবতরঙ্গের পরিচালকরা 'সিনেম্যাতেক ফ্রাঁসেসে'র অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলচ্চিত্রের তত্ত্বের যে পাঠ নিয়েছিলেন তা তাঁদের পরবর্তী জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। আঁরি লাঙলোয়া যিনি 'সিনেম্যাতেকে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর একান্ত প্রযত্নে রক্ষিত অমূল্য শিল্পভাণ্ডার এবং সিনেমা-সংক্রান্ত অসংখ্য উপাদান নবতরঙ্গের পরিচালকদের প্রভূত সাহায্যে আসে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে এই সময় 'Cahiers du Cinema'-র মতো অতি মননশীল চলচ্চিত্র পত্রিকার পৃষ্ঠায় নুভেল ভাগের পরিচালকরা সিনেমা বিষয় প্রবন্ধ ও আলোচনায় সারা ফ্রান্সের শিল্পজগতে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলেন। এর সম্পাদক ছিলেন আঁদ্রে বাজাঁ। মূলতঃ চল্লিশ দশকের একেবারে শেষে আসত্রুক নোতুন শিল্পরূপ হিসেবে চলচ্চিত্রের এক অভিনব প্রকাশভঙ্গির স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার জন্য আবেদন রেখেছিলেন। সেখানে লাঙলোয়ার মতো 'সিনেম্যাতেকে'র বিচক্ষণ অধ্যক্ষ ও সংগ্রাহক সব শিল্পীদের উপাদান সরবরাহ করেন এবং বাজাঁর মতো বিদগ্ধ শিল্প তাত্ত্বিকের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্রজগতে এক অসাধারণ উদ্দীপনা সঞ্চারিত হতে থাকে। কাইয়েরের পৃষ্ঠায় ক্রুফো, গদার, শ্যাব্রল, রিভেৎ, রোমার এঁরা সকলে চলচ্চিত্রের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় নোতুন তত্ত্বের দাবি জানান। ধীরে ধীরে নুভেল ভাগ্ পরিচালকদের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একাধিক চলচ্চিত্র নন্দনতত্ত্ব গড়ে ওঠে। আসত্রুকের Camera Stylo ছাড়াও জন্ম নেয় 'miseen scene', 'politique des auteurs' এবং auteur comple তত্ত্বগুলি। Mise en scene বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'ল creation of mood অর্থাৎ ওঁদের কথায় ছবির মধ্যে স্রষ্টার স্বকীয় শিল্পভঙ্গীর প্রকাশটা একান্ত প্রয়োজন। ছবির মধ্য থেকেই দর্শকরা

পরিচালকের বিশিষ্ট শিল্পী মেজাজটিকে বুঝে নিতে পারবেন। তা না হলে সে ছবি ব্যর্থ হবে। 'Politique des auteurs' অর্থে তাঁরা বোঝালেন যে কোনো সমালোচক কোনো কোনো পরিচালকের সঙ্গে নিজের মানসিকতার সাযুজ্য আবিষ্কার করতে পারেন এবং ফলতঃ যেসব চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে সমালোচকরা মনের মিল পেলেন না, সরাসরি তাঁদের বর্জন করলেন। এবং এক্ষেত্রে তাঁরা হিচকক, নিকোলাস রে প্রভৃতি পরিচালকদের নিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করলেন। 'auteurs comple' বা complete director' অর্থে নুভেলভাগের প্রবক্তারা একটি ছবির সর্ববিভাগের জন্য পরিচালককে প্রধানতম পুরুষ বলে গণ্য করলেন। তাঁদের মতে ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ, সংগীত ও পরিচালনা এইসব কিছুর জন্য একমাত্র পরিচালকই দায়িত্ববদ্ধ থাকবেন। একটি ছবির ভালোমন্দ এবং শিল্পমান তাই সম্পূর্ণতঃ পরিচালকের ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করবে। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে বাজাঁ এবং তার অনুগামী শিল্পবৃন্দ তিরিশ ও চল্লিশ দশকের হলিউডী মার্কিন ছবির দ্বারা ভীষণভাবে পীড়িত ছিলেন। এইসব মার্কিনী ছবিগুলো ওয়ার্ণার ব্রাদার্স, প্যারামাউন্ট, মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র প্রভৃতি প্রযোজনার নামে বাজারে কাটতি হত। সেখানে পরিচালকের স্বতন্ত্র কোনো ভূমিকা এবং মূল্যও ছিল না। তাই নুভেল ভাগের শিল্পীরা চুটিয়ে এইসব ছবিগুলোর আদ্যশ্রাদ্ধ করে-ছিলেন 'কাইয়েরে'র পৃষ্ঠায়। এঁরা বরং সেইকালের কিছু ইউরোপীয় ছবির প্রশংসা করেন যেগুলো থেকে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এইসব পরিচালকদের মধ্যে ব্রেসঁ, দার্শনিক প্রতিভাধর ককতো এবং জাঁ রেনোয়া নুভেল ভাগ শিল্পীদের সাধুবাদ অর্জন করেন। 'Politique des auteurs' এবং 'auteurs comple' সম্পর্কে নুভেল ভাগের শিল্পগুরু আঁদ্রে বাজাঁ 'কাইয়ের দ্যু সিনেমা' পত্রিকায় অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন যা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। "[It] consists, in short, of choosing the personal factor in artistic creation as a standard of reference, and then assuming that it continues and even progresses from one film to the next," এখন বাজাঁ কথিত ঐ 'personal factor' ব্যাপারটি অনুধাবনের জন্য স্রষ্টাদের বিভিন্ন স্টাইল নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিল এবং তখন থেকে ছবির বিষয়বস্তু অনুসারী বিভিন্ন গোত্রের চলচ্চিত্রের নামকরণ দেখা দিল যেমন Westerns, Gangster films, Films Noirs ইত্যাদি। আর এগুলো দিয়ে

ছবির শ্রেণী সেইসঙ্গে চরিত্রও ফুটে উঠল। সমান্তরালে চলচ্চিত্র সমালোচনার ধারায় একটা নোতুন দৃষ্টিভংগীর জন্ম সূচিত হ'ল মুখ্যত: যার আরম্ভ হয়েছিল বিপ্লবী চলচ্চিত্র পত্রিকা 'কাইয়ের'র পৃষ্ঠায়। নবতরঙ্গের উদ্‌গাতারা চলচ্চিত্রের দ্বান্দিক বস্তুবাদের মাধ্যমে সমগ্র চলচ্চিত্রের শিল্পধারাটিকে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেলেন। সিনেমা তাঁদের কাছে বিবিধ বিপরীত বিষয়বস্তুর সংঘাতময় ও সামগ্রিক একটা উপকরণ হিসেবে প্রতীয়মান হ'ল। পরিচালক এবং তাঁর স্টাইল, চলচ্চিত্র স্রষ্টা এবং দর্শক, সমালোচক ও আলোচ্য ছবি, চলচ্চিত্র নন্দনতত্ব ও তার প্রয়োগ এবং সর্বোপরি গদার উল্লিখিত 'Method and Sentiment' ইত্যাদি নানান ভাবনাচিন্তা, অসংখ্য তত্বের বিচার-বিশ্লেষণ চলচ্চিত্র শিল্প মাধ্যমটির সম্ভাবনাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করলো। অনেকের মতে 'নবতরঙ্গ' আন্দোলন ষাট দশকের ফসল এবং চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল এর বিচারের যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু নিরাসক্ত ঐতিহাসিকের কাছে কোনো বিশেষ মতবাদ বা প্রচারই একমাত্র গ্রহণীয় হতে পারে না। বস্তুত: ফরাসী নবতরঙ্গের শিল্পীরা জোটবদ্ধভাবে মোটামুটি একই সময়পর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁদের সেদিনের প্রচণ্ড প্রকাশের ফল্গু ধারার আবেগটা এত গভীর ছিল যে সহজেই সেই কালপর্বটাই বিশিষ্ট ঘটনারূপে চলচ্চিত্র জগতে চিহ্নিত হয়ে গেছে। কিন্তু এসবের পূর্বে মার্কিন দেশের বিট্ আন্দোলন, পঞ্চাশ দশকের কিছু বিদ্রোহাত্মক সমাজ-সমস্যামূলক মার্কিনী ছবি যার মধ্যে নিকোলাস রে পরিচালিত 'Rebel without a cause' ও এলিয়া কাজানের 'East of Eden' ছবি দুটি উল্লেখ্য, এগুলি এবং ফ্রান্সের বিশেষ ধরনের ফটোগ্রাফার রোজার ভাদিমের আশ্চর্য নায়িকা আবিষ্কার ব্রিজিত বার্দোর অলজ্জ যৌন আবেদন, গোঁড়ামী ও বন্ধনমুক্তির মধ্যেকার ব্যবধানটুকু সরিয়ে দিয়ে সেক্সকে নোতুন ভংগিতে দেখা ও দেখানোর প্রবণতা, যার পরিচয় ভাদিমের 'And God created Woman'-এ আছে, এইসব ব্যাপার, এবং তারও আগের যুদ্ধোত্তর কালের অব্যবহিত পরে নির্মিত মার্সেল কার্ণ-এর মনস্তাত্বিক ছবিগুলোও নবতরঙ্গের আগমনকে বিশেষভাবে সম্ভাবিত করেছে। এই সমস্ত উপাদানগুলো বিভিন্ন দিক থেকে নবতরঙ্গের শিল্পীদের শিল্পমানসে নানাভাব ও ভংগিতে সংক্রামিত হয়ে শেষে বিশেষ এক কালের সুযোগে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো নোতুন শিল্পপ্রচ্ছদে আত্মপ্রকাশ করেছে। একদা আঁদ্রে জিদের সেক্রেটারী ভাদিম তাঁর ছবিতে বার্দোর যৌন আবেদনকে কাজে

লাগালেন এমনভাবে যেখানে বার্দোর ভূমিকা। অনেকটা রুশো কথিত অপাপবিদ্ধ 'প্রকৃতির শিশু'র মতো। সেক্সের এই অকপট, অনাবৃত সরল এবং এক অর্থে বিশেষ সত্য স্বরূপটা নবতরঙ্গের পরিচালকরা প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমিতে স্থাপন করেই তাঁদের শিল্পে গ্রহণ করেছেন। তাই নুভেল ভাগের অধিকাংশ ছবিতেই জীবনযৌবনের বাঁধভাঙা অসঙ্কোচ প্রকাশস্বরূপ প্রায় অবিসংবাদী রূপে দেখা যায়।

নুভেল ভাগের পূর্বোল্লিখিত পঞ্চপাণ্ডব ছাড়াও এই শিল্প-আন্দোলনের অন্যান্য শিল্পীরা বিশিষ্ট দলে বিভক্ত ছিলেন। অর্থাৎ ত্রুফো-গদার-রিভেৎ প্রমুখরা ছাড়া দ্বিতীয় দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তথাকথিত বামপন্থী মতবাদের শিল্পী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অ্যাগনে ভার্দা, আলাঁ রেনে এবং খ্রিস মেকার উল্লেখ্য। এঁরা পূর্বোক্ত দলের থেকেও চলচ্চিত্র জগতে আরো পুরোনো ছিলেন এবং এঁদের প্রত্যেকেই 'সিনেমাতেকে'র প্রথম দলটির তুলনায় আগে থেকেই ছবি করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। এবং এঁরা রাজনীতির প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের প্রতি এঁদের আগ্রহ ছিল। বস্তুতঃ ত্রুফো এবং শ্যাব্রলের অর্থনৈতিক সাফল্যই এঁদের পুনরায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নোতুন উৎসাহে ফিরিয়ে আনে। এবং এই দুটি অগ্রগণ্য গোষ্ঠীর বাইরে স্ব স্ব ভংগিতে কিছু শিল্পী ছবি তুলছিলেন। এই তৃতীয় দলটির সদস্য ছিলেন ভার্দার স্বামী জাক দেমী, জর্জ ফ্রাঁজু এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা জ্যা রুশ। এই ফরাসী 'নবতরঙ্গে'র শুরু হয় শ্যাব্রলের Le Beau Serge' (Handsome Serge) ছবিটি দিয়ে। এটিই নুভেল ভাগের প্রথম ছবি এবং এ ছবি ১৯৫৮ সালে লোকার্নো উৎসবে পুরস্কৃত হয়। শুধু তাই নয়, 'কাইয়ে'র পত্রিকার পাতায় দীর্ঘদিন ধরে শ্যাব্রল, গদার প্রমুখেরা যে নোতুন চলচ্চিত্র নন্দনতত্ত্বের জন্য প্রাণপাত শানিত লেখা চালাচ্ছিলেন শ্যাব্রলের এই ছবি সেই শিল্প আকাঙ্ক্ষা সদম্ভে প্রমাণ রাখলো। এবং প্রমাণিত হ'ল সীমিত বাজেটে যথার্থ শিল্পক্ষমতায় উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব। 'নুভেল ভাগ' চলচ্চিত্র আন্দোলনের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কমেডি ছবি নির্মাণ করেন নি। আসলে তাদের মূল দৃষ্টিভংগির সঙ্গে কমেডির একটা বিরোধ ছিল। তাই চাপলিন, কীটন থেকে শুরু ক'রে ফরাসী কমেডির দক্ষ নির্মাতা জ্যাক তাতি পর্যন্ত যে সূক্ষ্ম কৌতুকবোধ বা কমেডির ধারা আমরা লক্ষ্য করি নুভেল ভাগীয় ছবিতে তার স্পর্শ নেই। হয়তো এর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রথম 'নিউওয়েভ' কমেডি

তৈরীর গৌরব যাঁর প্রাপ্য তিনি হলেন, ফিলিপ দ্য ব্রেকা। তাঁর ছবির নাম 'Fenx de L'Amour'। **নবতরঙ্গের অন্যতম উদ্যোক্তা ক্রফোও একসময়** কমেডিতে হাত দিয়েছিলেন। ছবির নাম 'Une Belle Fille cemme moi' (Such a Gorgeous Kid Like Me) ক্রফোর প্রায় ছবিতেই কমিকের উপাদান থাকে তবে এটাই তার প্রথম প্রচেষ্টা যেখানে তিনি সম্পূর্ণ প্রহসন নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

ফরাসী 'নবতরঙ্গ' যখন জন্মসম্ভাবনায় প্রস্তুত হচ্ছে তখন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ চেহারাটা খুব সুস্থির ছিল না। নেতাহীন নৈরাজ্য, উপযুক্ত রাজনৈতিক দলহীন ফ্রান্সের সামাজিক বিশৃংখলা, একের পর এক সরকারের পতন, আলজেরীয় সূত্রকে কেন্দ্র ক'রে বিভক্ত দেশের অর্থনীতি সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন। এই ছন্নছাড়া বিক্ষিপ্তির মধ্যেই একদল শিল্পী সিনেমার সনাতন রীতিটাকে ভাঙার চেষ্টা করছিলেন। কাইয়ের গোষ্ঠীর অসংখ্য লেখা যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৫৯-এর কান উৎসবই এই গোষ্ঠীর শিল্পবাসনাকে বাস্তবায়িত করলো। জন্ম নিল এমন এক শিল্পরীতি যা তথাকথিত সিনেমার ভিত্তিমূলকে নানাপ্রশ্নে, বিশ্লেষণে, আক্রমণে নড়িয়ে দিল। সিনেমার মধ্য দিয়ে মানব অস্তিত্বের আর এক নোতুন মূল্যায়ণ আবিষ্কৃত হ'ল। এই নবতরঙ্গের শিল্পীরা রীতি ও প্রকরণের দিক থেকে বিশ দশকের আভাঁগার্দীয় ষ্টাইলের সার্থক উত্তরসূরী না হলেও তাঁরা আভাঁগার্দ দ্বারা পরোক্ষে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসলে নুভেল ভাগের স্রষ্টাদের হাতে সিনেমা মাধ্যমটি আরো যুক্তিসঙ্গত, আরো বাস্তব সচেতনভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। ক্যামেরাকে আরো যুক্তি শৃংখলার পারম্পর্যে ব্যবহার ক'রে মানুষের জীবনকে বহুধা বিচ্ছিন্ন স্তর থেকে একেবারে চলচ্চিত্রের পর্দায় এনে হাজির করলেন 'নিউ ওয়েভের' পরিচালকরা। বিখ্যাত নবারীতির ঔপন্যাসিক রব গ্রিয়ে একবার নিজের ছবি করা সম্বন্ধে বলেছিলেন: "What I have been trying to do is to break away from the idea that a film must be based on an anecdote' অর্থাৎ ছবিতে কোনো সুগ্রথিত কাহিনী থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ভার্জিনিয়া উলফ্ যেমন সাহিত্যে সনাতন রীতিতে গল্প বলার বিরোধী ছিলেন তেমনি 'নব তরঙ্গের' পরিচালকরাও কাহিণীর সব ধারাবাহিকতাকে ভেঙে চুরমার ক'রে পর্দায় মানুষের অস্তিত্বের সার্বিক প্রকাশটাকেই বড় ক'রে দেখেছেন।

"আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং"

'নুভেলভাগে'র স্রষ্টারা যেন তাঁদের ছবির মাধ্যমে মানুষের জীবনের এই ব্যাপ্তির কথাই বলতে চেষ্টা করেছেন। তাই জীবনের সব রকমের রুদ্ধ উৎসে নব আনন্দের সন্ধানে এঁদের কোনো ক্লান্তি ছিল না। চল্লিশের ইটালীয় 'নিও রিয়ালিজমে'র সঙ্গে ষাট দশকের ফরাসী নব তরঙ্গের মূলগত একটা তফাৎ আছে। 'নিওরিয়ালিজম' মূলতঃ একটা দর্শন যা বিশেষকালে মানুষের অস্তিত্বের বস্তুগত দিকটাকে যাচাই করার চেষ্টা করেছিল। 'Things as they are' এটাকে আবিষ্কার করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সেইসঙ্গে Film reality-কে উপলব্ধি করা। আর 'নুভেল ভাগ' মূলতঃ চলচ্চিত্রের আঙ্গিকগত একটা নোতুন আন্দোলন। তাঁরা বাস্তবকেই অবলম্বন করলেন কিন্তু ক্যামেরার নোতুন প্রয়োগ বৈচিত্র্যের দ্বারা। সিনেমার টেক্‌নিকের দিকটাই বেশী ক'রে পরিচালকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। ফ্রিজের ব্যবহার, হ্যাণ্ড হেল্ড ক্যামেরার অধিক ব্যবহার, গল্পবলার ভংগির পরিবর্তন, স্লোমোশন, জাম্পকাট, ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতির নোতুন ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ, ফিল্মকন্‌টিনিউটি, সময় ও স্থানের মিলিত অদ্ভুত তন্ময় প্রকাশ, একই ছবিতে একাধিক বিপরীত রীতির মিশ্রণ, কার্টুনের সঙ্গে নিউজরীলের প্রয়োগ, নেপথ্য ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় বিবিধ টাইটেল ভেসে ওঠা ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপার পরিচালকরা প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলেন। ফলতঃ চলচ্চিত্রের শরীর সীমায় এক অদ্ভুত রীতির আমদানি ঘটলো। Eola ছবির মেলার দৃশ্যে ফ্র্যাঙ্কী এবং সিসিল নাগরদোলা থেকে হাত ধরাধরি ক'রে নেমে আসছে। এখানে স্লোমোশন ব্যবহার করে দেমী এক অপূর্ব ছন্দ গঠন কেরেছেন। ত্রুফোর The 400 Blows-এর শেষ দৃশ্য স্মরণ করা যেতে পারে। কিশোর নায়ক জেল থেকে পালিয়ে ছুটে চলেছে। ক্যামেরাও সমান তালে তাকে অনুসরণ করছে। দর্শকদের উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ছে। অবশেষে বালকের সামনে পড়ে যায় অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, আর পালাবার পথ নেই। সে দর্শকদের দিকে মুখ করে পিছন ফেরে, দৃশ্যটি Freeze হয়ে যায়। অনবদ্য ব্যঞ্জনায় পরিচালক দর্শকদের মস্তিষ্কের কোষে অদ্ভুত প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। বালকের পরিণতি এখন তবে কী ? এই ফ্রীজের চমৎকার ব্যবহার তাঁর Jules & Jim ছবিতেও আছে। ফ্ল্যাসব্যাক প্রসঙ্গে Lola ছবির কথা মনে হতে পারে। তথাকথিত ফ্লাসব্যাকের প্রয়োগ না থাকলেও এ ছবিতে একাধিক চরিত্রের

সমাবেশ ঘটেছে পারস্পরিক সম্পর্কের উদ্ঘাটনে। অসংখ্য ছোট ছোট উপাগল্পে বিবৃতিতে চরিত্রগুলির স্মৃতি রোমন্থিত হয় যা বিশেষ অভিনব। গদার 'ন্যারেটিভ' একেবারে ভেঙে চুরমার করলেন। ত্রুফোর Novelist ভংগি তাঁর মনঃপূত নয়। তিনি আপাত-এলোমেলো অথচ সমাপ্তিতে একাগ্র এক অদ্ভুত চিত্রনাট্যের আধারে ছবিকে গড়ে তুললেন। A bout de souffle থেকে শুরু করে Vivre sa vie, Les Carabiniers, Pierrot le Fou এমনকি শেষের দিকের Tout va bien সব ছবিতেই নিটোল সুগ্রথিত কোনো কাহিনীর স্থান নেই। রেনে সময়কে ভাঙলেন মনস্তাত্ত্বিক চিন্তায়। দার্শনিক প্রজ্ঞা তাঁকে নোতুন মর্যাদায় চিহ্নিত করলো। তাঁর 'Hiroshima Mon Amour', L'anee Derniere a' Marienbad, 'War is Over', 'Muriel' এ সব ছবিতেই সময় অখণ্ড ভ্রাম্যমাণ এক বিষয়বস্তুতে পরিণত। এখানে অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎ সব মিলে মিশে একাকার। এরিক রোমার গত তিন শতাব্দীর ফরাশী মননশীল ঐতিহ্যের ঘনিষ্টতায় আধুনিক ফ্রান্সকে ব্যাখ্যা করলেন। পাপ ও পতন এবং রিরংসা-প্রেম, সৌন্দর্য্য ও বিকৃতির রূপকার শ্যাবল মধ্যবিত্ত অপরাধপ্রবণতাকে কাব্যিক মেজাজে পর্দায় তুলে ধরলেন।

ঐতিহাসিকভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এই ফরাসী 'নবতরঙ্গ' কেবল ফ্রান্সেই নয়, ঐ একই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য প্রদেশের চলচ্চিত্রেও দারুণ অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। ইটালীর পরিচালক আন্তনিওনি তুললেন 'L'Avventura', ফেলিনি নির্মাণ করলেন 'La Dolce Vita' সুইডেনে বার্গম্যান নির্মাণ করলেন 'Virgin Spring' এমনকি জন ক্যাসাভেট্‌স্‌ তুললেন 'Shadows' এ সবই চলচ্চিত্রে নোতুন পথের সন্ধান দিল। শুধু তাই নয় কয়েকবছরের মধ্যেই ইংলণ্ডে চেকচলচ্চিত্রেও নোতুন সৃষ্টির ইংগিত সুস্পষ্ট হ'ল। অন্যান্য দেশও পিছিয়ে রইল না, কুইবেকে 'Le Cinéma Nouveau'-র জন্ম হল। ব্রেজিল জন্ম দিল 'Cinema Novo'। পশ্চিম জার্মানীতে দেখা দিল 'Las Neue Kino' চলচ্চিত্রের শিল্প এষণার ইতিহাসে নবতরঙ্গের ঐতিহাসিক মূল্য কতোটা এবং অদূর ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের শিল্পরীতি কী পরিমাণে এবং কোন্‌ দৃষ্টিভংগিতে কাজে লাগবে তার উত্তর দেবে আগামী দিনের চলচ্চিত্র। তবে এটুকু নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে "The metaphor of the New Wave, then was surprisingly apt : the wave had been building for a long time before it burst on Cinematic Shores........The New Wave

has left us with a Cinema forever changed, enlarged, more powerful, more eloqeent, more acute. আসলে নুভেল ভাগের শিল্পীরা শিল্পের মাধ্যমে আত্ম-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। নিজেরা নিজেদের বিশ্লেষণ ক'রে চারপাশের জগতটাকে অপর পাঁচজনের কাছে অভিনব কৌতূহলের শরিক ক'রে তুললেন। বস্তুতঃ তাঁদের ছবিগুলো ছিল অনেকটা self-reflexive and saturated with playful creation : tribute at their most trivial encouraged the spector to become an armchair detective, tracing down icno graphic clues at the exyense of wsder interest."

১৯৬৮-র শীতকাল। দ্য গল সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী আঁদ্রে মাল্‌রো সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে 'সিনেম্যাতেক্ ফ্রাঁশেশে'র প্রধানরূপে আঁরি লাঙলোয়া তাঁর যথোচিত কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করছেন। তিনি তাঁর স্থলে নোতুন কাউকে বসাতে চাইলেন। গদার, ক্রুফো ও তাঁদের অনুগামীদের নেতৃত্বে ফ্রান্সের চলচ্চিত্র-মোদারা রাস্তায় মিছিল করলেন। এই ঐতিহাসিক মিছিল ঐ বছরের গ্রীষ্মে যে বক্তব্যের জন্ম দেবে তার প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করলো। চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটলো। ফরাসী নুভেল ভাগ্ আন্দোলন আশ্চর্যভাবে এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে গেল ঐতিহাসিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব অসাধারণ। আজকের বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যেকোনো নবীন শিল্পী তাঁর প্রথম তারুণ্যের বাসনায় ছবি নির্মাণে নামবেন, তাঁর শিল্প-মানসে কোনো না কোনোভাবে নবতরঙ্গের রীতি ও আদর্শের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব থাকবেই। স্বকীয় শিল্পব্যক্তিত্বে তিনি নোতুন কিছুর জন্ম দিলেও নুভেল ভাগ্ আন্দোলনের বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশের স্বরূপকে অস্বীকার ক'রে তাঁর প্রতিষ্ঠার বাসনা অনেকটা শিল্পেরই অবমাননা। নোতুন শিল্পের জন্ম হয় পুরাতন ঐতিহ্যের অস্বীকারে নয়, তার স্বীকরণে। নুভেল ভাগ্ সেই স্বীকরণের দ্বার পথে সদম্ভে তার অসংখ্য কৃতিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে।

তথ্যচিত্র

সিনেমায় যবে থেকে গল্পের শুরু, তথ্যচিত্রের সূচনা সমসাময়িক না হলেও চলচ্চিত্রে তার জন্মলগ্ন খুব দেরীতে নয়। কাহিনীচিত্রের সঙ্গে তথ্যচিত্রের শিল্প ও প্রকরণের তফাৎ অনেক। বস্তুতঃ "documentary has come to mean a film about the conditions and problems of human life a combination of science and art, focussed on man." ঠিক এই মন্তব্য থেকেই তথ্যচিত্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হবে। তথ্যচিত্রের ইংরেজী তর্জমা হল "ডকুমেন্টারী ফিল্ম।" অর্থাৎ এর মধ্যে প্রামাণিকতার একটা প্রশ্ন জড়িত আছে। কেউ কেউ ক্ষুদ্র চিত্রের সঙ্গে তথ্যচিত্রকে এক অর্থে ভাবেন। আসলে শর্ট ফিল্ম আর ডকুমেন্টারী ফিল্ম দুটো ভিন্ন প্রকৃতির। শর্ট ফিল্ম অনেক ক্ষেত্রেই তত্ত্বভিত্তিক এবং কাহিনীভিত্তিকও হয়। কিন্তু তথ্যচিত্রে কাহিনীর স্থান নেই। বহু তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে যার সময়সীমা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রের সমান। মূলতঃ তথ্যচিত্র হ'ল চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমের সেই ধরনের প্রকাশভঙ্গি যেখানে মানুষের পারিপার্শ্বিকতা আর ব্যক্তিচেতনার প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস দর্শকের মনে সক্রিয় চেহারা নেয়। সে অর্থে এর দৈর্ঘ্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমায় বাঁধা নয়। যদিও স্বদেশে ও বিদেশে সরকারী তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা দৈর্ঘ্য বিনির্দিষ্ট আছে যা বিশেষভাবেই প্রয়োজনের ভিত্তিতে হয়েছে।

তথ্যচিত্রের সূত্রপাত এক ধরনের শিল্পান্দোলন রূপে ঘটেছিল। প্রথম দিকে তাই তথ্যচিত্র-নির্মাতারা ক্যামেরার শৈল্পিক প্রয়োগ প্রকরণের থেকে স্থান-কাল-পাত্র তথা বস্তুর যাথার্থ্যকে সিনেমার পর্দায় তুলে ধরতে আগ্রহী ছিলেন। ক্রমশঃ চলচ্চিত্রের অসীম শিল্পসম্ভাবনার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হ'তে শুরু করলে তথ্যচিত্রের শিল্পরীতিও বিচিত্র ধারায় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বস্তুতঃ ১৯২২ সালে রবার্ট ফ্লাহার্টি নামক একজন আইরিশ আমেরিকানই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর তৈরী 'Nanook of the North' ছবিতে তথ্যচিত্রের বীজ বপন করেন। পরবর্তীকালে বিশ্বখ্যাত তথ্যচিত্র নির্মাতা জন গ্রিয়ারসন যাকে a creative

treatment of actuality' বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে ১৯২৬-এ নির্মিত ফ্লাহার্টির দ্বিতীয় ছবি 'Moana'-কেই গ্রিয়ারসন 'ডকুমেন্টারী' এই অভিধায় চিহ্নিত করেন। গ্রিয়ারসন 'ডকুমেন্টারী' শব্দটিকে ফরাসী 'documentaire' থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এই ফরাসী শব্দটির মাধ্যমে ফ্রান্সের জনপ্রিয় ভ্রমণ চিত্রকে বোঝাত। একালে 'তথ্যচিত্র' বলতে বিভিন্ন ধরনের ছবির কথা এসে পড়ে। এই ধারায় একান্ত প্রামাণিক দলিল চিত্র থেকে শুরু করে কাব্যময় অনেক ছবির দৃষ্টান্ত আমাদের মনে পড়ে। যেমন বেসিল রাইটের বিখ্যাত 'The Song of Ceylon', ওয়াট এবং রাইটের 'Night Mail', গ্রিয়ারসনের 'Driftars' এর মতো ছবিও যেমন তথ্যচিত্রের গোত্রে পড়ে তেমনি ফ্লাহার্টির 'Man of Aran' এবং 'Nanook of the North', 'Lousiana Story' জরিস ইভান্স্‌এর 'The Bridge' পিয়ের লরেঞ্জ এর পরীক্ষামূলক 'The River' রুটম্যানের 'Berlin the symphony of a great City' ইত্যাদি নানা রীতির ছবিকেও চলচ্চিত্রবিদরা তথ্যচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। চলচ্চিত্রে তথ্যচিত্র শিল্পভাবনার উদয় যেহেতু মানুষ ও তার পরিবেশের যথাযথ সম্যক পরিচয় উদ্ঘাটনের তাগিদে হয়েছিল, তাই ডকুমেন্টারী ছবিতে মানুষের জীবন ও জীবিকা বিশ্বস্ত প্রামাণিকতায় বিধৃত হয়।

ডকুমেন্টারী ভাবনায় ব্রিটেনের জন গ্রিয়ারসনই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি তথ্যচিত্র শিল্পান্দোলনকে একটা সুনির্দিষ্ট চেহারা দিতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে তথ্যচিত্র হল বিশেষ ভাবেই উদ্দেশ্যমূলক এবং তথাকথিত কাহিনীচিত্রের আর্থিক সাফল্যের চেয়ে যার প্রবণতা হল মানুষকে তার বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন করে তোলা। গ্রিয়ারসন তাঁর তথ্যচিত্র নির্মাণ আন্দোলনের স্মৃতি-চারণা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "We were concerned not with the category of purposivenes without purpose but with that other category beyond, which used to be called teleological. We were reformers open and avowed." এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তথ্যচিত্র নির্মাণ ব্যাপারটা কেবল চলচ্চিত্র ভাবনা-রূপেই আত্মপ্রকাশ করেনি, এর পশ্চাতে একটা নোতুন জনশিক্ষার বাসনা সক্রিয় ছিল। বিখ্যাত 'ডকুমেন্টারী' গ্রন্থের প্রণেতা এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা পল রোথা ব্যক্তিগতভাবে গ্রিয়ারসন কথিত তত্ত্বের ভিন্নপন্থী ছিলেন। রোথা তথ্যচিত্রকে অনেকটা প্রচারমূলক মাধ্যম হিসাবে গণ্য করতেন। রোথা মনে

করতেন সিনেমা হল সেই শিল্প নির্মিতি যা জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করবে এবং সিনেমার এই জ্ঞান বিস্তার বিশেষ ভাবে হবে 'about the working of government and the essential fact of our economic and social ways and means.' অথচ লক্ষনীয় বিষয় হল যে ব্রিটেনের তথ্যচিত্র আন্দোলনে যাঁরা জোট বেঁধেছিলেন তাঁরা মূলতঃ ১৯৩২ সালে প্রকাশিত গ্রিয়ারসনের তথ্যচিত্র সংক্রান্ত শিল্পসূত্র দ্বারাই বেশী পরিমাণে অনুপ্রাণিত ছিলেন। গ্রিয়ারসন যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার মধ্যে দুটো প্রধান বিষয় ছিল। এক হল গ্রিয়ারসন ও তাঁর অনুগামীরা তথ্যচিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ পদ্ধতির একটা নোতুন রূপদান করলেন, দ্বিতীয়তঃ এই চিত্র নির্মাতারা ষ্টুডিওতে তৈরী ছবির রীতিকে উপেক্ষা করলেন সেইসঙ্গে তথাকথিত প্রযোজক ও অর্থলগ্নীকারীদের পরিবর্তে সরকারী এবং আমলা-তান্ত্রিক বিভিন্নগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সাহায্যের উপায় খুঁজে বার করেছিলেন। পরিবর্তে তাঁদের শর্ত ছিল তাঁদের তৈরী ছবির মাধ্যমে তাঁরা জনশিক্ষা গড়ে তুলবেন।

কেবল ব্রিটেন বা আমেরিকায় নয় রাশিয়াতেও বিশ দশকে এবং তিরিশ দশকে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রুশ তথ্যচিত্র পরিচালক জিগা ভার্তভ। তাঁর তৈরী Enthusiasm (১৯৩০) ও 'Three Songs of Lenin' (১৯৩৪) ছবি দুটির মাধ্যমে তথ্যচিত্রে শব্দ ও চিত্রের এক সুন্দর পরীক্ষা করেছিলেন। নির্বাক পর্বে নির্মিত ভার্তভের Stride Soviet (১৯২৬) Sixth of the World (১৯২৬) উল্লেখযোগ্য এবং ১৯২৯-এ তৈরী তাঁর অনবদ্য তথ্যচিত্র 'The Man with the Movie Camera'-তে সংবাদচিত্রের একটা ভংগি প্রয়োগ করলেন যা পরবর্তীকালে তথ্যচিত্রের একটি বিশেষ ধারা হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৯৩৩-এ মুক্তিপ্রাপ্ত কুড়ি মিনিটের তথ্যচিত্র 'Industrial Britain' ছবি দিয়েই ব্রিটিশ তথ্যচিত্র অন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সূচিত হলেও তিরিশ দশকের মাঝামাঝি চলচ্চিত্রে ছবির সঙ্গে শব্দপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তথ্যচিত্র নির্মিতিতে একটা নোতুন গতি সঞ্চারিত হল। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ছবি হল কাভ্‌লাকান্তির Coalface (১৯৩৫) এলটন ও এ্যান্‌সটের Workers and Jobs এবং Housing problems, এবং ওয়াট এবং রাইটের Night Mail. ও প্রসঙ্গতঃ 'Contact' ও Ship yard ছবি দুটিও উল্লেখ্য।

এদিকে যুদ্ধের সময় ও তৎপরবর্তী অর্থাৎ ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এ আমরা বেশ

কিছু নোতুন ধরনের তথ্যচিত্রের দেখা পেলাম। দ্বিতীয় মহাসমরের সময়সীমায় হামফ্রে জেনিংস্ ব্রিটেন সম্পর্কে বেশ কয়েকটি উল্লেখ্য ছবি তৈরী করেন, এর মধ্যে The First Days, Listen to Britain স্মরণীয় এবং দীর্ঘ কাহিনীচিত্রের আকারে দমকল বাহিনীর দীর্ঘ চিত্র Fires were Started স্মরণীয়! ফ্লাহার্টি যেক্ষেত্রে তথ্যচিত্রের নির্মাণ প্রকল্পে বিশ্ব ভুবনকে দেখার বাসনা পোষণ করতেন, জেনিংস্ সেক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থানের মধ্যবর্তী বিভিন্ন যোগসূত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যেমন জেনিংস্ তেমনি ফরাসী চিত্র নির্মাতা জর্জ ফ্রাঁজু। এঁরা দুজনেই চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে চোখ ও কান অর্থাৎ চিত্র ও শ্রুতির প্রতি ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। জেনিংস্ যেখানে একটি সমগ্রতার মধ্যে বিভিন্ন উপকরণের সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন সেখানে ফ্রাঁজু বৈপরীত্য ও অনেক বিষয়বস্তুর অংশকে কেন্দ্র করে তার শিল্পরীতি গড়ে তুলতেন। তার L,Hotel des Invalides' ছবিটি স্বকীয় শিল্পরীতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রযোজিত এ ছবিতে ফ্রাঁজু তাঁর স্বভাবসুলভ ভংগিতে নেপোলিয়নের মিথ্যা গৌরব ও যুদ্ধের মোহসৌন্দর্যকে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে আক্রমণ করেছেন। কেবল এই ছবিগুলিই নয়, এই সময়সীমায় অর্থাৎ যুদ্ধকালীন বেশ কয়েকটি ছবি বিষয়বস্তু ও নির্মাণ নৈপুণ্যে আজও ঐতিহাসিক মূল্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। এর মধ্যে 'Coastal Command, Western Approaches, Target for Tonight. The Desert Victory, The True Glory, সেই সঙ্গে যুদ্ধের সময় পর্বে নির্মিত পল রোথার 'The world of plenty' ছবিটি তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটা নোতুন দৃষ্টিভংগির পরিচয় দান করেছিল। ছবিটি যুদ্ধের সমাপ্তিতে পৃথিবী জুড়ে যে খাদ্যাভাব আর পুষ্টি বিধানের সমস্যার উদ্ভব হবে তার প্রতি আগামী দৃষ্টি রেখেছিল যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে তথ্যচিত্র নির্মাণ ব্যাপারটির সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট যোগাযোগ হ'ল সরকারী সূত্রে। যদিও ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে ভারতে তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছিল। এবং ডঃ পাথে, কে. এম, হিরলেকর, ডি, জি. তেণ্ডুলকর প্রমুখের মাধ্যমে ভারতে তথ্যচিত্রের প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু সে সময়ে বেসরকারী প্রযোজকরা তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। মূলতঃ বৃটিশ সরকার আলেকজান্দার শ'এর পরিচালনাধীনে 'Information Films of India' গড়ে তোলেন, এবং তখন থেকেই প্রত্যেক চিত্রগৃহে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রের সঙ্গে তথ্যচিত্র দেখানো বাধ্যতামূলক হয়।

যুদ্ধের সমাপ্তিতে এই ব্যবস্থার অবসান হল এবং স্বাধীনতার পরে তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীনে ভারত সরকার কর্তৃক Films Divisions' গড়ে ওঠে। এই সরকারী তথ্যচিত্র বিভাগ নিজেদের ছবি তৈরী করা ছাড়াও বাইরে থেকে বেসরকারী স্বাধীন চিত্র নির্মাতাদের কাছ থেকেও তথ্যচিত্র ক্রয় করেন। ফিল্মস ডিভিসনের তত্ত্বাবধানের বাইরে এককভাবে যাঁরা স্বকীয় প্রযোজনায় ছবি নির্মাণ করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন ভি, পি. পাথে, পলজিলস্‌ রাজবনস্‌ খান্না, হরিসাধন দাসগুপ্ত, এন. আর. ইশার, স্বর্গত শুকদেব, এঁদের তৈরী Mahatma Gandhi, The Golden River, Along the Jamuna (পাথে) 'India's Struggle for National Shippings', A Tiny Thing Brings Death', Village in Travancore (পলজিলস্‌) Gautam the Buddha' (রাজবনস্‌ খান্না) পাঁচথুপি (হরিসাধন দাসগুপ্ত) 'Mayurakshai Dam (ইশার) India 67 (শুকদেব), ইত্যাদি ছবিগুলো নানাদিক থেকে স্মরণীয় হয়ে আছে। গত দু'দশকের কিছু বেশী, ভারতীয় তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটা নোতুন পদক্ষেপের লক্ষণ দেখা গেছে। স্বদেশে এবং বিদেশে অনেকগুলি ভারতীয় তথ্যচিত্র নির্মাণসৌষ্ঠবে পুরস্কৃত হয়েছে। মহাবল্লীপুরম (১৯৫৩) The Spirit of Loom (১৯৫৪) 'Spring Comes to Kashmir, (১৯৫৫), 'Magic of the Mountains' (১৯৫৫) 'খাজুরাহো' (১৯৫৬) 'Look to the Sky' (১৯৫৭) 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৫৮) এইসব ছবিগুলো বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক প্রকরণে উৎকৃষ্টতার দাবী রাখে। প্রখ্যাত ভারতীয় চিত্রকর এম. এফ. হুসেন তাঁর 'Through the Eyes of a Painter' ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণশিল্পের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটি বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণভল্লুক পুরস্কার অর্জন করে।

ভারতীয় তথ্যচিত্র নির্মাণের শিল্পেতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ', 'সিকিম' এবং 'Bala' এবং 'The Inner Eye" ছবিগুলো সিনেমার প্রকরণ সৌন্দর্যে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ডকুমেণ্টারী ছবি অর্থে যে কেবল তথ্যভিত্তিক বিষয়বস্তুর নিরস বিবরণ নয়, বস্তু ও জীবনের প্রামাণিকতাই নয়, তথ্যচিত্রও যে নির্মাণ সৌকর্যে অসাধারণ শিল্পের স্তরে উন্নীত হতে পারে, সত্যজিতের তথ্যচিত্রগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই মুহূর্তে এমন কিছু তথ্যচিত্রের নাম স্মরণে আসছে যার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিন্যাস প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্রের পর্যায়ে পড়ে। বুনুয়েলের 'Land without Bread' ডকুমেণ্টারী ছবিটি এক অনবদ্য দলিল।

এ ছবিতে বৃন্ময়েল এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের চরম দুর্দশাগ্রস্ত জীবন জীবিকার বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরেছেন যা ঐ অঞ্চলের দলিল হয়েও এক অসাধারণ শিল্পে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফরাসী চিত্র নির্মাতা আলাঁ রেণের 'Night and the Fog' তথ্যচিত্রে রেনে অসাধারণ নৈপুণ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বন্দী শিবিরের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। অনবদ্য ভংগিতে রেনের এ ছবিতে বন্দীশিবিরের বিভিন্ন অধ্যায়ের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। কখনো মনোক্রোম, কখনো ষ্টক শটস আর অতীত বর্তমানের অসংখ্য ধারাবাহিকতায়, অসংখ্য দলিল চিত্রের সমন্বয়ে এ ছবি এক অবিস্মরণীয় তথ্যচিত্রের মর্যাদা অর্জন করেছে।

তথ্যচিত্রের আধারে মানুষের জীবনের অবিকল রূপ ফুটে ওঠে। মানুষের দৈনন্দিন কর্মের আর ঘর্মের বিশ্বস্ত ইতিহাস বিবৃত হয় চলচ্চিত্র স্রষ্টার পর্যবেক্ষণের গভীরতায়। এ গোত্রের ছবিতে কোনো ভ্রান্ত প্রত্যয়ের স্থান নেই। কাহিনীচিত্রের নির্মিতিতে স্রষ্টার কমকল্পনা বাস্তবোচিত হয়ে ওঠার জন্য যে রূপের আশ্রয় নেয়, তথ্যচিত্রের শরীর সীমায় স্রষ্টার তথ্যনিষ্ঠা সেখানে ক্যামেরার অকাট্য প্রামাণিকতায় একান্ত বাস্তব জীবনের ইতিহাস রচনা করে। তথ্যচিত্র নির্মাণ প্রকল্পে তাই এক অর্থে চলচ্চিত্রকারের স্বকীয় ধ্যান ধারণা বিশ্বাস ও মতবাদ প্রকাশের একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই বিদেশের বিভিন্ন স্থানে তথ্যচিত্র আন্দোলনের পশ্চাতে একাধারে মহাযুদ্ধ, অন্য প্রান্তে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা সমাধানের বাসনা ইন্ধন যোগান দিয়েছিল। এখনো স্বদেশে এবং বিদেশে তথ্যচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অসংখ্য বিষয়বস্তুর প্রামাণ্য পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। এ কালে তথ্যচিত্র নির্মাণ ব্যাপারটি বহুলাংশে সিনেমার বিশিষ্ট শিল্প রীতির তুলনায় দূরদর্শনের বিশিষ্ট প্রকরণের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ছে। কেননা ১৬ মিলি মিটারের ছবি নির্মাণের বিশেষ সুবিধা এক্ষেত্রে তথ্যচিত্র তৈরীর শিল্পরীতিতে প্রভূত স্বাধীনতা দান করেছে। আর তাই ছোট ছোট প্রচেষ্টায় ১৬ মিলি মিটারের ছবিতে আমাদের চার পাশের পৃথিবীর অসংখ্য অজানা তথ্যচিত্র ও শব্দের সমাহারে বিশ্বের অস্তিত্ব, মানবসভ্যতার জীবন ও সংকটের চেহারা তুলে ধরছে। এর প্রতি আমাদের আগ্রহ ও সচেতনতা তাই সিনেমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার খাতিরেই অত্যন্ত জরুরী, তাই যখন এদেশী নিবন্ধকার মন্তব্য করেন "For, documentary is, perhaps, one possibility in our country for a meaningfull Cinema" আমরা একমত না হয়ে পারি না।

শর্ট ফিল্ম : একটি শিল্প জিজ্ঞাসা

"অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।"

কথাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট শাখার চরিত্রনিয়ামক শিল্পরূপ ও রীতি সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় মনস্বী কবির উক্তি উক্ত চরণে বিধৃত। সেই আদিম কালের মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থানের সূচনালগ্নে যে ঘটনা বর্ণনার অপরিণত প্রকাশকাল থেকে সুগ্রথিত কাহিনী কথনের আকার নিয়েছিল, তারই পরিণত ফসল ছোট গল্প। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, বাক্যের পর বাক্য গ্রন্থনে যে বিবরণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন অভিজ্ঞানের মুক্তোকে বাচনিক রূপকল্পে গল্পের সংজ্ঞায় চিহ্নিত করেছে, তারই এক অভিনব রূপ আবিষ্কৃত হ'ল ঐতিহাস অধ্যুষিত অসংখ্য গুহা আর মন্দিরের গায়ে। দীর্ঘ কালাশ্রিত বাচনিক রূপকল্প এই বিশ শতকের প্রথম পাদে জন্ম দিয়েছিল দৃশ্যকল্প রূপকাব্যের। সেই অর্বাচীন চলমান দৃশ্যকাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কমকল্পনায় 'চলচ্চিত্র' এই নতুন বিশেষণে সম্মানিত। এক থেকে দশ, দশ থেকে শত সহস্র—সৃষ্টির চলিষ্ণুতায় অসংখ্য রূপকার নির্মাণ করলেন অসংখ্য ছবি। প্রাথমিক আত্মপ্রকাশে সেই ছবির সময়সীমা ছিল (Running time) সীমিত। কিছু খণ্ড মুহূর্ত কোন বিশেষ ঘটনা বা কাহিনীর অংশ মাত্র ছিল তার শরীর সংস্থান। সময় আর পরিশ্রম—অর্থ আর জনপ্রিয়তার ভাবগত সংমিশ্রণে শুরু হ'ল পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র। এ শিল্পের আকস্মিক বিকাশ শিল্পমনস্ক মানুষদের উদ্ভাবনা শক্তির চূড়ান্ত উদ্যমের ফল। সমগ্র বিশ্বের দক্ষ রূপকারদের হাতে চলচ্চিত্র নামক শিল্পটি এক অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক শিল্পরীতিতে নিজের আসন পাকা করে নিল। আধুনিক শিল্পচর্চা ও গবেষণায় তার স্থান হ'ল 'দশম আত্মজ' রূপে।

এক এক যুগে এক এক রূপকারের হাতে অনুসন্ধান আর নির্মিতিতে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনের সময়সীমা বেড়েছে, কমেছে, কখনো বা অতি দীর্ঘ প্রসৃতি তার নতুন শিল্পরূপ নির্মাণ করেছে।

কাহিনীচিত্র থেকে প্রামাণিক তথ্যচিত্র, তার থেকে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভাবাত্মক চিত্র, সেই সঙ্গে হাতে আঁকা কার্টুনচিত্র। এ সবই চলচ্চিত্র শিল্পশাখার অন্তর্ভুক্ত।

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু ক্ষুদ্র চিত্র নির্মিত হয়েছে। কোনটি কেবল প্রামাণিক তথ্যসমলিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে, কোনটিতে কোন ছোট গল্পের অংশ বিবৃত হয়েছে, কোনোটি গল্পের ভঙ্গিতে কোন বক্তব্য প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছে, আবার কোনটিতে হয়তো কেবল জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা। রূপ আর রীতিতে অভিনব হয়ে ওঠার চেষ্টা সব রূপকারের মধ্যেই বিদ্যমান্। কিন্তু প্রকাশ মাধ্যমের প্রাকরণিক প্রয়োগ নির্বিশেষে সব নির্মাণই শিল্প হয়ে ওঠে না। যেখানে উৎকৃষ্ট শিল্পের আভাস থাকে তার মধ্যে নিটোল গঠনকৌশলের সামঞ্জস্য দুর্লক্ষ্য নয়। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ক্ষুদ্র চিত্র নির্মাণের জন্মলগ্নটি নিশ্চিত তারিখের দ্বারা চিহ্নিত করা এই মুহূর্তে সম্ভব না হলেও প্রবল স্বাধিকারে তার নির্দিষ্ট শিল্প আসনটিকে শিল্পের ক্ষেত্রে কেউ উপেক্ষা করতে পারবেন না। ১৯০৩-এ নির্মিত পোর্টারের The Great Train Robbery থেকে শুরু করে গ্রিফিথের অল্প দৈর্ঘ্যের বহু ছবি, চাপলিনের অসংখ্য ক্ষুদ্র চিত্র, ম্যাক্ সেনেটের ক্ষুদ্র চিত্র, ১৯৪৪-এ তৈরী মায়া ডেরেনের অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ছোট ছবি At Land এইসব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে শিল্প নির্মিতির দিগন্ত উন্মোচিত করে গেছে। দীর্ঘ সাত দশক ধরে অনমনীয় সাধনা আর চূড়ান্ত শিল্পকল্পনার সাফল্যে আজ চলচ্চিত্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিশালী শিল্পমাধ্যমরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। সমাজ থেকে ইতিহাস, অর্থনীতি থেকে দর্শন, বিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞানের গভীর গভীরতর স্তর পরিক্রমায় চলচ্চিত্রের বিস্ময়কর অভিযান অনলস সাধনায় নিয়োজিত। শতাধিক মিনিটের ছবি থেকে এই সত্তর দশকে এক মিনিটের ছবি নির্মাণেও রূপদক্ষের নিপুণ কলাকৈবল্য-মনীষার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। গ্রিফিথের Birth of a Nation ও Intolerance-এর মতো সুদীর্ঘ সময়ের ছবির সঙ্গে হাল আমলের পরীক্ষামূলক স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির কোন তুলনা চলে না। তবুও গ্রিফিথ সেইকালে বসে যে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রামাণিক তথ্যের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছিলেন, এ কালের তথ্যচিত্র নির্মাতা বা পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্র চিত্র নির্মাতাদের শিল্পসংগঠনে তার অনুস্মৃতি খুব অল্পই চোখে পড়ে। গ্রিফিথের দীর্ঘ সময়ের দলিল চিত্রের সঙ্গে তাঁর ছোট ছোট গল্পভিত্তিক ছবির যে সম্পর্ক ছিল, এ কালের দীর্ঘ কাহিনীচিত্রের সঙ্গে শিল্পোন্নত স্বল্প দৈর্ঘ্যের পরীক্ষামূলক ছবির সম্পর্কটাও অনেকটা তেমনি। মার্কিন গল্পকার এডগার এ্যালান পো ছোট গল্পের সাংগঠন রীতি প্রসঙ্গে যে 'One Pre-established design'-এর উল্লেখ করেছিলেন,

এ কালের বহু উৎকৃষ্ট বিদেশী Short film-এর মধ্যে তার ব্যঞ্জনা খুঁজে পাওয়া যাবে। যদিও 'শর্ট ফিল্ম' এই সংজ্ঞায় বর্তমানে ডকুমেন্টারি ছবিকেও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তবু ঠিক শিল্পগত তাৎপর্যে কেবল প্রামাণিক ক্ষুদ্র চিত্রই নয়, ছোট গল্পের কণামাত্র সম্বল ক'রে 'বিন্দুর মধ্যে সিন্দুর স্বাদ' দেবার আগ্রহে এ কালের বিশ্বের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন চলছে। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশে পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্র চিত্র নির্মাণের শিল্পবাসনা প্রবল আকার ধারণ করেছে। "A Novel is not a novel because it exceeds a certain number of words, but by virtue of its intrinsic stylistic law. The same must hold true for the short film and the short story. শিল্প সমালোচকের এ ব্যাখ্যা বস্তুতঃ শর্ট ফিল্ম ও ছোট গল্পের শিল্পসাদৃশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। বাইরের ভাববস্তুতে না হলেও অন্তর্নিহিত মন্ময় (Subjective) কল্পনায় ছোট গল্প আর শর্ট ফিল্মের আত্মিক সংযোগ অস্বীকার করা যায় না। একটা রসঘন নিবিড় মুহূর্তের অনবদ্য বিশ্লেষণে যেমন ছোট গল্পের শরীর সংগঠন শিল্পরূপ পায়, কয়েক মিনিটের চলমান দৃশ্যসজ্জায়, অসংখ্য ছোট ছোট চলন্ত ফ্রেমের চিত্রভাসে তেমনি একটি ক্ষুদ্র চিত্র চূড়ান্ত নন্দনের স্তরে উপনীত হয়।

একালে বিশ্বের সর্বত্র ছোট পরীক্ষামূলক ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে আঁকা কার্টুন ছবির একটা বিশেষ মান দাঁড়িয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে অনান্য প্রতিভাশালী চিত্রকর ও পরিচালক ওয়াল্টার ডিজনীর অবদান ও প্রভাব বিশেষ তাৎপর্যে স্বীকৃত হয়। পঞ্চাশের দশকে ডিজনীর এনিমেটেড ছবির সাফল্য ও জনপ্রিয়তা কমে আসলে উত্তরাধিকারসূত্রে কানাডার প্রখ্যাত ট্রিক ফিল্মের প্রতিভাবান্ শিল্পী নরমান ম্যাকলার্ণ, আমেরিকার গ্রিন্টব, পোলাণ্ডের জে, লেনিক প্রমুখ দক্ষ চলচ্চিত্রকারেরা ডিজনীর ক্ষয়িষ্ণু শিল্পরূপকে পুনরায় অভাবনীয় শিল্পস্তরে উন্নীত করেন। জার্মানী ভাল্‌দো ক্রিসল্ এবং হ্যারো সেন্ট এই এনিমেটেড শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনে চেষ্টা করেছেন। ব্রাসেলে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮ সালের দ্বিতীয় পাদে দক্ষ রূপকারের কয়েক মিনিটের এক-একটি নিটোল স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি কত অসামান্য শিল্প নির্মাণে সক্ষম—তার প্রমাণ মেলে। এ উৎসবে ২৯টি দেশের চারশো ছবির মধ্যে মোট ১৭৯টি ছবি প্রদর্শিত হয়। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিয়ত পরিবর্তমান জটিল সূত্র কিভাবে চলচ্চিত্রশিল্পের আত্মপ্রকাশেও নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, তার অসংখ্য উৎকৃষ্ট নজির

ছিল উৎসবের নানান ছবির মধ্যে। আধুনিক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চিন্তনপ্রক্রিয়া, আলোকচিত্রের নিত্য নতুন আবিষ্কার, (Optical innovations) শব্দ প্রয়োগের প্রাকরণিক উৎকর্ষ, দৃশ্যসজ্জার প্রথাবিরুদ্ধ ফ্রেমরচনা, দৃশ্যগ্রহণের প্রতীকী চেতনা—সব মিলে ছন্দ ও শরীর সংগঠনের আমূল রূপান্তরিত প্রয়োগবিধি চলচ্চিত্রের শৈল্পিক আত্ম-বিকাশে রূপদক্ষের আধুনিক স্বকালচেতনার বিস্ময়কর মননের ইতিহাস গড়েছে।

ভারতবর্ষে আমরা যে সব বিদেশী স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যে ব্রিটেন, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী, আমেরিকা, রাশিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ও কিউবার বেশকিছু উৎকৃষ্ট নিদর্শন শিল্পজিজ্ঞাসায় স্থান পাবার যোগ্য। শর্ট ফিল্মের প্রতি প্রতিভাবান্ শিল্পীদের আকৃষ্ট করার প্রকল্পে এবং বিভিন্ন দেশের শিল্পমানসের মাধ্যমে একটা নিবিড় সৌহার্দ্য গড়ে তোলার বাসনায় পশ্চিম জার্মানীর ওবের হোসেনে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। এ পর্যন্ত আমরা কয়েকবার কলকাতায় ওবের হোসেনের কিছু কিছু নির্বাচিত পুরস্কৃত ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছি। প্রথম উৎসব হয়েছিল ১৯৫৮ সালে, দ্বিতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল ১৯৫৮-এ। এতে কলকাতায় ওবের হোসেনের যে কটি ছবি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে পোল্যাণ্ড, কিউবা, ফ্রান্স, আমেরিকা, যুগোশ্লোভিয়া, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী প্রভৃতি দেশের কয়েকটি শর্ট ফিল্ম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কিউবার L.B.J. এবং ফিডারেল জার্মানীর The First Lesson দুটি ছবি এক বিশিষ্ট ভঙ্গিতে শিল্পজিজ্ঞাসার স্তর অতিক্রম করেছে। The First Lesson ছবিটি দেখতে দেখতে পূর্বে প্রদর্শিত যুগোশ্লোভিয়ার The Play ক্ষুদ্র চিত্রটির প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়। নিছক খেলার ছলে সহজ ভঙ্গিতে শিশুমনের অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে দুটি ছবিই চূড়ান্ত গভীরতায় উপনীত। বর্তমান বিশ্বের আত্মিক সংকট, জাতিবৈরিতা আর নিদারুণ ধ্বংসলীলার বীভৎস রূপকে পরিচালক-দ্বয় অভিনব আঙ্গিকে কাব্যময় করে তুলেছেন। এই ধরনের আর একটি ছবি যুগোশ্লোভিয়ার The Fly। কার্টুন চিত্র যে কত অসাধারণ শিল্পের স্তরে উন্নীত হতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই ছবিটি। একটি স্ফুলিঙ্গের মতো মুহূর্তকে আশ্রয় করে কি গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা যায়, এ ছবির পরিচালক নিপুণভাবে তা দেখিয়েছেন। সামাজিক পটভূমিকায় আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব আর স্বৈরাচারের কাব্যময় রূপ পোলানস্কির অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'The Fat one and the Thin one'। পোল্যাণ্ডের পরিচালক হলেও এ ছবিটি পরিচালক

ফ্রান্সের প্রয়োজনায় নির্মাণ করেছেন। পোলানস্কির সহজ সরল ভঙ্গি এ ছবির শিল্পবক্তব্যাকে বেদনাময় সামাজিক উপকথায় রূপান্তরিত করেছে। ১৯৫৮ সালে নির্মিত পোলানিস্কর প্রথম ক্ষুদ্র চিত্র 'Two Men and a Wardrobe'-এর শিল্পসংগঠনেও পরিচালক মানুষ আর তার সমাজের পারস্পরিক বোঝাপড়াকে কিছুটা আলো আঁধারির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন।

আঙ্গিকের অভিনব কৌশল ও আলোকচিত্রের নানান আবিষ্কারকে আশ্রয় করে কয়েকটি বিশিষ্ট ছবি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। ১৯৫৮-তে প্রদর্শিত জিরি ট্রংকার পাপেট ফিল্ম The Hand, পোলিশ কার্টুন চিত্র The Chair ও আমেরিকার ট্রিকশট ফিল্ম The Clay, ক্ষুদ্র চলচ্চিত্র নির্মাণের শিল্প সম্ভাবনাকে সুদৃঢ় করেছে।

শিল্পের সব শাখায় যেমন বিমূর্ত ভাবকল্পনা একটা বিশেষ তাৎপর্যে স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করে, আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমেও সেই বিমূর্ত প্রতীকীচেতনা ও দুরূহ কাল্পনিক মানসবিহার দর্শকদের ভাবনাকে গভীর চিন্তার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। কলকাতায় প্রদর্শিত ওবের হোসেন নির্বাচিত মার্কিন শর্ট 'Help : My snowman's Down', চেকোশ্লোভাকিয়ার 'The Apartment' ও A Quiet Week at Home' ইত্যাদি কয়েকটি ছবি কিছুটা দুর্বোধ্য বিমূর্ততায় বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। পরীক্ষামূলক ছবির সৃজনশীল কারুকর্মে যেখানে চলচ্চিত্রের Immense possibility নিহিত আছে, সেক্ষেত্রে যে কোন জটিল দুর্বোধ্য ভাব ব্যঞ্জনা শিল্পের নিরিখে নির্বিবাদে গ্রহণীয়।

এই প্রসঙ্গে একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষণীয় যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ফ্রান্সে ক্ষুদ্র চিত্র নির্মাণের একটা প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। কারণস্বরূপ শিল্পের অগ্রগতিতে সরকারী বাধ্যকতা ও সহযোগিতা একান্তভাবে ক্রিয়াশীল। আমাদের দেশে যেখানে দশ বছরেও একটি ভাল স্বল্পদৈর্ঘ্যের শিল্পোন্নত ছবি তৈরীর কোন রেওয়াজ নেই সেক্ষেত্রে ফ্রান্সে ১৯৪০-এর পর থেকেই সরকারীভাবে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি প্রদর্শনের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ জারি করা হয়। শুধু তাই নয়, ১৯৫৫ সালে এক নতুন আইন বিধিবদ্ধ ক'রে প্রত্যেক পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফরাসী চিত্রের সঙ্গে একটি ক'রে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখানোর ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। ফলতঃ নবীন ও প্রবীণ সব পরিচালকেরাই ক্ষুদ্র চিত্র নির্মাণের পথকে প্রশস্ত ক'রে দিয়েছেন। কয়েকটি ফরাসী শর্ট ফিল্মের নাম করা যায়, যেগুলি শিল্পনৈপুণ্যে আলোচিত হবার দাবি রাখে। Accelerate Motion-এ গৃহীত ক্ষুদ্র চিত্র 'Renaissance',

কার্টুন চিত্র 'The Escargots', ছোট কাহিনী চিত্র 'The Incident at the Owlcreek' প্রামণিক ক্ষুদ্র চিত্র 'Le Regard Picasso' এগুলি ফরাসী চলচ্চিত্রের পরীক্ষামূলক প্রয়াসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বলা বাহুল্য যে আধুনিক ফ্রান্সের অধিকাংশ শর্ট ফিল্ম নির্মাতারা শৈল্পিক প্রকরণ ও অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের বিশ দশকের প্রথিতযশ শিল্পী ও কবি আঁদ্রে ব্রেত ও অনুগামীদের অতিবাস্তববাদ-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বস্তুতঃ এ কালের তরুণ ফরাসী চিত্রপরিচালকেরা ক্ষুদ্র চিত্রের নির্মাণে কম-বেশী সকলেই ঐ বিশ শতকী আভা গার্দীয় স্যুররিয়ালিস্টদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। ভৌগোলিক সীমাতিক্রমী সাগরপারের প্রায় সব প্রতীচ্য দেশেই চলেছে দীর্ঘ চিত্রের সমপর্যায়ে সীমিত সময়ের স্বল্পপরিসর চলচ্চিত্র নির্মাণ-এর দারুণ প্রতিযোগিতা। অথচ করুণ শিল্প-সংকটে ব্যধিগ্রস্ত ভারতের চিত্রজগতে এখনও সাবান আর লাঙলের বিবর্ণ বিজ্ঞাপণ। অথচ এই একই উপকরণে যে কতো অসামান্য শিল্পোজ্জ্বল হীরকখণ্ড তৈরী হয়ে ওঠে—আমাদের সরকারী-মহলের শিল্পশাসকরা সে সম্বন্ধে আদিম যুগের ধারণা পোষন করেন। হুসেনের 'through the eyes of A Painter'—এর মতো একাধিক শর্ট ফিল্ম এখনও এ দেশে তৈরী হবার মতো পরিবেশ এল না।

কিন্তু তবু উপসংহারে নির্বিশেষ শিল্পজিজ্ঞাসার একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সংশয় জাগে যে দীর্ঘ-সময় বিলম্বিত পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রের বিস্তৃত পট-ভূমিকার মতো চিত্রের সীমিত সময়সীমায় প্রথম শ্রেণীর চিত্র নির্মাতার শিল্প-সাফল্য কতটুকু। এ দেশে তেমনভাবে কোন বড় পরিচালক ক্ষুদ্র চিত্র নির্মাণে আগ্রহী নন। অথচ প্রতীচ্যের অনেক প্রখ্যাত শিল্পীই ছোট ছবির মধ্যেও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বের সব শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্মাতাই যদি কিছু পরিমাণে এই ক্ষুদ্র চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটু সক্রিয় হন, তবে চলচ্চিত্রের শিল্পসম্ভাবনা আরো সুদৃঢ় হতে পারে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মহৎ কবি গল্পকার ও চিত্রকরের মতো পরীক্ষামূলক ছোট ছবির নির্মাতাও শিল্পদ্রষ্টা। তিনিও মানেন যে এক লহমার গাঢ় অনুভূতি দিয়ে ক্ষণিকের দৃশ্য-সজ্জায় বাণীর অগম্য বোধ-সৃজন সম্ভব। তিনি প্রকৃত শিল্পী, রূপকার, তাঁর অনুভবে এ সত্য অজানা নয়—

> "টুক্‌রো টুক্‌রো অংশে ছড়ানো, ছিন্ন নয়,
> একটি সুতোয় সবই আবদ্ধ জীবনময়।
> ধরবে সে সব জীবনের গতি ও বিশ্বের।
> দুঃখ-সুখের, বিরতির কথা—সংগ্রামের।"

ওয়েস্টার্ণ

দৃশ্যটার শুরু এই রকম: সেকেলে আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের কোনো শহরের একটা পরিত্যক্ত রাস্তা। রাস্তার ছ'প্রান্তে ছটো মানুষ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের কোমরে ঝুলছে ছ-ঘরা পিস্তল। ছ'জনে এক পা এক পা ক'রে এগোতে থাকে। হঠাৎ একজন চিৎকার করে 'that's far enough', ছ'জনেই আবার ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। কোমরে ঝোলানো পিস্তল ছুঁতে চায় তাদের হাত। চারপাশ থমথমে। হঠাৎ ছজনেরই পিস্তল গর্জে ওঠে। একটি দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। উৎসুক শহরের লোকেরা এখন নানা জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে, মৃতদেহ ঘিরে জটলা পাকায়। ছবি শুরু হয়ে যায়। প্রথম থেকেই দর্শক অদম্য কৌতূহলে পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

চলচ্চিত্র সমালোচকেরা এই ছবির গোত্র নির্ণয়ে একে 'ওয়েস্টার্ণ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই ওয়েস্টার্ণ ছবি দীর্ঘকাল ধরে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক থেকে শুরু ক'রে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, এশিয়াবাসী এমনকি আফ্রিকান মানুষদেরও আকৃষ্ট করেছে এই রীতির ছবি। এই ওয়েস্টার্ণ পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি বিশেষ শিল্পরীতি রূপে স্বীকৃত হয়েছে। ওয়েস্টার্ণ নামটির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এক বিশিষ্ট ধরনের সিনেমার ছবি ফুটে ওঠে। ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি সেইসঙ্গে কাহিনী বিন্যাসের এক অদ্ভুত স্বকীয় স্টাইলের সমন্বয়ে ওয়েস্টার্ণ একটা চরিত্র অর্জন করেছে। এর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তাত্ত্বিক ও চলচ্চিত্রবিদ্‌রা অনেক সময় মহাকবি হোমার ও অন্যান্য মহাকবির রচনার দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন এই ওয়েস্টার্ণের মূল নিহিত আছে মধ্যযুগীয় নীতি নাটকগুলির মধ্যে। এঁদের মতে অন্যান্য উপাদানের চেয়ে ওয়াল্টার স্কট, রবার্ট লুই স্টিভেনসন ও অন্যান্য এ্যাডভেঞ্চার কাহিনীকারদের লেখাই ওয়েস্টার্ণ ছবির রূপ ও রীতি গঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। যোদ্ধা ও তাদের অভিযান এবং কিছু পরিমাণে মধ্যযুগীয়

রাজকীয় প্রেমকাহিনী ওয়েস্টার্ণ ছবির জন্ম ও বিবর্তনে সাহায্য করেছে। সেইসঙ্গে ব্রিটেনের মধ্যযুগীয় রাজা আর্থারের রোমান্সমূলক কাহিনীও অন্যভাবে এই ছবির নির্দিষ্ট চরিত্র অর্জনে সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে। মধ্যযুগীয় যোদ্ধার ভাবমূর্তিটা ধীরে ধীরে ওয়েস্টার্ণ ছবির নায়কের সঙ্গে মিশে যায়। এমনকি মধ্যযুগীয় যোদ্ধার পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনা থেকে আমরা যেমন তাদের বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করতে পারি, তেমনি 'ব্রঙ্কোবিলি এ্যাণ্ডারসন' থেকে শুরু করে 'ট্রিনিটি' নামীয় ওয়েস্টার্ণ ছবির নায়কদেরও চরিত্র ও অভিব্যক্তি সহজে চিনে নিতে পারি তাদের পোষাকের মাধ্যমে। তবে ওয়েস্টার্ণ ছবির উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী-সংঘটনের প্রত্যক্ষ উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় উনিশ শতকের অতিনাটকগুলোর মধ্যে। বস্তুতঃ মার্কিনী ওয়েস্টার্ণের রুশোধর্মী যুক্তিবাদী গঠনের সঙ্গে টেনিসনের আর্থুরিয়ান উপাদানের ঐক্যই মূলতঃ বর্বরতা ও সভ্যতা এ দুয়ের মধ্যকার সংঘাতকে ওয়েস্টার্ণ ছবির শিল্পচরিত্রে একটি স্বকীয় মাত্রা আরোপ করেছে।

আমেরিকার ইতিহাসে ১৮৯০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত এই যুগটাকে 'শ্রমসাধ্য' যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জ্যাক লণ্ডন, হ্যারল্ড বেলরাইট, স্টুয়ার্ট এডওয়ার্ড হোয়াইট, রেক্স বীচ ও অন্যান্য লেখকদের রূঢ়, পৌরুষপূর্ণ রচনায় যুগের কাঠিন্য ধরা পড়েছে। সেটা সিল স্প্যানিশ-মার্কিনী যুদ্ধের যুগ, টেডী রুজভেল্ট ও এ্যাংলোস্যাক্সনীয় সংগ্রামশীল এক দুর্দমনীয় কাল চেতনার পর্ব। তৎসমসাময়িক এই মেজাজটা ওয়েস্টার্ণ ছবিতে লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ ক'রে যেখানে ছবির সাহসী নায়ক সবসময়ে যেকোনো বিরোধীতা সত্ত্বেও শত্রুর মুখোমুখী হ'তে অবিচলিত। ১৮৯০-এর প্রথম পর্বেই শস্তা রোমাঞ্চকর উপন্যাসের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে, সেইসঙ্গে এইসব কাহিনীর নায়কদের প্রতি আকর্ষণও বিলীন হ'তে শুরু করে। পাঠকরা তখন একজন প্রকৃত বীর, সাহসী যোদ্ধার ভাবমূর্তির সন্ধান করছিল যাকে সব রকমে বিশ্বস্ত বলে মনে হয়। বস্তুতঃ ওয়েস্টার্ণ ছবির তথা-কথিত নায়ক পাঠকদের এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটায়। ফলতঃ ওয়েস্টার্ণ ছবি সিনেমার ইতিহাসে অত্যন্ত অল্পসময়ে তার সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার আসনটিকে পাকা ক'রে ফেলে। প্রাকৃতিক ও আত্মিক সীমান্তরূপে আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে মার্কিন প্রগতিশীল যুগের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। একে হাত ছাড়া করার অর্থ নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রসারে বাধা ও অস্তিত্বের সংকটকে ত্বরান্বিত করা। তাই এইকালের সাহিত্যিক রচনায়

মার্কিনী পশ্চিমমূলক বিশেষ রোমান্টিকতায় ভাস্বর। তাই কৃষিপ্রধান আমেরিকা ও শ্রমশীল আমেরিকার দ্বন্দ্ব এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ একধরনের অতীতমুখী আকুলতা ব্যাপকভাবে ওয়েস্টার্ন ছবির উত্থানে গতিসঞ্চার করে, তখন প্রকৃত ওয়েস্টার্ন উপন্যাসরূপে স্বীকৃত The Virginian (১৯০২)-এর লেখক ওয়েন উইস্টার মেষপালক নায়ক ও পুরোনো আমেরিকার পরিবেশকে প্রেম, জীবন-জীবিকা, শুভ ও অশুভের সংমিশ্রণে নোতুন ওয়েস্টার্ন কাহিনীর সূত্রপাত করলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে প্রায় দুই দশকের মধ্যে বহু লেখক অজস্র উপন্যাস রচনা করেন যার একাধিক পরবর্তীকালে সিনেমায় রূপায়িত হয়। 'দ্য ভার্জিনিয়ান' উপন্যাসের মুখবন্ধে লেখক বলেন: "What has become of the horseman, the cow-puncher, that last romantic figure upon our soil? For he was romantic, whatever he did with his might ... ...His wild kind has been among us always, since the beginning, a young man with his temptations, a hero without wings." এই আশ্চর্য সজীব বর্ণনাও ওয়েস্টার্ন ছবির মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

১৯০৩ সালে নির্মিত এডউইন পোর্টারের ১০মিনিটের ছবি 'The Great Train Robbery' চলচ্চিত্র ইতিহাসের প্রথম বর্ণনাধর্মী ওয়েস্টার্ন। জনৈক সমালোচকের মতে ১৯০৩ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নির্মিত সব ওয়েস্টার্ন ছবির কাহিনী কাঠামো এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের চেহারা উইলিয়াম স্ট্রহার্টযুগীয় অন্যান্য ছবির মতোই প্রথানুগ। স্ট্রহার্ট নিজে প্রথম যুগের ওয়েস্টার্ন ছবির জনপ্রিয় নায়ক এবং ছবির নির্মাতা ছিলেন। সমালোচকের মন্তব্যটির কিছুটা সত্য থাকলেও সাম্প্রতিকালের বেশকিছু ওয়েস্টার্ন ছবি পুরোনো রীতির বাইরে এসে আঙ্গিক ও প্রকরণে স্বকীয়তা অর্জন করেছে। তবু একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে, উইস্টারের The Virginian যেমন ওয়েস্টার্ন উপন্যাসের আদি রচনা রূপে চিহ্নিত, তেমনি পোর্টারের 'দ্য গ্রেট ট্রেনরবারি'কে সমস্ত ওয়েস্টার্ন ছবির আদি খসড়া হিসেবে গণ্য করা যায়। ছবিটি সিনেমার শুরু থেকে আজও চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষা ও ব্যাকরণের নিরিখে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১০ মিনিটের এই ছবির পরিচালক সিনেমার যে শিল্পস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। নিউজার্সির কাছে তোলা এই ছবির দৃশ্যবিভাজনে পোর্টার সিনেমা সম্পাদনার

মূল রীতিটাকে সেকালেই একটি নির্দিষ্ট রূপ দিতে পেরেছিলেন যা পরবর্তীকালে গ্রিফিথের হাতে আরো পরিণত শিল্পরূপ অর্জন করে। এই ছবির বিখ্যাত 'ব্রঙ্কোবিলি' চরিত্রটি ওয়েস্টার্ণ ছবির জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। চরিত্রটিতে অভিনয় করেছিলেন জি. এম. এ্যাণ্ডারসন যিনি অব্যবহিত পরবর্তী প্রায় চারশোটি একরীলের ওয়েস্টার্ণ ছবির নায়করূপে চিহ্নিত হয়ে ছিলেন। এই 'ব্রঙ্কোবিলি এ্যাণ্ডারসন'ই হলিউড সিনেমা শিল্পের প্রথম স্টার।

সাহিত্যিক তথা সমাজ সংস্কৃতিগত উৎস ছাড়াও ওয়েস্টার্ণ ছবির বিষয়বস্তু-রূপে কিছু প্রত্যক্ষ জীবিকার সংকটও এর পিছনে উপকরণ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৮৬৬ সালে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে এক দারুন খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল যা প্রায় মন্বন্তরে পরিণত হয়। এর প্রধান কারণ ছিল ঐ অঞ্চলের মানুষদের প্রধান খাদ্য ও জীবিকার সম্বল মাংসের চূড়ান্ত অভাব। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে টেক্সাসের মাল মজুতদাররা প্রায় পঁচিশ লক্ষ গবাদি পশুর এক বিরাট পাল নিয়ে উত্তরাঞ্চলে ক্যানসাসের রেলওয়ে জংসনের অভিমুখে এক নজিরহীন পাড়ি দিয়েছিল। এর ফলে বহুমাইল বিস্তৃত রেলপথের বিভিন্ন যায়গায় ডজ সিটি, উইচিটা এই সমস্ত গো-ব্যবসাকেন্দ্রিক নোতুন শহর গড়ে ওঠে। এই পশুর ব্যবসায় যাঁরা হঠাৎ প্রচুর মুনাফা লাভ করেন তাঁদের অনেকে গোপালন ও ব্যবসায়ে পটু ছিলেন, আর কিছু ছিলেন যাঁরা মার্কিন গৃহযুদ্ধের প্রাক্তন সৈনিক, কিছু মেক্সিকান, আর কিছু রেড ইণ্ডিয়ান ও ব্রিটিশজাতির মিশ্রণে তৈরী গোষ্ঠী। এঁরা ছিলেন প্রচণ্ড পরিশ্রমী, দুঃসাহসী এবং সৎ প্রকৃতির মানুষ। কেবল কিছু সংখ্যক ডাকাত আর বন্দুকবাজ ঠগীদস্যু এই বিরাট দলের মধ্যে ছদ্মবেশে মিশে গিয়েছিল। বেশ কিছু বছর পরে ১৮৮৩ সালে প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়। এর পরেই আসে প্রচণ্ড শীত। ১৮৮৫ সালে গোমাংসের দাম হঠাৎ ভীষণ কমে যায়। হাজার হাজার গোব্যবসায়ী এবং রাখালেরা এক দারুণ সংকটের মুখে পড়ে। এই অবস্থায় এদের অনেকে দুর্বৃত্ত, ডাকাত এবং খুনীতে পরিণত হয়। ব্যাঙ্ক, রেলস্টেশনে ডাকাতি এবং লুঠতরাজ নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধুর হাতে বন্ধুর মৃত্যু ঘটতে থাকে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের নিস্পত্তিতে বন্দুক একমাত্র হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয়। এই রকম ভয়ংকর দিনগুলিতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অপরাধী হিসেবে কুখ্যাত হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ওইয়্যাট এরাপ। ইনি ছিলেন একজন দুর্দান্ত মার্শাল। পরে আইনবিরোধী দস্যুতে পরিণত

হন। এঁর মৃত্যু ঘটে ১৯২৯ সালে আশি বছর বয়সে। এরপরে যার নাম উল্লেখ্য সে হল দুর্দান্ত ওয়াইল্ড বিল হিকক। টেক্সাসের এই বিক্ষুব্ধ মার্শাল খুব সুদর্শন ব্যক্তি। ইনি মত্তপ, বদমেজাজি এবং স্বার্থপুরুষ ছিলেন। এঁর হাতে প্রায় একশোজনের মৃত্যু ঘটেছিল এবং নিজে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এরপরেই দেখা পাই ওয়েস্টার্ণের তৃতীয় বিখ্যাত গুণ্ডা 'জেসী জেমস্'-এর। ইনি ছিলেন সবচেয়ে চরম অপরাধী ব্যক্তি। অনেক বড় বড় ব্যাঙ্ক ডাকাতির নেতা হলেও ট্রেন ডাকাতিই ছিল এঁর বিশেষত্ব। সারির চতুর্থ পুরুষ 'জন ওয়েলেস্লী' মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর জীবনের প্রথম হত্যা করেন। তিন বছরের মধ্যে এই হত্যাসংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশ। এরপরেই স্মরণীয় বিখ্যাত 'বিলি দ্য কিড'। এই তরুণ দুরাত্মার বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয় নিউইয়র্কের বস্তি অঞ্চলে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত এই মানুষটি রেড ইণ্ডিয়ানসহ প্রায় একশোটি মানুষকে কাপুরুষের মতো হত্যা করে। 'বুচ ক্যাসিডি' হ'ল অপর এক কুখ্যাত ওয়েস্টার্ণ চরিত্র যিনি সকলের ভীষণ ঘৃণার পাত্র ছিলেন। ১৯০১ পর্যন্ত বুচ ক্যাসিডি অনেক ব্যাঙ্ক ও ট্রেন ডাকাতি করে এবং ঘটনাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকায় পালিয়ে যায়। এরপর যার নাম উল্লেখ্য তিনি হলেন 'ব্ল্যাকবার্ট'। ইনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় ট্রেন ডাকাতি করে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এইসব বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রই বিভিন্ন গল্পের আশ্রয়ে বারবার ওয়েস্টার্ণ ছবিতে ফিরে এসেছে। এইসব বিখ্যাত চরিত্রের সঙ্গে দর্শকরা বহু যুগ ধরে পরিচিত হয়ে আছেন। অপর দিকে ওয়েস্টার্ণের সৎ নায়কের মধ্যে আমরা যে বীরত্ব, ন্যায়, দুঃসাহসের চিত্র দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম তাতে ছবির নায়ক সর্বদাই শান্তি-শৃংখলাস্থাপকরূপেই অবতীর্ণ হতেন। নগরের বন্যতা শান্ত করে এক নোতুন ভদ্রজনোচিত পরিবেশ গড়ে তোলাই এঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যেখানে নারীরা যথোচিত মর্যাদায় গ্রহণীয় এবং শিশুরা নিরাপত্তায় মানুষ হতে পারে। তিরিশ ও চল্লিশ দশকের ওয়েস্টার্ণ ছবিতে আমরা এই ধরনের কাহিনীর বিস্তার লক্ষ্য করি। বিশ দশকের টমমিক্স, তিরিশ দশকে জেন অট্রি এবং চল্লিশ দশকে রয় রোজার্স এই ধরনের অনেক ছবিতে অভিনয় করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ওয়েস্টার্ণ ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্ররা মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম হল সৎসাহসী ন্যায়পরায়ণ নায়ক—যিনি সবরকমের অন্যায়, শোষণ ও অত্যাচার ও অপরাধের বিরুদ্ধে স্বীয় জীবন বিপন্ন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নন। এই ধরনের চরিত্রে জন ওয়েন, জেমস স্টুয়ার্ট, হেনরী

ফণ্ডা, গ্যারী কুপার, র‍্যাণ্ডলফ স্কট, জোয়েল ম্যাক্রীয়া, গ্লেন ফোর্ড, বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, রিচার্ড উইডমার্ক, রবার্ট মিচাম, গ্রেগরী পেক, চার্লটন হেস্টন কার্ক ডগলাস, রবার্ট টেলর, এ্যালান ল্যাড, ভ্যান হেফলীন, ইউলিয়াম হোল্ডেন এবং ক্লিন্ট ইস্টউড প্রমুখ অভিনেতারা বিশেষ খ্যাত হয়ে আছেন। দ্বিতীয়তঃ খলচরিত্ররূপে লী মারভিন, রিচার্ড বুন, রবার্ট রেইন, আর্থার কেনেডি, এডমণ্ড ও ব্রিয়েন, ওয়ারেন ওটস্, এ্যানটনী কুইন, লী ভ্যানক্লীফ, ক্লদ এ্যাকিন্স প্রমুখেরা চিহ্নিত হয়ে আছেন। গোশালার মালিক, নগরপাল, উপনগরপাল এবং নানা ধরনের বিশিষ্ট নাগরিক চরিত্রে চার্লস্ চিকফোর্ড, মিলার্ড মিচেল, এডগার বুচম্যান, বেন জনসন, হ্যারীক্যারে জুনিয়র, অনডি ডেভিন, জেমস্ মিলিক্যান, এলিসাবুক জুনিয়র প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রী ওয়েস্টার্ণ চলচ্চিত্রের ইতিহাস অলংকৃত করে আছেন।

ওয়েস্টার্ণ একাধারে উপকথা ও মার্কিন ইতিহাসের সংমিশ্রণে তৈরী এক অনবদ্য শিল্প নির্মিতি। এই ছবির পটভূমিতে অসংখ্য উপকরণ গ্রথিত হয়ে আছে। একদিকে সমাজ, অন্যদিকে ইতিহাস অর্থনীতি, গৃহযুদ্ধ, বাণিজ্য সভ্যতার ক্রমবিকাশ, মনস্তত্ত্ব ও আরো অনেক উপাদান একত্রে এই রীতির ছবির নিজস্ব চরিত্র গড়ে দিয়েছে। একটি শক্ত সমর্থ মানুষ একাকী ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলেছে। চারপাশের রুক্ষ প্রকৃতি, জনমনুষ্যহীন এলাকা, মরুভূমি, দিগন্ত বিথারী পাহাড়, জঙ্গল, কোথাও শীর্ণ নদী বহমান। সকাল কাটে, রাত কেটে যায়, আবার সকাল হয়, মাস কেটে যায়। মানুষটি চলেছে কোন্ এক অজানা রহস্যের সন্ধানে, পথে যাযাবরী বন্ধুত্ব, দু'একজন সঙ্গী জুটে যায়, ছন্নছাড়া রাখালদের দলে আশ্রয় মেলে, আবার চলা, কখনো পথে দস্যুদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রাম, আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বন্দুক গর্জে ওঠে, উপজাতি রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ, চলতে চলতে কোনো মফস্বল শহরে কিছুক্ষণের আস্তানা, আবার জীবিকার সন্ধানে জঙ্গল-পর্বতসংকুল নির্জন প্রান্তরে অনন্ত পাড়ি—সব মিলিয়ে ওয়েস্টার্ণ ছবির মানুষ, প্রকৃত ও কাহিনী, মার্কিন ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায়ের রোমাঞ্চকর চিত্রকে আমাদের কাছে অসীম কৌতূহলে পরম প্রিয় করে তুলেছে। ঘোড়ার পিঠে এই নিংসঙ্গ মানুষটি কে? ঐতিহাসিকের মন্তব্য 'He is central to the myth of America's last frontier'। আসলে ওয়েস্টার্ণ ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে আমরা শ্রদ্ধা করি আবার হিংসেও করি। তার মধ্যে আমরা ক্রমোন্নত গতিময়তা চাই না,

আমরা তাকে ভালোবাসি কষ্টের প্রতিকূলতা ও অজানার বিরুদ্ধে তার জয় দেখে, ভয় ও অশুভের বিপক্ষে তার অবিচলতায়। মানুষটির এই জাতীয় জীবনধারণে তাই রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তার বন্দুকের গুলিতে তাই কেউ কেউ প্রয়োজনে প্রাণ হারায়।

১৮৫০ সালের পটভূমিতে তৈরী হাওয়ার্ড হক্স্-এর Red River (১৯৪৮) ছবিটি এক তরুণের কাহিনী যে তার প্রেম ও বর্তমান জীবিকা উপেক্ষা ক'রে উৎকৃষ্ট গোপালনের উপযোগী শহরের সন্ধানের পশ্চিমে পাড়ি জমায়। এই তরুণের চরিত্রে জন ওয়েন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই বিশিষ্ট চরিত্রটিকে ওয়েন এক অপরিহার্য উপাদান রূপে পরবর্তী বিশ বছর ধরে ওয়েস্টার্ণ ছবিতে পুনরাবৃত্ত ক'রে এসেছেন। ছবিটি এক মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে যেখানে ওয়েস্টার্ণ উপকথায় ব্যক্তি মানুষের অন্তর্মুখী গুরুত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ওয়েস্টার্ণ ছবিতে একদিকে দেখি সমষ্টিগত মানুষ যারা সাহসী কিন্তু বিভ্রান্ত, ব্যক্তিমানুষটি কিন্তু স্থৈর্য ও দক্ষতার প্রতিমূর্তি। এটা হ'ল সাধারণ প্যাটার্ণ। এই উপাদানটি ওয়েস্টার্ণ ছবিতে সর্বব্যাপী মহিমায় গৃহীত হয়ে আসছে। এবং ওয়েস্টার্ণ ছবিতে তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শৌর্যের চেয়ে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতাকে নাটকীয় রূপ দেওয়া কষ্টকর। অন্যান্য পরিচালকদের তুলনায় জন ফোর্ড'ই বিশেষ নৈপুণ্যে সমষ্টির মধ্যে এই ব্যক্তি-বিশেষের বীরত্ব এবং ব্যক্তিস্বরূপকে ছাড়িয়ে সমষ্টিকে চিত্রিত করেছেন। তাই সমালোচকের মন্তব্য: 'The traditional western has reinforced American individualism' আমাদের কাছে যথার্থ্য লাভ করে।

ওয়েস্টার্ণ ছবির দৃশ্যগত উপস্থাপনাও দীর্ঘকাল ধরে একটি রীতির আকার ধারণ করেছে। বিশ বছরের ব্যবধানে নির্মিত দুটি ছবির সূচনাদৃশ্য লক্ষ্য করলেই এটা স্পষ্ট হবে। ১৯৪১-এ-তৈরী ফ্রিৎস্ ল্যাঙের The Western Union এবং ১৯৪৮-তে তৈরী রবার্ট অল্ডরিচের The Last Sunset দুটি ছবির শুরু হুবহু একরকমের। দুটো ছবিতেই অশ্বপৃষ্ঠে একজন নিঃসঙ্গ মানুষকে দ্রুত প্রান্তর পেরিয়ে যেতে দেখি আমরা। দুটো ছবিতেই অনুর্বর প্রদেশাঞ্চল, নির্মম প্রস্তরাকীর্ণ এক উজ্জ্বল পটভূমি হিসেবে উপস্থিত। ল্যাঙ যেখানে ভালো গল্প ও আকর্ষণীয় নায়ক নিয়ে সার্থক হয়েছেন, পরিচালক অল্ডরিচ সেখানে কষ্টকল্পিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ততটা সার্থক নন। কিন্তু দুজনেই একই স্তরের দৃশ্য দিয়ে ছবি শুরু করেছেন এবং দুটি ছবিরই প্রথম কয়েক

মিনিটেই নাটকীয় ঘটনাবেগের প্রতি আমাদের কৌতূহল নিবদ্ধ হয়। ধূলি-ধূসরিত বিরাট প্রান্তর, ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকা আগাছা, কোথাও ছড়ানো ছিটানো পাথর, কোথাও মাইলের পর মাইল বিস্তৃত রুক্ষ পর্বতশ্রেণী—সব মিলিয়ে ওয়েস্টার্ণ ছবির একটি বিশেষ চিত্রগত রূঢ় পৌরুষ ছবির শুরু থেকেই দর্শকদের মনে এক রোমান্টিক আমেজ তৈরী ক'রে দেয়। চলচ্চিত্রের গতিময়তায় এই পশ্চিমসীমান্ত একেবারে জীবন্ত বাস্তবতায় ধরা দিয়েছে। প্রাকৃতিক অবস্থান এতই অপরিহার্য উপাদান যে প্রান্তর অতিক্রমী যাত্রা, প্রকৃতির সহজ বন্যতা, কঠিন ভূখণ্ড, খরা, বালি ও তুষার ঝড় ইত্যাদি এক অদ্ভুত প্রচণ্ডতার জন্ম দিয়েছে। কুমারী মাটির বুক চিরে নয়া বসতি স্থাপন করা রেড ইণ্ডিয়ানদের শান্ত করতে গিয়ে আক্রমণ, যুদ্ধবিগ্রহ, সেই সঙ্গে কষ্টসহিষ্ণুতা, দুর্ভোগ আর আক্রমণের ঘটনা প্রাকৃতিক উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওয়েস্টার্ণ ছবির অবিচ্ছেদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। How the West was won (১৯৬৩) ছবিতে দেখা গেছে যে কি অসীম দুঃসাহস আর বীরত্বে, অসংখ্য প্রতিরোধের মাধ্যমে আমেরিকানরা পশ্চিম সামান্তে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ছবিটি সিনেরামা পদ্ধতিতে তোলা প্রথম ওয়েস্টার্ণ ছবি। অনেক পরিচালক তাদের ছবিতে স্ব স্ব প্রিয় অঞ্চলকে স্মরণীয় করে গেছেন যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জন ফোর্ডের 'মনুমেন্ট ভ্যালী'। আরিজোনা ও উটার গগনচুম্বী লালপাথরের খাড়াই পাহাড় মরুভূমির রুক্ষ মাটি ফুঁড়ে প্রহরীর মতো দৃশ্যমান। এই অদ্ভুত রহস্যমণ্ডিত জনহীন প্রান্তরেই জন ফোর্ড তাঁর ১৩টি সবাক ওয়েস্টার্ণের মধ্যে ৮টি ছবি নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে বাড্ বয়েত্তিচার দক্ষিণ পশ্চিম দিকের উষর অঞ্চলের মসৃণ পাহাড়ী ভূখণ্ডকে তাঁর ছবিতে ব্যঞ্জনাময় ক'রে রূপ দিয়েছেন। যেমন তাঁর Ride Lone some (১৯৪৯) The Cimaron Kid (১৯৫১) Horizon West (১৯৫২) ইত্যাদি। অন্যদিকে এ্যানটনী মান তাঁর ছবিতে তৃণভূমি ও মনোরম পাহাড়ী প্রদেশের কখনো অনাবৃত কখনো বা বরফাবৃত প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন। মানের The Nakcd Spur (১৯৫৩) The Last Frontier (১৯৫৬) Man of the West (১৯৫৮) Cimaron (১৯৬০) ইত্যাদি ছবিগুলো বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হয়ে আছে। মার্কিন দেশের অতীতের এই পশ্চিমাঞ্চলের ভূদৃশ্যাবলীর মধ্যে যে অমেয় পৌরুষের চিত্র ব্যক্ত হয়েছে তা বিশেষ অর্থেই সেখানকার সংগ্রামশীল মানুষগুলোর টিকে থাকার সঙ্গে জড়িত। প্রকৃতি ও

মানুষের সংগ্রাম তাই ওয়েস্টার্ণ ছবিতে একে অপরের পরিপূরক রূপে কাজ করেছে। সাম্প্রতিক কালে তোলা কয়েকটি নবধর্মী ওয়েস্টার্ণ ছবিতে প্রকৃতি এক অনুপম কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উন্মোচিত। এই দৃষ্টিভংগির সূত্রপাত জন ফোর্ডের একাধিক ছবিতে। পিটার ফণ্ডার The Hired Hand (১৯৪৮) এক নব্য রীতির ওয়েস্টার্ণ যেখানে তিনি প্রচণ্ডতার সঙ্গে প্রাকৃতিক তন্ময়তাকে কাব্যময় করে রূপ দিয়েছেন যা একটা নোতুন অর্থ পেয়েছে। হাওয়ার্ড হক্স্ অপর স্বনামধন্য পরিচালক যাঁর ছবিতে মার্কিন পশ্চিম এক স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর চিরস্মরণীয় Red River (১৯৪৮) The Big Sky (১৯৫২ বিখ্যাত Rio Bravo (১৯৫৯) El Dorado (১৯৪৮) ইত্যাদি ছবিতে প্রকৃতি বিশিষ্ট চরিত্রে পরিণত হয়েছে। ভূখণ্ড তাই ছবিতে শক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। এই জমির ওপর নিয়ন্ত্রণের অর্থ হ'ল ব্যক্তি বিশেষের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সেইসঙ্গে সম্পদের দ্যোতক। এই দিগন্ত বিস্তৃত সীমান্তে আধিপত্য বিস্তার তাই বিশেষ ভাবেই অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস বহন করেছে যাকে ইতিহাস ও উপকথার পৃষ্ঠা থেকে পরিচালকেরা সিনেমা পর্দায় স্মরণীয় করেছেন।

বিচিত্র প্রকৃতির মতো ওয়েস্টার্ণ ছবির আর একটি অন্যতম উপাদান হ'ল ঘোড়া। জনৈক লেখক সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন: 'A Western without horses would be as intolerable as one with a cowboy weariug oxfords instead of boots'. জনফোর্ডের Stagecoach (১৯৩৯) ছবিতে ঘোড়ার গাড়ী এক অনবদ্য রূপকের আশ্রয়ে চিত্রিত। এ ছবির পরিণতিতে সমতল প্রান্তর দিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর দুরন্ত ছুটে চলার মধ্যে ফোর্ড ঘটনাগত ডিটেলকে অসীম নৈপুণ্যে ক্যামেরায় ধরেছেন। প্রদোষান্ধকারে মনুমেণ্ট ভ্যালী দিয়ে ছ-ঘোড়া বিশিষ্ট স্টেজকোচ বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলেছে এক দীর্ঘ পুরাতন বিবাদের নিষ্পত্তি করতে। সমগ্র দৃশ্য পর্যায়টিতে যেন এক মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা আরোপিত হয়েছে। ১৯৩১ সালে তৈরী এডনা ফারবার-এর এপিক ওয়েস্টার্ণ Cimaron-এর বিখ্যাত land rush সিকোয়েন্সে কয়েক শ ঘোড়ার গাড়ী ও ঘোড়ার পিঠে ধাবমান মানুষ উৎকৃষ্ট সিনেম্যাটিক দৃশ্যকল্পে স্মরণীয় হয়ে আছে। ছবিটি এখনো পর্যন্ত নির্মিত একমাত্র ওয়েস্টার্ণ যা শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য অস্কার পুরস্কারে ভূষিত। মণ্ট হেলম্যানের The Shooting (১৯৪৮) ছবিতে দিগন্তলীন মরুভূমিতে এক অজানা রহস্যের উদ্দেশ্যে তিনটি

মানুষ ধীরে ধীরে দর্শকের চোখের আড়ালে চলে যায়। সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে তাদের এই যাত্রা যেন আমাদের মোহাবিষ্ট করে। জন ফোর্ডের The Horse Soldiers (১৯৫৯) ছবিতে অশ্বপৃষ্ঠারূঢ় সৈনিকেরা মন্থর গতিতে চলেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের নীচে তাদের সিলুয়েট এক মায়াবী দৃশ্য রচনা করেছে। যদিও দৃশ্যটি সিনেমার প্রকরণের দিক, থেকে গতানুগতিক তবুও প্রয়োগের গুণে অনবদ্য। ঘোড়া ও তার সঙ্গে বন্দুকের শক্তি দুই মিলিয়ে ওয়েস্টার্ণ ছবির এক অবিসংবাদী আবেদন গড়ে উঠেছিল। ঘোড়ার দুরন্ত গতি একটা অমিত শক্তি আর প্রাণঘাতী প্রচণ্ডতার অবদমিত আকর্ষণ দীর্ঘকাল ধরে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে এসেছে। টলস্টয়ের ঐতিহাসিক রচনায় এমনকি অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণীর রোমান্সজাতীয় রচনায় ঘোড়া যে পরিমাণে গুরুত্ব পেয়েছে, ওয়েস্টার্ণ ছবিতে ঘোড়া ঠিক সেই অনুপাতেই অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কার্যকরী হয়েছে। অবশ্য প্রায় ঘোড়াবিহীন ওয়েস্টার্ণ ছবিও আমরা দেখেছি। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফ্রেড জিনেম্যান-এর High Noon (১৯৫২) এবং ফোর্ডের The Man who shot Liberty Valance (১৯৫৯)। হাই নুন ছবির শেষ দৃশ্যে আমরা কেবল ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র শহরের শেরিফের ভূমিকায় গ্যারী কুপারকে ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে দেখি। এই ধরনের ওয়েস্টার্ণকে সমালোচকরা Town Western নামে অভিহিত করেছেন।

প্রকৃত মহৎ ও উৎকৃষ্ট ওয়েস্টার্ণ ছবির দৃষ্টান্ত হিসেবে চলচ্চিত্রবিদরা যে নাম-সবাগ্রে উচ্চারণ করেন তার মধ্যে ফোর্ডের Stagecoach, পঞ্চাশ দশকের হেনরী কিং-এর The Gun fighter (১৯৫০) জিনেম্যান-এর High Noon এবং জর্জ ষ্টিভেন্স-এর Shane (১৯৫২)-এর মতো ক্ল্যাসিক ছবিগুলি বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই সবকটি ছবিতেই পরিচালকেরা অবশ্যম্ভাবী ভায়োলেন্স ও রক্তপাত এমনকি মানুষের মৃত্যুকে এক নীতিগত প্রশ্নে চিত্রিত করেছেন। এখানে ছবির নায়ক বা প্রধান চরিত্ররা যে অবস্থাতেই বন্দুক ব্যবহার করেছে, হত্যা ঘটিয়েছে, তা একান্তভাবেই ন্যায়ের জন্য এবং দুর্বলের রক্ষার জন্য। এখানে তারা অনেকটা নৈতিকতার প্রশ্নে দার্শনিক ভাবাপন্ন। তাদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব কিন্তু কোনো অর্থেই তথাকথিত ওয়েস্টার্ণ ছবির লড়াই, প্রচণ্ডতা বা বীরত্ব প্রতিপাদনের নেশা নয়। অন্যায়, অপরাধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ বিশেষ অর্থেই সৎসাহস ও সততার দ্বারা মহিমান্বিত। Shane-এর

নায়ক যে ছবির ছোট ছেলেটিকে শহর ছেড়ে যাবার সময় শেষ দৃশ্যে বলেছে : "Some like to have two guns, but one's all you need if you know how to use it···A gun is as good or as bad as the man using it". এটা ছবির moral হিসেবে কাজ করেছে। ষ্টিভেন্স কোন একটা উত্তেজনাপূর্ণ ওয়েস্টার্ণ করার জন্যই ছবিটি করেন নি, পরন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল ছবিটির মাধ্যমে মানুষের সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রবৃত্তির একটা সূক্ষ্ম দিক উন্মোচন করা। সে অর্থে তিনি বিপুলভাবে সার্থক। তাই ছবির শেষ দৃশ্যে অপরাধীদের চূড়ান্ত শাস্তি দিয়ে নায়কের শহর ছেড়ে বিদায় যেন দর্শকের বুকে বড় বেশী ক'রে বাজে। আঁধার ঘনিয়ে আসা প্রকৃতির পটভূমিতে তার departure একটা ট্র্যাজিক চেতনার রেশ রেখে যায়।

ওয়েস্টার্ণ ছবির আর একটা উপাদান হ'ল পোষাক-পরিচ্ছদ। প্রায় দেশজ বৈশিষ্ট্যের মতোই ওয়েস্টার্ণ ছবিতে চরিত্রদের পোষাক একটা অপরিহার্য মেজাজ সৃষ্টি করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ছবির ভালোমানুষ অর্থাৎ সৎ বা ন্যায়-নিষ্ঠ চরিত্ররা সাধারণতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরে এবং মাথায় থাকে সাদা টুপি। আর খল চরিত্রের গায়ে থাকে ঢিলে ঢালা নোংরা কালো পোষাক। অন্যদিকে শহরের সাধারণ মানুষেরা সাধারণ কাপড়ের পোষাকেই অভ্যস্ত যা উনিশ শতকের শেষপর্বের ঢংে তৈরী। সমাজবিরোধী চরিত্ররা সাধারণতঃ অন্যদের তুলনায় পোষাকে-আসাকে একটু কৃত্রিম। রাখালচরিত্ররা সাধারণতঃ খুব আঁটো প্যাণ্ট, বুট এবং মোটা জামা, গলায় রংচঙা বড় রুমাল এবং কোমরের বেল্টে বাঁধা ছ-ঘরা পিস্তল, মাথায় বড় আকৃতির বাঁকানো টুপি ইত্যাদি পরতে অভ্যস্ত। বন্যস্বভাবের একধরনের সত্তাবত্তার প্রতি বোদলেয়রের আকর্ষণ ছিল যাকে তিনি বলেছিলেন 'the supreme incarnation of the idea of beauty transported into material world' ও ব্যাপারটা ওয়েস্টার্ণ ছবির পোষাক পরিচ্ছদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাজ করেছে।

ওয়েস্টার্ণ ছবিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ছবিতে দু'ধরনের নারী চরিত্রেরে দেখা পাই আমরা। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে তথাকথিত, মার্জিত, সুন্দরী ভদ্রজনোচিত নায়িকা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, গো-ব্যবসায়ীর কুমারীকন্যা, স্কুলশিক্ষিকা প্রমুখেরা আছেন। দ্বিতীয় গোত্রে রয়েছে বার্, রেস্তোরা বা স্যালুনজাতীয় দোকানের পরিচারিকা ও সেখানকার নর্তকী বা নায়িকা। প্রথম শ্রেণীর মহিলারা ছবিতে মর্যাদা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে শ্রদ্ধাভাজনরূপে

চিত্রিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েরা অনেকেই বেশ্যা, খলনায়কদের শয্যাসঙ্গিনী এবং যেকোনো রকমের দুষ্কর্মের সাহায্যকারিণী। ইতিহাস বলে যে ইসাবেলা বার্ড নামে জনৈকা মহিলা ১৮৭০ সালে পশ্চিমের পর্বতসংকুল এলাকায় কয়েকশ মাইল ধীর স্থির চিত্তে ভ্রমণ করেছিলেন। কদাচিৎ দু'একজন সঙ্গী পেয়েছেন যাত্রা-পথে। কিন্তু কখনো তাঁকে পথের কষ্ট বা ভয়ে সন্ত্রস্ত হতে শোনা যায় নি। তাঁর চরিত্রের এই অজেয় মনোভাব ছবির অনেক নারী চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। Stagecoach, My darling Clamentine, Johnny Guitar, Rio Bravo, Two Rode Together, Hang them High, Killer on a Horse, El Dorabo. The Harvey Girls, Hombre, ইত্যাদি অনেক ছবিতে বিভিন্ন পরিবেশে ও নানা মানসিকতায় নারী-চরিত্ররা বিশিষ্টা হয়ে আছে। ওয়েস্টার্ণ ছবির পুরুষ ও নারীর মুখ্যতঃ তিনটি ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমগোষ্ঠী হ'ল শহর বা মফঃস্বলের মানুষ যারা সভ্যতার প্রতিনিধি। দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল সমাজবিরোধী, দস্যু, খুনী ও অপরাধীরা যারা এই প্রথম শ্রেণীকে ভয় দেখিয়েছে। তৃতীয় গোষ্ঠীতে আছে নায়কেরা যারা অপরাধ ও ও অন্যায়ের প্রতিরোধ স্বরূপ, সাহস ও বীর্যবত্তার প্রতীক। এইসব মানুষেরাই ঘুরে-ফিরে অসংখ্য ওয়েস্টার্ণ ছবির ঐতিহ্যে বিধৃত হয়ে আছে।

ওয়েস্টার্ণ কাহিনী ও চিত্রনাট্যের অজস্রপ্রসূ লেখক স্বর্গত ফ্রাঙ্ক গ্রুবার সাতটি ভাগে ওয়েস্টার্ণ ছবিকে ভাগ করেছিলেন যা এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন রেলপথ কাহিনী, গো-চারণ ও পালক কেন্দ্রিক গল্প, গবাদিপশুকেন্দ্রিক রাখালদের কাহিনী, প্রতিশোধ কাহিনী, সৈন্যবাহিনী বনাম রেড ইণ্ডিয়ানদের গল্প, সমাজবিরোধী দস্যুদের গল্প এবং নগরপাল মার্শালদের, কাহিনী। ঠিক এইভাবেই নির্মাণ প্রকরণের দিক থেকে ওয়েস্টার্ণ ছবির শিল্পরাতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শাখায় চিহ্নিত হয়ে আছে। যেমন Super Western, Epic Western, Adult Western, Satirical Western, Comedy Western, Chamber Western,Liberal Western, Sociologcal Western, Anti Western, Allegorical Western. এবং একালের পাঁচমিশেলী Spaghetti Western ও Paella Western.। ঠিক পাশাপাশি কয়েকটা সাধারণ উপাদান যেমন মদ্যপান, জুয়া, যৌনতা, ভায়োলেন্স ও অর্থনৈতিক বিবাদ ছবির বৈশিষ্ট্য-সূচকরূপে কোথাও বেশী কোথাও কমমাত্রায় গৃহীত হয়ে আসছে।

ষাট দশকের গোড়া থেকেই ওয়েস্টার্ণ ছবির একটা পালাবদল শুরু হয়। এই

২

সময় ও তৎপরবর্তী আধুনিক ছবির পরিচালকেরা তথাকথিত ওয়েস্টার্ণ ছবির বিষয়বস্তু, ইতিহাসের সত্য ও তথ্য এমনকি রীতিও প্রকরণের অনেক কিছুকে নোতুন জিজ্ঞাসায় চেনার চেষ্টা করেছেন। শুরু থেকে প্রায় চার দশকেরও বেশী ওয়েস্টার্ণ ছবিতে রেড ইণ্ডিয়ানদের কেবল অপরাধী, দস্যু ও খলচরিত্ররূপে দেখানো একটা রীতি ছিল, যেখানে আলাদা কোনো বিশিষ্টতায় তাদের চিহ্নিত করা হত না। যদিও ১৯৫০ সালে তৈরী Broken Arrow ছবিতে আমরা প্রথম রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েকে নায়িকারূপে দেখতে পেলাম। তবে প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৪-তেই প্রথম রবার্ট অল্ড্রিচ-এর Apache ছবিতে আমরা একজন রেড-ইণ্ডিয়ানকে ছবির নায়করূপে পেলাম যার মধ্যে সত্যিকারের একটা ফোর্স কাজ করেছে। নায়কের ভূমিকায় বার্ট ল্যাঙ্কাস্টারের সুন্দর অভিনয় স্মরণীয়। ওয়েস্টার্ণ ছবির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক জন ফোর্ড রেড ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত রকমের খারাপ দিকগুলো সম্বন্ধে সচেতন থাকাসত্ত্বেও মন্তব্য করেছিলেন : "They are a very dignified people—even when they are being defeated. Of course, it's not very popular in the United States. The audience like to see Indians get killed. They don't consider them as human being". জন হাস্টনের The Unforgiven (১৯৬০) ছবিতে শ্বেতাঙ্গ মার্কিন পরিবারে বোনরূপে প্রতিপালিতা এক রেডইণ্ডিয়ান মেয়েকে পরিবারের সকলে রেড-ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধতা ও আক্রমণ থেকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে। ডন সিগেলের Flaming Star (১৯৬০) ছবিতে একজন শ্বেতাঙ্গ সৎভাইরূপে মার্কিন পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। জন ফোর্ডের শেষ ওয়েস্টার্ণ Cheyenne Autumn (১৯৬০) ছবিতে রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত তাঁর অনুরাগীদের সন্তুষ্ট করেনি। এলিয়ট সিলভার স্টেইন-এর A Man Called Horse (১৯৬০) র‍্যালফ্ নেলসনের Soldier Blue (১৯৬০) এবং আর্থার পেন্-এর শিল্পসম্মত সৃষ্টি Little Big Man (১৯৬০) এই তিনটি ছবিই স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে রেডইণ্ডিয়ানদের সাংগঠনিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মর্যাদার প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আধুনিক ওয়েস্টার্ণ ছবিতে পুরোনো দিনের অবজ্ঞা ও অবহেলা নোতুন মূল্যবোধে বিচার্য হয়েছে। এক ধরনের Anti Western feeling ধীরে ধীরে চরিত্র আশ্রয় করে চিত্রিত হয়েছে। অনেকেই ভীষণ রক্তপাত ও প্রচণ্ড যুদ্ধোন্মাদনার পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত

ভায়োলেন্সের ক্ষতিকর দিকটিকে আঘাত করেছেন। মর্যাদাসম্পন্ন মানুষরূপে সাধারণ চরিত্ররা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। উপেক্ষিত মানুষ নোতুন মহিমা পেয়েছেন। মৃত্যু কত বীভৎস ও ভয়ংকর তবু বেদনাদায়ক। দর্শকদের সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছে মৃত্যুমুখে পতিত দস্যুচরিত্রের অবিসংবাদী ধ্বংসে। Valdez is coming (১৯৬০) Mante Walsh (১৯৬০) Will Penny (১৯৬০) Hombre (১৯৬০) The Professionals (১৯৬০) Bonnie and Clyde (১৯৬০) The Wild Bunch (১৯৬০) The Hired Hand (১৯৬০) High Plain Drifter (১৯৬০) Butch Cassidy and the Snudance Kid (১৯৬০) ইত্যাদি অসংখ্য আধুনিক ছবিতে পরিচালকেরা ওয়েস্টার্ণ উপকথা ও কাহিনীর তথাকথিত প্রচণ্ডতা, রক্তপাত. আদর্শমণ্ডিত রোমান্টিক অভিযান এবং ওয়েস্টার্ণ নায়কদের প্রথানুগ বীরত্ব ও সততাকে নোতুন প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন। এতাবৎ নির্মিত একমাত্র স্যাটায়ারধর্মী কমেডি ওয়েস্টার্ণ এলিয়ট সিলভারস্টেইনের Cat Ballou (১৯৬০) আশ্চর্যভাবে ওয়েস্টার্ণ ছবির শিল্পরীতিতে এক বিদ্রূপাত্মক চরিত্রে অনবদ্য দৃষ্টিতে উপস্থিত করেছে। ছবিতে এক মগুপ অভিনয়ের জন্য লী মারভিন অস্কার পুরস্কার পান। বস্তুতঃ ষাট দশকের পর থেকে ওয়েস্টার্ণ ছবিকে কোনো এক বিশেষ ফর্মুলায় ফেলা চলে না। ষাটের পরবর্তী পরিচালকেরা বিভিন্ন সময়ে ওয়েস্টার্ণ ছবির শিল্পরীতিকে নানা অভিনব আঙ্গিক প্রকরণে সমৃদ্ধ করেছেন। একদিকে বিষয়, অন্যদিকে প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে এক অনন্য সিনেম্যাটিক নির্মিতিরূপে উপস্থিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিচালক ইতালীর সারগিও লিওনে। যিনি পরবর্তীকালে অনেকের দ্বারা অনুকৃত হয়েছেন। তাঁর A Fistful of Dollars (১৯৬০) The Good, Bad and the Ugly (১৯৬০) For a Few Dollars more (১৯৬০) এবং Once Upon a Time in the West (১৯৬০) বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর ছবির নায়করূপে ইস্টউড ও লী ভ্যান ক্লীফ, উদাসীন অথচ দক্ষ বন্দুক চালিয়ে রূপে ছবির পর্দায় হত্যাকাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের চরিত্রগত এই অনুগ্রতার মাধ্যমেই তাদের বিবেকহীন ভীষণতা অদ্ভুতরূপ পরিগ্রহ করেছে যা আধুনিক ওয়েস্টার্ণ ছবির নোতুন আমদানি। তাত্ত্বিকদের মতে লিওনে ও তাঁর অনুগামীদের ছবিতে মূলতঃ ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমস্ অর্থাৎ জ্যাকোবীয়ানের সময়কার বা স্প্যানিশ রেনেশাঁসের ট্রাজেডির প্লটই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

অথরবিওরীর সমালোচকরা ক্লিংস ল্যাণ্ড, স্যামুয়েল ফুলার, বাডবয়োত্তিচার ও অনেকের মধ্যে ব্যক্তিগত দর্শন ও প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। এগুলো অনেকটা পার্সোনাল ওয়েস্টার্ণ। ওয়েস্টার্ণ-এর দুই প্রথিতযশা পরিচালক জন ফোর্ড ও হাওয়ার্ড হক্স্ যথাক্রমে অতীত ইতিহাসের 'মীথ' ও মর্যাদা ও ক্ষমতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে প্রথানুগ, ওয়েস্টার্ণ ছবি যেক্ষেত্রে মার্কিন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে পুনর্জীবিত করেছে, সেখানে আধুনিক ওয়েস্টার্ণ নানা প্রশ্ন ও সামাজিক জিজ্ঞাসায় এই ছবির দীর্ঘকালাশ্রিত ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ষাটের অন্যান্য মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের ওয়েস্টার্ণ ছবির অতীত ও সমগ্র মার্কিন ইতিহাসের বিগত দিনগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হত্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ ওয়েস্টার্ণ ছবির বিখ্যাত পাত্রপাত্রীরা কারা? কাদের ষড়যন্ত্রে জন ও রবার্ট কেনেডি, ম্যালকম এক্স, মার্টিন লুথার কিং, মেডগার এভার্স, শুভম্যান, শুয়েণার, জেরীমিলার, এ্যালিসন ক্রস প্রমুখ আমেরিকার বিখ্যাত সন্তানেরা নিহত হয়? স্যাম পেকিন্পা, রবার্ট অল্টম্যান, মন্টে হেলম্যান প্রমুখের ছবিতে এইসব প্রশ্নের উত্তরের ইংগিত আছে। আঁদ্রে বাজার মতে ওয়েস্টার্ণ হ'ল 'The American Film Par Fxcellence' যার মধ্যে মার্কিন পশ্চিম মুলুক যথাযথ ঐতিহাসিক নাটকীয়তায় বিধৃত। ওয়েস্টার্ণ ছবি কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাদ, ষড়যন্ত্র আর রক্তপাতের দুঃসাহসিক কাহিনী নয়, আমরা সংগীতমুখর ওয়েস্টার্ণ ছবিও পেয়েছি যে শ্রেণীর ছবিতে রয় রোজার্স ও জেনে অট্রি অভিনয় ক'রে বিখ্যাত হয়ে আছেন। সাম্প্রতিক ওয়েস্টার্ণের যে প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হ'ল অতিরঞ্জিত তথাকথিত ভালোমানুষ ও অতিবর্ণিত বদলোকের মধ্যে একটা সেতু রচনা করা। খারাপ অর্থে সম্পূর্ণ দুশ্চরিত্র আর ভালো অর্থে দোষহীন একেবারে ভালোমানুষ এমন ধারণায় প্রশ্ন তুলেছেন একালের ওয়েস্টার্ণ নির্মাতারা। তাঁরা সবকিছু ঘটনার পিছনে সামাজিক উৎস সন্ধান করতে চেয়েছেন, তাই ওয়েস্টার্ণ ছবির আধুনিক শিল্পশরীরে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। পরিচালক পেকিনপা'র মন্তব্যটি লক্ষ্যণীয়: 'The Western is a universal frame within which it is possible to comment on today অথচ পুরোনো যুগের পরিচালক হাওয়ার্ড হক্সের কথায় To me a Western is gunplay and horses.... They are about adventurous life and sudden death. It is

most dramatic thing you can do. দুই যুগের দুই বিশেষ প্রতিনিধির এই পরস্পর পৃথক মন্তব্য থেকে বোঝা যায় আধুনিক চলচ্চিত্রের ধারায় ওয়েস্টার্ণ ছবি মানুষের জীবনজীবিকার ও ভয়ংকর অস্তিত্ব রক্ষার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে নোতুনভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছে যা প্রথম যুগের ওয়েস্টার্ণে যথেষ্ট লভ্য ছিল না।

অতীত আমেরিকার যে উপকথাময় চেহারা আমরা ওয়েস্টার্ণ ছবিতে গৌরবান্বিতরূপে প্রকাশ হ'তে দেখি, প্রকৃত ইতিহাসে তার সব সূত্রের সন্ধান হয়তো নেই। তবু ওয়েস্টার্ণ ছবিতে আমেরিকা তার ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তি, গণতন্ত্র, প্রেম-বিদ্বেষ, সহাবস্থান ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের সমন্বয়ে এক বিশিষ্ট শিল্প নির্মিতির স্বরূপে খ্যাত হয়ে আছে। শিল্প-সমালোচকের মতে সুকুমার কলার ইতিহাসে 'ক্রুশবিদ্ধ যীশু' এবং 'ম্যাডোনা ও শিশু' যেমন বহুযুগ ধরে বিভিন্ন সময়ে শিল্পীদের অসংখ্য প্রতীক ও ভাব-মূর্তিতে নোতুন নোতুন ব্যাখ্যার পথ খুলে দিয়েছে, ওয়েস্টার্ণ শিল্পরীতিও তেমনি বহুকাল ধরে অসংখ্য পরিচালককে নোতুন নোতুন বিষয় ও আঙ্গিকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

একটি মানুষ, একটি ঘোড়া ও একটি বন্দুক। সেই শুরুতেও ছিল আধুনিক ছবিতেও আছে। কিন্তু অর্থ ও ব্যঞ্জনা রূপান্তরিত হয়েছে। একই উপাদান ও পটভূমি আজকের কালে পৌঁছে নোতুন দ্যোতনা পেয়েছে। ওয়েস্টার্ণ-এর শ্রেষ্ঠ পরিচালক জন ফোর্ডের দেশজ ধ্যানধারণা, সিনেমার দক্ষ টেকনিক অসংখ্য ছবিতে বহুলভাবে অনুসৃত হলেও, তারই কুড়ি বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ পরিচালক বাড বয়োত্তিচারের ছবি আমাদের ভিন্ন স্বাদের গল্প, স্টাইল ও প্রবণতার প্রতি আকৃষ্ট করে।

ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহা, ফলশ্রুতিস্বরূপ অযুত রক্তপাত, ন্যায়-অন্যায়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, বীরত্ব ও সাহসের ঐতিহাসিক উপাখ্যান— সব মিলিয়ে ওয়েস্টার্ণ আজও আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে আছে। ফরাসী সমালোচকদের ভোটে স্বীকৃত এতাবৎ নির্মিত শ্রেষ্ঠ ওয়েস্টার্ণ রূপে চিহ্নিত নিকোলাস রে' পরিচালিত Jonny Guitar (১৯৫৪) ও পঞ্চাশের Vera Cruz, Gunfight At O.K. Coral-এর শ্বাসরুদ্ধকারী বন্দুকের লড়াই থেকে শুরু করে হাল আমলের তৈরী জোসুয়া লোগান-এর Paint Your Wagon (১৯৬০) রবার্ট অল্ডরিচের Sam Whisky (১৯৬০) এর মতো সংগীতমুখর

কমেডি ওয়েস্টার্ণ কিংবা পেকিন্‌পার রক্তাপ্লুত অভিনব Wild Bunch, সেই-সঙ্গে হেনরী হ্যাথওয়ের True Grit, পিটার ফণ্ডার কাব্যধর্মী Hired Hand বয়োস্তিচার ও লিওনের নোতুন ধরনের ছবি দীর্ঘকাল প্রস্তুত ওয়েস্টার্ণ কাহিনীর মহিমাকে নানামুখী ভাবনায় স্মরণীয় করেছে।

আর টেলিভিশনের যুগে এসেও অসংখ্য ওয়েস্টার্ণ তৈরী হয়ে চলেছে, যার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ডেল রবার্টসন টেলিভিশন থেকে প্রতি বছর Wyatt Erap ছবির জন্য ৩,৫০,০০০ পাউণ্ড উপার্জন করেন। হাগ ফ্যাব্রিয়ন নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য পান ২০০,০০০ পাউণ্ড, সেখানে ইতিহাসের প্রকৃত মানুষটি মার্শল Wyatt Erap সারা জীবনে কখনো একসঙ্গে এত টাকা চোখেই দেখেননি। ১৯৭১-এর ১৮ই অক্টোবর আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেরাল্ড লুন চিকাগোর American Academy of Paediatrics-এর বার্ষিক সভায় অদ্ভুত বিবরণ পেশ করেন। তাতে উল্লিখিত হয় যে সাধারণ মার্কিন নাগরিক তাঁদের জীবনের বিনিদ্র সময়ের শতকরা ৬৪ ভাগ টেলিভিশন দেখে কাটান। ১৪ বছর বয়সের মধ্যেই একটি মার্কিন বালক টেলিভিশনে ছবিতে ১৮০০০ জন মানুষকে নানাভাবে খুন হতে দেখে। হাইস্কুল ছেড়ে আসার মধ্যেই সে টেলি-ভিশনে প্রায় ৩৫০,০০০টি কমার্সিয়াল ছবি দেখে ফেলে। আর মৃত্যুকালে হিসেব করলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় দীর্ঘ দশটি বছর। ব্রিটেন ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের শিশুরা টেলিভিশন ও সিনেমার মাধ্যমে প্রচুর ভায়োলেন্স ও অপরাধমূলক ছবির সঙ্গে পরিচিত হয় যার মধ্যে মার্কিন দেশের ছবি বিশেষ প্রভাবশালী। মার্কিন ওয়েস্টার্ণ-এর এই প্রচণ্ডতা, হিংস্রতার শিল্পরূপ কেন এত জনপ্রিয়; এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে মানুষের আদিম স্বভাবের কেন্দ্রে। একদিকে মানুষের সহজাত অবদমিত প্রতিশোধস্পৃহা এইসব ছবির মধ্যে প্রতি-চ্ছায়ার মতো এক ধরনের আনন্দ পায়, অন্যদিকে মনস্তাত্বিক প্রতিফলনরূপে হৃদয়াবৃত্তিতে জন্মসূত্রে যাযাবরী মানুষ শহরের চাঞ্চল্য, ভাড় আর একঘেয়েমি থেকে মুক্তি আকাঙ্খায় ওয়েস্টার্ণ ছবির ভবঘুরে, দুঃসাহসিক চরিত্র ও তাদের রোমাঞ্চকর কার্যকলাপকে ভালো না বেসে পারে না। ওয়েস্টার্ণ ছবির প্রখ্যাত সমালোচক ফিলিপ ফ্রেঞ্চের অনবদ্য ব্যাখ্যা আমাদের আবার নোতুন করে এই শিল্পরীতির কাঠামো ও তত্ত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ক'রে তোলে। "The Western is a great garb-bag, a hungry cuckoo of a genre, a

voracious bastard of a form, open equally to visionaries and opportunities, ready to seize anything that's in the air from Juvenile delinquency to ecology. Yet deopite this, or in some ways because of it, one of things the Western is always about is America rewriting and reinterpreting her own past however honestly or dishonestly it may be done."

প্রকৃত চলচ্চিত্রের দিকে

চলমান দৃশ্যসজ্জায় বস্তুজগতের হুবহু প্রতিফলন, ক্রম-অন্বিত অসংখ্য গতিময় ছবির পরিণতিতে এক অখণ্ড জীবনরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের পারম্পর্যে জগৎ ও জীবনের বস্তুসত্য উন্মোচন। প্রবাহিত সময়ের অনুক্রমে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের মনস্তাত্ত্বিক প্রতীতি। শিল্পের এই আশ্চর্য চরিত্র বৈশিষ্ট্যে চলচ্চিত্র আজ বিশ্বমানুষের চিন্তা চেতনার নিকট আত্মীয়। বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ পদ্ধতির বিস্ময়কর প্রযুক্তি ও স্রষ্টার উন্মেষশালিনী ভাবনায় বিধৃত এ শিল্প বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পমাধ্যম। একই সঙ্গে এ শিল্পের 'সৃষ্টিশীল' কথাটির শব্দার্থগত ও দার্শনিক সংশ্লেষ নিয়ে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রানুরাগীরা ভাবিত। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শব্দ-সংগীত-আলোকচিত্রের সমন্বয়ে গঠিত নির্মিতি সর্বক্ষেত্রে 'প্রকৃত চলচ্চিত্র' নয়। আসলে প্রাথমিকভাবে একটি উৎকৃষ্ট ছবির বিচার বিশ্লেষণে তার আঙ্গিক ও প্রকরণের প্রতি সমালোচকগণের অধিক আকর্ষণই প্রায়ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের প্রকৃত চরিত্র অনুসন্ধানে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বিষয় ও আঙ্গিকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সত্যটিই সব শিল্পের প্রাণস্বরূপ। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। জটিল বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পমাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও এ শিল্পে স্রষ্টার স্বকীয় বোধ ও মননের সুষ্ঠ অন্বয় একান্ত কাম্য। কেবল প্রাযুক্তিক কলা কৌশলের নৈপুণ্য নয়, বিষয় ও রীতির সুচিন্তিত রূপনির্মাণে স্রষ্টার শিল্পপ্রজ্ঞা তাই বিশেষভাবে প্রার্থিত। সব দৃষ্টিগ্রাহ্য মাধ্যমকে শিল্প দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে তার সবকটি উপকরণকে সুসমঞ্জসভাবে প্রকরণের মাধ্যমে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। এবং এখানে সময় ও সময়হীনতা, সঙ্গতি, বৈপরীত্য, সুসমতা, ছন্দ ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপার এই ধরনের গতিময় শিল্পমাধ্যমে জড়িয়ে আছে। অন্য শিল্পশাখার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে কোনো কোনো বস্তু এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যা অনেকক্ষেত্রে কবিতার চিত্রকল্পের সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু এই ধরনের সাদৃশ্য কখনোই আক্ষরিক অর্থে চূড়ান্ত নয়। সিনেমার চিত্রকল্পের সৃজনশীল সম্ভাবনার বিন্যাস আমাদের

কাছে এত অল্প পরিচিত এবং অল্প আবিষ্কৃত যে তার সঙ্গে অন্য শিল্প-শাখার সমধর্মী ইঙ্গিত আবিষ্কার এখনও অনেকটা দুরূহ। একথা অনস্বীকার্য যে চলচ্চিত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পমাধ্যমরূপে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও এই শিল্পের এখনও শতবর্ষ পূর্ণ হয়নি এবং এখনও এ মাধ্যম পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেনি। আজও একে অন্যান্য শিল্পশাখার কাছ থেকে প্রয়োজনমতো ছোটখাট উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। আজও চলচ্চিত্রের আলোচনার ক্ষেত্রে তার দৃশ্যগ্রাহ্য মানের গুরুত্বটাই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। অবশ্য একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে আকর্ষণীয় আলোকচিত্র, ক্যামেরার অসাধারণ দৃষ্টিকোণ রচনা, ক্যামেরার গতি সঞ্চালন ইত্যাদি একত্রীকরণের চলমান দৃশ্যসজ্জাই খাঁটি চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে। সমস্যাটি হ'ল চলচ্চিত্রের সামগ্রিক দৃশ্যকল্পনাকে চলচ্চিত্রের চলিষ্ণু সময়ের মধ্যে যুক্তিযুক্তভাবে নির্মাণ করা যার মধ্য দিয়ে একটা পরিপূর্ণ অর্থবহ শিল্পের জন্ম হয়, যা বস্তুজগতের চিত্রময় প্রতীতি হয়েও একান্ত বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনানুগ। তাই স্বাভাবিকভাবেই মানবসভ্যতার সুপ্রাচীন প্রকাশমাধ্যম, সাহিত্য ও নাটকের ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এই আশ্চর্য শিল্পমাধ্যমের গতিময় সৃষ্টিগ্রাহ্য ভাষার বিবর্তনের উপর অনেকটা গুরুত্ব এসে পড়ে। অন্যান্য শিল্পের অনুকৃতি নয় স্বীকরনের নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষায় এ শিল্পের অভিনব চরিত্র অর্জন। সেক্ষেত্রে এই শিল্পমাধ্যমের সহজাত সম্ভাবনার অধ্যয়নে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রয়োজন। সেটাই হবে খাঁটি চলচ্চিত্র উপলব্ধির প্রকৃষ্ট উপায়: প্রসঙ্গতঃ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের প্রাথমিক স্তরে এই পদ্ধতির অর্থকে 'চলচ্চিত্র' এই সজ্ঞার আক্ষরিক স্বরূপেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে চিত্র কিন্তু চিত্রকল্পের অর্থেই গৃহীত। তাই চলচ্চিত্রে চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক চিত্রকল্পের মধ্যেকার অনুষঙ্গী শিল্পসম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট খুব সাধারণ ক্রিয়াও অসাধারণ ব্যঞ্জনায় আকর্ষণীয়ভাবে সিনেমার নিজস্ব ভাষায় চিত্রিত হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যবহারিক জগতের বাস্তব সংঘটন ও তার লৌকিক ও মনস্তাত্ত্বিক গতির সমস্ত রকমের বিস্তার ও ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ঘটলে তবেই একজন প্রকৃত চলচ্চিত্রকারের পক্ষে আমাদের চারপাশের বস্তুজগতের সত্যকে ছবির পর্দায় ব্যঞ্জনাময় করে তোলা সম্ভব। এ শিল্পে তাই সময়ের বিস্তার প্রথম ও প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। কবি সি, ডে, লিউইস তাঁর 'Overtures to Death' কবিতায় সিনেমা দেখার অভ্যাসটিকে কটাক্ষ করেছিলেন:

Enter the dream-house, brothers and sisters,
leaving your debts asleep ; your history at the door.
This is the home for heroes,
and this loving Darkness a fur you can afford.

চলচ্চিত্র মাধ্যমটির জন্মলগ্নে তাকে কেবল প্রমোদ আর মনোরঞ্জন রূপেই ভাবা হ'ত। চলচ্চিত্র দেখার আত্মতৃপ্তি তখন অনেকটাই দিবাস্বপ্নের মতো ছিল। এখন এ শিল্প মাধ্যম সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পনির্মিতি রূপে পরিগণিত। এর শিল্পকৌলীন্য আজ সারা বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষের বিপুল বিস্ময়ে বিধৃত। যদিও চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে প্রভূত অর্থলগ্নীর ব্যাপারটা প্রথমাবধি জড়িত আছে তবু প্রকৃত চলচ্চিত্র, অর্থাৎ খাঁটি সিনেমা প্রযোজনা ও প্রদর্শনের স্থানগুলি আজ আর dream house নয়। সেখানে প্রতিনিয়ত মানব জীবনের অস্তিত্ব সংকটের ইতিহাস রচিত হচ্ছে। এ এমনই এক শিল্পরূপ এমনই এক প্রকাশ মাধ্যম যে "The most abstract sort of meditation, economics, psychology, metaphysics, ideas, passions are all within its capacity. In fact we can say that these ideas and these visions of the world are such today that only the movies can express them." পৃথিবীর সর্বত্র চলচ্চিত্রের ভাষা ও ব্যাকরণ, ভাব ও বিন্যাস নিয়ে নিরন্তন প্রশ্ন চলেছে। গভীর মনন ও জিজ্ঞাসায় এর শিল্প সম্ভাবনা ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু নিরাসক্ত আলস্যে, চর্চাহীন নির্বোধ ঔদাসীন্যে এ দেশের দর্শকসমাজ চলচ্চিত্রের শিল্পসত্যের কাছেও পৌঁছতে পারছেন না। চলচ্চিত্র যেহেতু একটি প্রকাশ মাধ্যম, স্বকীয় গুণেই যেহেতু এটি একালের শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিগণিত, তাই এ শিল্পের প্রতি আমাদের দর্শকদের আরো সচেতনতা আমরা দাবী করি। আমাদের এ দাবী অমূলক নয়।

সময়, বিচ্ছিন্নতা ও চলচ্চিত্র

খণ্ড থেকে পূর্ণে, সসীম থেকে অনন্তের বিস্তৃতিতে সময় প্রবহমান। সময় যেহেতু কোনো কালে, কোনো মুহূর্তে স্থিতধী হতে পারে না, তাই ক্রমচলিষ্ণু সময় প্রবাহের প্রতি পল অনুপলকে নিয়েই পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পআঙ্গিকের কারবার। আজ যাকে 'আজ' অর্থাৎ 'বর্তমান' বলে জানি কিছুদিন পরেই তা গতদিন বা পুরাতনের গহ্বরে নিমজ্জমান হবে। তখন তা কেবল স্মৃতি। আর আজকের মধুর সায়ন্তনে উদার উন্মুক্ত প্রান্তরে বসে যাকে 'অনাগত' বলে কল্পনা করছি কয়েকদিন গত হলেই তা তখন রূপ নেবে বর্তমানে। অর্থাৎ এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে সময় কেবল অনাগতের দিকেই মুখ রেখে চলেছে। পিছনে তাকাবার তার সময় নেই। কারণ সে থামলে :

তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।

পৃথিবীর সব শিল্পমাধ্যমেই এই স্থানকালের (Space and time) একটা সমন্বয় প্রতিফলিত। অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে তুলনায় চলচ্চিত্র বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও সময়ের ব্যবহারে, স্থানকালের চলিষ্ণুতা নির্ণয়ে চলচ্চিত্র বিশ্বের যে কোনো শিল্পের চেয়ে বিস্ময়ের উপাদান সংগ্রহ করেছে। এ ব্যাপারটা চলচ্চিত্রশিল্পের জন্মলগ্নেই প্রতিষ্ঠিত সূত্ররূপে দেখা দিয়েছিল।

আমাদের প্রাত্যহিক জগতের যে অভিজ্ঞানে আমরা অভ্যস্ত, তা একান্তভাবেই প্রাকৃত বস্তুসমূহের সংস্পর্শে গঠিত যথাযথ স্থান ও কালের এক অন্বিত রূপমাত্র। তার স্বরূপতা ও অভিন্নতাও জড়জগতের সংস্পৃষ্ট ব্যাপারাদির অনিবার্য ফলশ্রুতি। অর্থাৎ রোজকার কর্মপ্রবাহে (Time and action) আমাদের যা উপলব্ধ, তা তন্নিষ্ঠভাবেই 'As they are' এর অনুলিপি ছাড়া আর কিছু নয়। এবং এই 'As they are' অর্থাৎ 'Naturality' যখন আমাদের কম-কল্পনায়, প্রাকৃতজগৎ, অনুধ্যানজগৎ, নবরূপায়ণে আবদ্ধ হয়, তখন তা As they ought to be অর্থাৎ 'Reality'র সংজ্ঞায় অভিহিত

হবে। এখানে একটা কথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে প্রকৃত সময় (Real Time) ও চলচ্চিত্রে প্রতিভাসিত সময়প্রবাহের মধ্যে স্থানকালগত একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান বিদ্যমান। কারণ বাস্তবজগতের সময়-গতির কোনো মুহূর্তের কোনো অনুঅংশেই আমরা সর্বাল্পসময়ের জন্যও স্থির হতে পারি না বা তাকে ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু চলচ্চিত্রে আমরা কোনো ঘটনাক্রমের বিলম্বিত বা অতিক্রুত সময়প্রবাহকে মনের মতন করে ব্যবহার করতে পারি, পর্যবেক্ষণ করতে পারি। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে স্পষ্টতঃই আমরা সময়কে যথেচ্ছভাবে নিজেদের খেয়ালখুশিমত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ত্রিবিধ পরিক্রমার যে কোনো একটি থেকে অপরটিতে সঞ্চালিত করতে পারি। অর্থাৎ চলচ্চিত্রে 'সময়'-এর ব্যবহার স্রষ্টার ইচ্ছার প্রকোষ্ঠে বন্দী।

অন্য যে কোনো শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে তুলনায় চলচ্চিত্রের গতিশীলতায় সময়ের অভিক্ষেপ আশ্চর্য যান্ত্রিক কুশলতায় প্রতীয়মান হয়। বিস্মিত হতে হয় বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় কীর্তির দক্ষতায়। যে সময়কে কোনোক্রমেই পৃথিবীর কোনোকালেই স্থিতধী হতে দেখা যায়নি সেই সময়প্রবাহকে চলতি বর্তমান থেকে সংঘটিত কালে, সংঘটিত কাল থেকে অনাগত কালের সম্ভাব্য ঘটমান সময়ে চলচ্চিত্র অতি সাবলীলভাবে অগণিত মানুষকে, তার সমগ্র সত্তাকে নিয়ে যেতে সক্ষম। চিত্রশিল্পে সময় ও স্থানগত যে ঐক্য প্রতিফলিত তা চূড়ান্ত ভাবেই স্থিতিস্থাপক (Static) অর্থাৎ একটি চিত্র যে সময়কে, যে স্থান ও পাত্র পাত্রীকে তার সমগ্র ফ্রেমে আবদ্ধ করে, তা সেই বিশেষ মুহূর্তে সংঘটিত পরিবেশের একটি চিরকালীন রূপ। 'মোনালিসার হাসি' বা 'লাস্ট সাপার'-এর পরিবেশ ও কালগত অনুভূতি ছবিদুটি অঙ্কনকালে দা ভিঞ্চির মনে কেমন ভাবে প্রতিমায়িত হয়েছিল, তা শুধু ছবি দুটোর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকালে বোঝা যাবে না। যেটা বোঝা যাবে সেটা শুধু দ্রষ্টার তাৎক্ষণিক দৃষ্টি অভিক্ষেপ ও মননের মিশ্রিত এক কল্পরূপ। কেননা যেহেতু আমরা দা ভিঞ্চিকে ছবি দুটি অঙ্কনরত অবস্থায় চলমানভাবে দেখতে পাচ্ছি না। দা ভিঞ্চি যে কালে, যে পরিবেশে বসে ছবি এঁকেছিলেন, সেকাল ও পরিবেশ ছবিদুটিকে ছেড়ে তাদের ফ্রেমের বাইরে এসে আমাদের বোধে প্রত্যক্ষ হতে পারছে না। চলচ্চিত্রে এই অত্যাশ্চর্য সুযোগটা বর্তমান। কেননা একটি চলচ্চিত্র বহুদিনের সংঘটিত প্রামাণিক তথ্যকেও তার সঞ্চরণশক্তি দিয়ে দর্শককে মুহূর্তের মধ্যে সেই স্থান-কাল-পাত্র কেন্দ্রিক ক্রিয়াশীলতায় পৌঁছে দিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

তাণ্ডবে, বোমাবর্ষণে হিরোশিমা-নাগাসাকির অগণিত মানুষ কেমনভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল আজও আমরা অন্ধকার ঘরে প্রয়োজন হলে হুবহু সেই সংঘটিতক্রিয়াকে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করতে পারি, যা কিনা সেই সময়ে তোলা চলমান আলোকচিত্রের প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রক্ষিত আছে। অর্থাৎ "The film maker dissects the painter's work, organised in spatial immobility, and transforms it into a moving temporal unity formed by cutting, montage, and camera movement."

অ্যালফ্‌ সাজোবার্গ পরিচালিত Miss Julie ছবিতে নায়িকা জুলি তার বাবার ভৃত্য জীনের কর্ত্রী হয়। রাত্রে তারা তাদের শৈশবজীবনের স্মৃতিচারণায় পরস্পর মগ্ন থাকে। ছবিতে একটি দৃশ্য আছে যেখানে বালক জীন আপেল চুরির জন্য পিছনে তাড়া খায়, তখন ক্যামেরা প্যান করে বয়স্ক জীন ও জুলিকে সেই একই বাগানে একসঙ্গে বেড়ানো অবস্থায় দেখায়। অর্থাৎ একই দৃশ্যে আপেল চুরির জন্য বালক জীনের তাড়া খাওয়া যা অতীত সময়ের দ্যোতক এবং তারই সঙ্গে পরিণতবয়স্ক জীন ও জুলির একই বাগানে ভ্রমণ অর্থাৎ চলতি ও বর্তমানকে একীভূত ক'রে দর্শকদের স্মৃতিরোমাঞ্চ ও প্রবাহিত বর্তমানের মাধুর্যের স্বাদ দেয়। সাহিত্যের প্রক্ষেপিত সময়ের বর্ণনাকে চলচ্চিত্রে পেতে গেলে কতগুলো অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিকতা মেনে নিতে হয়। অবশ্য যে স্বাভাবিকতা কেবলমাত্র মাধ্যমগত ভিন্নতার ফলেই চলচ্চিত্রের অনুষঙ্গী উপাদানরূপে প্রতিভাত। সাহিত্যে বর্ণিত কালের ব্যবধান বা স্থান ও পাত্র-পাত্রী আচরণের তাৎক্ষণিক ভেদ-অভেদ চলচ্চিত্র তার এক বিশেষ রীতিতে আত্মস্থ ক'রে তাকে নবরূপায়ণে স্রষ্টার সামনে এনে উপস্থিত করে। জেম্‌স্‌ জয়েস তাঁর বিখ্যাত 'ইউলিসিস্‌' উপন্যাস ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন প্রত্যূষ থেকে পরের দিন প্রত্যূষ পর্যন্ত ব্লুম্‌ নামক এক ব্যক্তির সমগ্র একদিনের অর্থহীন বিক্ষিপ্ত শহর-পরিভ্রমণের ছবি এঁকেছেন। শহরের নানান মানুষের নানান ক্রিয়া, নানা মুহূর্তে শহরের বিভিন্ন পরিবেশে ব্লুমের নতুন নতুন অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ২৪ ঘণ্টার ইতিহাস রচিত হয়েছে এই প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী 'ইউলিসিস্‌' উপন্যাসে। যে চলচ্চিত্রকার এই অসামান্য সাহিত্যকর্মকে চলচ্চিত্রায়ণে রূপ দিতে সচেষ্ট হবেন তাঁকে প্রথমেই যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে তাহল উপন্যাসে বর্ণিত সময়সীমা। এটা স্থির সত্য যে উক্ত উপন্যাসে বিবৃত ২৪ ঘণ্টার কালসীমা চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত নির্দিষ্ট দু' ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টার অনধিক

সময়ের বিস্তৃতিতেই স্থান পাবে। এবং সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্র তার রীতির ব্যাকরণ অনুযায়ী cut, intercut, montage, flashback ইত্যাদির সাহায্যে আমাদের সামনে যে একদিনের (২৪ ঘণ্টা) ঘটনাক্রমকে তুলে ধরবে, তা চলচ্চিত্রশিল্পের বিধিত ঐ দুঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যেই অন্বিত হবে।

প্রাকৃত জগতের সময় অনুধ্যানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাই তুলনায় চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত 'সময়'-এর উপলব্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। বাস্তবজগতের সময়প্রবাহ, যা কেবলি স্থানকাল-পাত্রের সংঘটিত ক্রিয়ার সঙ্গে সমান ছন্দে গ্রথিত, তার ব্যবহার বিশেষ ভাবেই চলচ্চিত্রে 'অকালশিল্প' রীতিতে আবদ্ধ। এক কালের মহাপ্রতাপশালী ভারতসম্রাট সাজাহান তাঁর তীব্র প্রেমাতিশয্য ত্যাগ ক'রে কালের শূন্যতায় হারিয়ে গিয়েছিলেন। কবির কথায় :

"প্রিয়া তারে রাখিল না
রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।"

অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতের একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক, প্রতিষ্ঠিত সূত্র অনুযায়ী সম্রাট সাজাহানকে সব বন্ধন, সব আকর্ষণ ছেড়ে 'অনাগত'র নিঃসীমতায় হারিয়ে যেতে হয়েছে। কেননা এই চলে যাওয়াতেই পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সত্য বিধৃত। অথচ বিস্ময় সেইখানেই, যেখানে একটি চলচ্চিত্র যেকোন যুগের, যেকোনো পল-অনুপলের, যেকোনো পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমাদের চোখের সামনে একাধিকবার হুবহু তুলে ধরতে সমর্থ। উপরন্তু 'স্থানিক সময়' যেমন, তেমনি 'মন্ময় সময়,-এর ব্যবহারেও চলচ্চিত্রের ক্ষমতা অসীম। 'মন্ময় সময়' অর্থাৎ কোনো বিশেষ পরিবেশে বসে ছবির পাত্র পাত্রী যখন স্মৃতিচারণায় রত, তখন পরিচালক ইচ্ছা করলে পাত্র-পাত্রীর সেই তাৎক্ষণিক চিন্তার (present Continuous) পথ বেয়ে তাদের স্মৃতির সংঘটিত পরিবেশে (Past activities) নিয়ে যেতে পারেন, যাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় 'Flash-back' বলা হয়। অনেক সময় প্রত্যক্ষ cut ব্যবহার করেও present থেকে সংঘটিত প্রবাহমান কালে (past Continuous) চলচ্চিত্র তার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে। উদাহরণ স্বরূপ রেনের 'Hiroshima Mon Amour' ছবিটির কথা উল্লেখ্য। ছবিটিতে পরিচালক সময় সময় হিরোশিমা শহর থেকে সরাসরি Cut ও Intercut প্রয়োগ করে নায়িকার স্মৃতি অবলম্বনে ফ্রান্সের নেভার্স শহরে চলে গেছেন, কখনো যুদ্ধের বীভৎস রূপ থেকে নায়িকার প্রাক্তন প্রেমচেতনায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

অথচ এরই পাশাপাশি পরিচালক একটি ঘটমান সময়ের প্রবাহিত অনুক্রমকেও অনুসরণ করেছেন এবং দর্শকদের সামনে তার অনুলিপি তুলে ধরেছেন। এখানে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চলচ্চিত্রে চিত্রিত এই ধরনের সংঘটিত কাল ও পরিবেশেও দর্শকদের সামনে প্রবহমান সময় অর্থাৎ Preseent Continuous রূপে প্রতিভাত হয়। যার জন্য বলা হয় 'The Film has no tense'। আসলে চলচ্চিত্রের নির্ধারিত কালসীমায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলে মিশে একাকার। প্যাভেল কোহট পরিচালিত চেক চলচ্চিত্র 'Seven days a week'-এ নায়িকা জেন্কীর ক্রমঅন্বিত সাতদিনের ঘটনাক্রম রূপ পেয়েছে। একাকী নায়িকা কিভাবে তার মুক্ত সাতটি সন্ধ্যা তার বন্ধু মিরেকের অনুপস্থিতিতে প্যারাগুয়ের পথে পথে কাটিয়েছে তার বর্ণনা দু'ঘণ্টার অনধিক উক্ত ছবিটিতে স্থান পেয়েছে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, সাতদিনের সাতটি সন্ধ্যার সময় অনুক্রম, বিশেষ প্রয়োজনেই এবং চলচ্চিত্রের বিশেষ 'সীমাবদ্ধ রীতি'তে ছবিটির ঐ অনধিক দু ঘণ্টার কালসীমায় আবদ্ধ। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে কথিত 'সীমাবদ্ধ রীতি'টাই চলচ্চিত্রকে নন্দনতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মাধ্যম রূপে গড়ে উঠতে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে চলচ্চিত্রের বিশ্বজনীন ইতিবৃত্তে এমন কতকগুলো ছবি তৈরী হয়েছে যেগুলোতে প্রদর্শিত 'সময়সীমা' ব্যবহারিক জগতের সময় প্রবাহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে। উদাহরণ রূপে 'The Rope', 'High Noon,' 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ইত্যাদি স্মরণ করা যেতে পারে।

গ্রিফিথ, তাঁর 'Intolerance' ও 'Birth of a Nation, ছবিতে ঐতিহাসিক যুগকে, বিশেষ বিশেষ মুহূর্তকে, মানুষের পারিপার্শ্বিকতার সাময়িক চেতনাকে অনুপম করছেন চলচ্চিত্রের ঐ পূর্বকথিত নির্দিষ্ট কালসীমার বন্ধনে। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের details বর্ণনার রূপ প্রত্যক্ষ করায় দর্শকরা কোনো বিচ্ছিন্নতা বা পরিবর্জন খুঁজে পান নি। সেখানেও পরিচালক তাঁর স্বকীয় শিল্পরীতিতে সময়কে, যুগ ও তার পরিবেশ ব্যবহার করেছেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী, যে ব্যাকরণ বিশেষ ভাবেই বিজ্ঞানের স্নেহ ও প্রীতিতে ক্রমউন্নত। পরিচ্ছেদ থেকে অন্য পরিচ্ছেদে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, সময়ের একটি বিশিষ্ট পল থেকে ভিন্ন অনুপলে সঞ্চরণের জন্য সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান যেমন 'chapter', সরঞ্জাম ও যানবাহনের সাহায্য গ্রহণ করে, চলচ্চিত্র একযুগ থেকে যুগান্তরে, সময় থেকে সময়হীনতায়, মুহূর্ত থেকে অনন্তের

অখণ্ডতায় অতিক্রান্ত গমন করতে পারে, তার Cut, Intercut, Montage. Mix, ইত্যাদি কৌশলের সাহায্যে।

আসলে চলচ্চিত্র আমাদের চাক্ষুষ জগতের সর্বপ্রকার রূপকল্পকে, তার স্থিতি ও চলৎ-শক্তিকে মহাশূন্যের অপরিমাপ্য অখণ্ডতায় নিয়ে যায়। কোনো বিশেষ মুহূর্তের প্রতি বা পরিবেশের প্রতি তার পক্ষপাত বেশী নয়। সবকিছু ঘটমান কার্যকলাপকে সে নিজের বিশিষ্ট 'কাল' অনুযায়ী 'চিরকালীন' সংজ্ঞায় গ্রথিত করে। চলচ্চিত্রের এই অনন্য সময়বর্ণার চারুত্ব লক্ষ্য করে জনৈক ফরাসী সমালোচক যে উক্তি করেছিলেন চলচ্চিত্রের নান্দনিক আলোচনায় তা মূল্যবান হয়ে থাকবে। তাঁর কথা : It is also an art of time depending on succession and the rest of its beauty depends on the duration and relationship of its images।

চলচ্চিত্র : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার মনস্তত্ত্ব

নিঃসঙ্গতা ভাসে নির্নিমেষে,
নীল ঘুমে তার স্বয়ম্বর,
সমুদ্রের নিস্তব্ধ প্রহর
নিস্তরঙ্গ, নাকি এ আবেশে
অন্তরঙ্গে নিঃসঙ্গতা মেশে

ওপরের লাইনগুলো পড়লে মন নির্জনতায় ভ'রে ওঠে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু সব মানুষই যে কোনো না কোনো বিশেষ মুহূর্তে নিঃসঙ্গ হতে চায় এটা নিঃসন্দেহ। আর তার এই নিঃসঙ্গতার প্রার্থনা অনেকাংশেই সাময়িক নির্জনতার আকাঙ্ক্ষা। ব্যাপারটাকে একটু বিশদ করা যাক। যে মানুষ কেবল কোলাহল, সহস্র মানুষের সঙ্গলাভ ক'রে বেড়ে উঠেছে, বিশিষ্ট দুঃখ, মানস যন্ত্রণা, হৃদয়বৃত্তির আবেগপ্রবণ মুহূর্তে একা থাকার জন্য তারও ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যাবে। আর সেই বিশেষ মুহূর্তে সে কিছু আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পোষণ করবেই। এর কারণ-স্বরূপ একটা সত্যই বর্তমান, তা হ'ল আমরা অত্যন্ত বেশীরকম পরস্পরের দেয়া নেয়ার মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই। আবার যে মানুষ শুধুমাত্র নিঃসঙ্গতা পিয়াসী, অর্থাৎ নিঃসঙ্গ পরিবেশেই যার মানসধর্মের লালন-পালন, তাকেও দেখব নির্জনতা অতিক্রম ক'রে অপরের সঙ্গ লাভের জন্য উন্মুখ। অর্থাৎ সঙ্গ অসঙ্গের দ্বৈত টানা পোড়েনেই মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির সম্পূর্ণতা। এ সূত্রটি কেবলমাত্র মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্বের মধ্যেই যে রয়েছে তা নয়, বিশ্বের যাবতীয় শিল্প ইতিহাসের ব্যাপ্তিতে এই সঙ্গ নিঃসঙ্গতার ক্রমপরিণতির উল্লেখ আছে। সঙ্গ অর্থাৎ কোলাহল এবং নিঃসঙ্গতা অর্থাৎ নির্জনতা এই অর্থে চিন্তা করলে সব শিল্পেই বিশেষতঃ চলচ্চিত্রে এর একটা ধারা লক্ষ্য কবা যাবে।

মুখ্যতঃ চলচ্চিত্রের জন্মলগ্নের প্রথম পার্বিক স্তরে মানুষ তার সমগ্র দিনের ক্লান্তিকে কিছুক্ষণ ভুলিয়ে রাখার জন্য অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে আসত। এরপর বছর অতিক্রমের শেষে চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠা যখন আর কেবল শ্রান্তি অপনোদন নয়, পরন্তু মানুষের আত্মানুসন্ধানের, তার মানসিক বোঝাপড়ার একটা চরম বিস্ময়কর দর্পণ, তখন চলচ্চিত্রের প্রথম পাদপীঠ রচিত হ'ল অবিস্মরণীয় শিল্পের নিরিখে।

শিল্পের চরম পরাকাষ্ঠায় উপনীত হ'তে তাই বর্তমানে চলচ্চিত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাত্রাপথ অনন্ত বিস্তৃত। বাস্তবিকপক্ষে মানুষ তার 'Spiritual Longing' অর্থাৎ মননের পরম তৃপ্তির আকুলতায় চলচ্চিত্রের মধ্যে নতুন নতুন অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনার বীজকে লক্ষ্য করেছে। চলচ্চিত্র তাই আর শুধু প্রমদোপকরণ নয়, অগণিত মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, প্রেমবেদনার একনিষ্ঠ সহচর।

সাহিত্য ও শিল্পের সব শাখার ভাবগত আত্মপ্রকাশে সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার রূপ-রেখা প্রতিফলিত। সাহিত্যের বাক প্রতিমায় যা সঙ্গ বা নিঃসঙ্গতার দ্যোতক, চিত্রশিল্পে, ভাস্কর্যে, কারুশিল্পে, তা স্থূল বস্তুপুঞ্জের আকারে বিধৃত। ব্যাপারটা একটু আলোচনা করা যাক। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে রাধার যে নিঃসঙ্গতা, যে একাকীত্ব তাকে রূপ দিতে গেলে চিত্রকর বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত একটি রমণীর আকৃতিতে হয়ত নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে অথবা কুঞ্জকুটীরের দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্টা অন্যমনা এক নারীর ছবিকে বিবিধ রঙে ফুটিয়ে তুলবেন। প্রসঙ্গতঃ কাংড়া চিত্র ভঙ্গিমার কোনো কোনো ছবি আমাদের মনে আসতে পারে। আমরা যখন ছবিটিকে দেখব তখন শিল্পী প্রদত্ত ছবিটির শিরোনাম ও ফ্রেমে আবদ্ধ ছবিটির অঙ্কনগত বৈশিষ্ট্যে রাধার নিঃসঙ্গতার সন্ধান করব। সেখানে শিল্প অনুধ্যানের সঙ্গে তাৎক্ষণিক কল্পনা মিশবে। কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় সুবিধা এই যে পরিচালক একটু সতর্ক আঙ্গিকে কোনো মানব বা মানবীর আত্যন্তিক নির্জনতায় বা একাকীত্বের চরম মুহূর্তে দর্শকদের হাজির করতে পারেন কেবলমাত্র কয়েকটি সুনির্বাচিত দৃশ্যের উপস্থাপনায়। অবশ্য সে-ক্ষেত্রে পরিচালককে চলচ্চিত্রের বিধি মত শ্রুতি ও ধ্বনিকল্প, ক্যামেরার বিভিন্ন কৌণিক উপস্থাপনা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সব অতিক্রম করেও তিনি অসংখ্য দর্শকের সামনে তাঁর অভীষ্ট নিঃসঙ্গ পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবেন। কেননা চলচ্চিত্র দৃষ্টিবাহী শিল্প বলেই তার পরিণতি মানুষের চিত্তে গভীর। বৈজ্ঞানিক প্রথায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য স্মৃতিই মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে থাকে।

ইংরেজ কবি রবার্ট ফ্রস্টের 'Acquainted with the Night' কবিতায় যে নিঃসঙ্গতার আমেজ, তা একান্তভাবেই শ্রুতিগত। কবিতাটি পড়ার সময় যে অসঙ্গ পরিবেশের মধ্যে পাঠকের মন নিবিষ্ট হয় তা বিশেষভাবেই কবিতাটির চরণগুলির পারম্পরিক রূপকল্পে বিধৃত :

'I have been one acquainted with the night.
I have walked out in rain—and back in rain.
I have outwalked the furthest city light.
I have looked down the saddest city lane.
I have passed by the watchman on hit beat.
And dropped my eyest, unwilling to explain.
I have stood still and stopped the sound of feet.
When far away an interrupted cry
Came over houses from another street,
But not to call me back or say good-bye ;
And further still at an unearthly height,
One luminary clock against the sky
Proclaimed the time was neither wrong nor right.
I have been one acquainted with the night."

ওপরের এই সনেটে ফ্রস্ট যে নিঃসঙ্গতা, যে বিশেষ একাকীত্বের ছবি এঁকেছেন তাকে উপলব্ধি করতে হলে প্রতিটি চরণের মধ্যে সন্নিবেশিত বাণীর দ্যোতনার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কবিতাটির পরিবেশের প্রসঙ্গে জন হাস্টন পরিচালিত 'Freud the Secret Passion' ছবির কয়েকটি বিশিষ্ট মুহূর্তের ছবি মনে আসে। ফ্রয়েডের ভূমিকায় মণ্টেগোমারী ক্লিফ্‌টের একাকী ভ্রমণ, কোনো কোনো মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষকে পর্যবেক্ষণের পর রোগ নিরাময়ের চিন্তায় বিভোর, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম তাৎপর্য অনুধাবনে, পথের লাইটপোষ্টের নীচ দিয়ে ফ্রয়েডের নির্জন বিচরণের কয়েকটি মুহূর্ত অতি সহজে আমাদের ফ্রয়েডের চিন্তার নৈঃসঙ্গে নিয়ে যায়। কখনো মিড ক্লোজ আপে, কখনো লঙ শটে, আবার কখনো সম্পূর্ণ ক্লোজ আপে ফ্রয়েডের চিন্তান্বিত মুখমণ্ডল, শহরের বিভিন্ন পথে তার নিঃসঙ্গ ভ্রমণের অসঙ্গতার আমেজ সৃষ্টি করেছেন পরিচালক। বিভিন্ন কোণ থেকে গৃহীত দৃশ্যবিন্যাসে ফ্রয়েডের সাময়িক নিঃসঙ্গতা, অভীষ্টের অনুসন্ধানে তার নিস্তব্ধ বিচরণ একান্ত নিষ্ঠায় দর্শকদের পরিচালকের কাম্য পরিবেশে উপস্থিত করে। ছবিতে চিত্রিত ফ্রয়েডের নির্জনতা পরিচালকের নির্বাচিত দৃশ্যক্রমের মধ্য দিয়ে দর্শকদের মনে সংক্রামিত হয়। তখন দর্শকের উপলব্ধি ফ্রয়েডের উপলব্ধির সহধর্মী। সহৃদয় দর্শকের তখন মুহূর্তের জন্য আত্মানুসন্ধান ঘটে।

"অনেক নির্জনে ফিরেছি তো
চেনা সেই অদ্বিষ্টের তবু বুঝি আজও দেখা নেই।"

বোরিস স্তেপানভ পরিচালিত রুশ ছবি 'অ্যালপাইন ব্যালাড'-এ জার্মান কারাগার থেকে পলাতক এক রুশ সৈনিক ও এক পোলিশ তরুণীর তিনদিনের ঘটনাক্রম চিত্রিত হয়েছে। তরুণ আইভান ও তরুণী জুলিয়া তাদের বিপদসংকুল যাত্রাপথের নানান অভিজ্ঞতার সঙ্গে দর্শকদের আত্মীয়তা ঘটিয়েছে সহজেই। পথ-শ্রমে ক্লান্ত জুলিয়ার প্রতি কখনো ক্রোধে, কখনো অভিমানে আইভান তাকে ফেলে রেখে যেতে উদ্যত হয়েছে—কিন্তু জুলিয়ার আত্মবিশ্বাস ও জীবনের প্রতি নিবিড় মমতায় আইভান পুনরায় জুলিয়াকে সঙ্গে ক'রে বাঁচার নতুন আশায় যাত্রা শুরু করেছে। ছবিতে অনেক সুন্দর, অনেক বীভৎস ও সংকটপূর্ণ মুহূর্ত আছে যা দর্শকদের ঐ পলাতক তরুণীর মানসিক বোঝাপড়ায় উন্নীত করেছে। তারা দু'জনে কখনো হাত ধরে একসঙ্গে পথ হেঁটেছে, কখনো আবার সাময়িকভাবে ছাড়াছাড়ি হয়েছে, দু'জনের—অভিমানের দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলেছে তারা বিপদের প্রাক্ মুহূর্তে আবার তাদের মিলিত ভাবে দৃশ্যে দেখা গেছে। কখনো সঙ্গ অবস্থায়,কখনো নিঃসঙ্গতা বুকে নিয়ে তারা পথ হেঁটেছে। কখনো উন্মুক্ত সবজি খেতে নীল আকাশের নীচে, কোনো সময় আবার জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম পর্বতশিখরে তারা রাত কাটিয়েছে। পরিশেষে যাত্রার অন্তিমদিনে তারা জার্মানদের মুখোমুখি হয়েছে। আইভান প্রেমের নিবিড়তায় জুলিয়াকে বরফের টিলার ওপর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তার জীবনরক্ষা করেছে এবং শেষে নিজে ধরা দিয়েছে সম্মুখ যুদ্ধে। অতি নিপুণ দৃশ্য গ্রহণের সাহায্যে পরিচালক আইভান ও জুলিয়ার তিনদিনের ভ্রমণের সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার পরিবেশে আমাদের হাজির করেছেন। সেখানে তাঁর সহায়ক, ক্যামেরার সুনির্বাচিত বিভিন্ন দৃশ্যকোণ। ছবিটি দেখতে দেখতে তার কয়েকটি বিশিষ্ট মুহূর্তে জীবনানন্দের 'দুজন' কবিতাটির কয়েকটি চরণ মনে মনে ধ্বনিত হতে থাকে। আইভান ও জুলিয়ার প্রথম দিনের পর দ্বিতীয় দিনে বিরাট খোলা প্রান্তরে এসে বিশ্রাম করা, ঝর্ণার জলে জুলিয়ার স্নান সমাপন, তাদের পুনরায় যাত্রা কবিতাটির কয়েকটি চরণকে মনে করিয়ে দেয়—

"দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এল—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জমাট অশথের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে নড়েচড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে,
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল।

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হ'লে ক্রমে ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে :
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; ...”

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসনে উপবিষ্ট একটি মানুষ যখন রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত চলমান মানুষের ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্পলক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে, তখন সেই চলমান চরিত্রের আত্মিক প্রকারভেদ, তার মানসিক সঙ্গ নিঃসঙ্গতা সব-কিছুই দর্শকের মনে ক্ষণিকের জন্য হলেও গভীর মমতায় এসে পৌছয়। চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত পুত্রহারা মায়ের আকুল হাহাকার, প্রেমিকের মৃত্যুতে প্রেমিকার তীব্র ক্রন্দন, চিরকালীন একাকীত্ব চলচ্চিত্রের নির্দিষ্ট কালসীমায় দর্শকের মনে অসীম প্রগাঢ়তায় আসন ক'রে নেয়। তাই চলচ্চিত্রের পর্দায় একটি চরিত্র যখন নির্জন পরিবেশে ভ্রাম্যমান—আমরা অর্থাৎ দর্শকবৃন্দও তখন নিজেদের নৈঃসঙ্গের মধ্যে আবিষ্কার করি, যখন চরিত্রটি অসংখ্য কোলাহলের উচ্চকিত পরিবেশে প্রতিমায়িত হয়—তখন আমরাও একইভাবে ঐ চরিত্রের অনুগামী হ'য়ে পরিব্যাপ্ত মুখরতায় পৌছে যাই।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা'র প্রথমাংশেই চারুর নিঃসঙ্গতাকে পরিচালক অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন কয়েকটি বিশিষ্ট দৃশ্যসংযোগে। দূরবীন হাতে চারুর পথচারী দর্শন, তিনটি নির্বাচিত শট-এ সত্যজিত চারুর নিঃসঙ্গতা ফুটিয়েছেন। ছবির শুরুতেই দর্শকরা চারুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পরিণতির ইঙ্গিত পেয়েছে। ছবির মাঝামাঝি পত্রিকার সম্পাদনার ব্যাপারে কর্মব্যস্ত ভূপতিকে কাছে না পাওয়ার দরুণ চারুলতার একাকীত্ব, তার মানসযন্ত্রণার পরিস্ফুটনে সত্যজিৎ কয়েকটি চমৎকার দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। Sentinel পত্রিকর প্রকাশের পর সেই পত্রিকা হাতে নিয়ে ভূপতি অলিন্দ অতিক্রম করে চলে যায়। চারু দূরবীণ চোখে লাগিয়ে ভূপতিকে কাছে দেখেই পরক্ষণে দূরবীণ নামিয়ে রাখে—ভূপতিকে আমরা আবার দূর অলিন্দের শেষ প্রান্ত দিয়ে চলে যেতে দেখি। এখানে সত্যজিৎ Zoom লেন্স ব্যবহার ক'রে ভূপতি জীবনের অতি কাছে থাকা সত্ত্বেও চারুর যে আত্মিক নৈঃসঙ্গ—তাকে অপরূপ আঙ্গিকে উদ্ভাসিত করেছেন।

লেলুশ পরিচালিত বিখ্যাত ফরাসী ছবি 'Man and Woman'-এ মোটরের এক রেসার ও চলচ্চিত্রের এক 'কন্টিনিউটি গার্ল'-এর পারস্পরিক

সম্পর্কের ঘটনাক্রম বিবৃত হয়েছে। তাদের সম্পর্ক ক্রমে গাঢ় হচ্ছে। প্রেম দুজনের মধ্যকার জড়তা দূর করেছে। মাঝে মাঝে মেয়েটির পূর্বতন প্রেমস্মৃতি তার বর্তমানের প্রেমে উঁকি দিয়েছে। মেয়েটি তার একমাত্র সন্তানসহ গাড়ীর চালকের হৃদয়ের কাছাকাছি উপনীত হয়েছে। ছেলেটিও তার একমাত্র শিশুকে নিয়ে মেয়েটির প্রেমে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে অভিলাষী হয়েছে। মেয়েটি বিধবা, ছেলেটিও বিপত্নীক। তাদের উভয়ের জীবনের ঘটনাগতি তাই অনেকটা একই পথে পরিক্রমণ করেছে। মেয়েটি যখন ছেলেটির প্রেমে নতুনভাবে উজ্জীবিত হচ্ছে, তখন সরাসরি cut এর ব্যবহারে পরিচালক মেয়েটির পূর্বপ্রেমের ঘটনাগতিতে দর্শকদের নিয়ে গেছেন। মোটরের চালকের সাহচর্যের নিবিড়তায় কখনো সঙ্গ আবার প্রাক্তন স্বামীর প্রেম-চেতনার স্মৃতিপীড়িত মেয়েটির সাময়িক অসঙ্গতায় খণ্ড খণ্ড রূপকল্প পর্দায় প্রতিফলিত হয়েছে চলচ্চিত্রের নিপুণ আঙ্গিকে।

জন রিবকোয়াস্কি পরিচালিত পোলিশ ছবি 'To Night A City Dies'-এ দেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এক জার্মান নারী মাগদা ও এক পোলিশ পুরুষ প্রিয়ত্রকে, যুদ্ধের ধ্বংসকালীন পরিবেশে উভয়ের একাত্মতা, তাদের পারস্পরিক আত্মরক্ষা ও সমগ্র শহর অগ্নিদগ্ধ হলে সেই ধ্বংসাত্মক পরিবেশ থেকে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় প্রাণরক্ষা ক'রে শহরপ্রান্তের নদীর অপর তীরে তাদের উপনীত হওয়া ও তাদের সম্পর্ক হীনতাকে। সমগ্র ছবিতে বোমার তীব্র শব্দ, অসংখ্য গৃহের ধ্বংসকালীন দৃশ্য, শহরের চতুষ্পার্শ্বে প্রজ্জলিত আগুনের লেলিহান শিখার পরিবেশের মধ্যে নানান খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলীতে আমরা মাগদা ও পিয়ত্রর সম্পর্ক স্থাপনে অভিভূত হই এবং সবশেষে নদীর তীরে উপনীত হলে, তথায় জমায়েত জার্মান সৈনিকেরা বিদেশী ও জার্মানদের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ ক'রে দিলে, মাগদা চলে যায় একদিকে, পিয়ত্র যায় আর একদিকে। তাদের এই ছাড়াছাড়িতে আমরা ব্যথিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ি। পরিচালক অত্যন্ত একনিষ্ঠতায় দুজনের সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতা অর্থাৎ তাদের কার্যাবলীর কোলাহল ও নির্জনতায় চলচ্চিত্রের স্বকীয় রীতিতে দর্শকদের এগিয়ে নিয়ে যান।

চলচ্চিত্রের রীতিটাই হ'ল এমন যে মানুষের কথার বাচনিক রূপকল্পকে (Verbal Image) সে বৈজ্ঞানিক প্রথায় স্বষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিমায় (Visual Image) সঞ্চারিত করে। আর এই কারণেই কোনো ঘটনাবলীর লিখিত রূপ পঠন অপেক্ষা তার দৃশ্যগত উপস্থাপনায় মানুষের মনন বেশী সক্রিয়।

চলচ্চিত্র যে মনস্তাত্ত্বিক প্রণালীতেও দর্শকদের মনে পর্দায় সঞ্চরণশীল পাত্র-পাত্রীর সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হাঙ্গেরীয় ছবি 'Current'। নদীতে সাঁতার দেওয়ার সময় দলের মধ্য থেকে গ্যাবি নামে একটি ছেলে নদীর স্রোতের বেগে ডুবে মারা যায়। গ্যাবিকে হারিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত তার বাকী বন্ধুরা আস্তানায় ফিরে আসে। নদীতে স্নান করতে যাওয়ার প্রাক্কালে দলের প্রত্যেকের মধ্যে যে হর্ষ, যে উত্তেজনা ছিল, গ্যাবির আকস্মিক ডুবে যাওয়ার পর তাকে হারিয়ে বাকী বন্ধুরা প্রত্যাবর্তনের সময় নিজেদের ভীষণভাবে নিঃসঙ্গ মনে করে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে সমগ্র ছবির পরিণতি পর্যন্ত একাধিক বন্ধুদের একসঙ্গে চিন্তা করতে, গভীর আলোচনা করতে ও সহাবস্থান করতে দেখা গেছে। কিন্তু গ্যাবির অনুপস্থিতিকে পরিচালক অসীম কৃতিত্বে চরম নিঃসঙ্গতায় সমগ্র ঘটনাবলীর সঙ্গে একত্রীভূত করেছেন। পর্দায় গ্যাবির অপর সব বন্ধুদের কার্যক্রম পর-পর চিত্রিত হয়েছে—কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র গ্যাবির অনুপস্থিতি দর্শকদেরও যেন এক নির্জন নিঃসঙ্গ মানসভূমিতে অধিষ্ঠিত করেছে। বাক্যহীন অবস্থায় একসঙ্গে বন্ধুদের স্থান থেকে স্থানান্তরে নিঃশব্দ বিচরণ, একই ঘরে উপবিষ্ট সবকটি মানুষের একাগ্র আত্মচিন্তনকে পরিচালক চলচ্চিত্রের কয়েকটি দুঃসাহসিক ফ্রেমে আবদ্ধ করেছেন।

বিখ্যাত চেক চলচ্চিত্র 'A Shop On The Main Street' এর পরিচালক মৃত্যুত্তীর্ণ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এক কাল্পনিক রূপ এঁকেছেন। এক ইহুদী বৃদ্ধাকে নাৎসীদের কবল থেকে রক্ষার জন্য ছবির নায়ক আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। পরিশেষে প্রায় ধৃত মুহূর্তে নায়ক অনন্যোপায় হ'য়ে নাৎসীদার কাছ থেকে বৃদ্ধাকে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে তাকে সজোরে আঘাত করে একটি ঘরের মধ্যে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিপদ কেটে গেলে নায়ক আবিষ্কার করে যে সেই অতিবৃদ্ধা তার সেই আঘাতেই মৃত্যু বরণ করেছে। দুঃখে, তীব্র মর্মবেদনায় নায়ক আত্মহত্যা ক'রে প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজেছে। ছবির শেষ দৃশ্যে আমরা দেখেছি নায়ক এক স্বপ্নময় পরিবেশে, আবছা আলো আঁধারি ধূসরতায় লোকায়ত জগতের উর্দ্ধে ঐ বৃদ্ধার হাত ধরে দ্রুত মিলিয়ে যায়। এই দৃশ্যক্রমটিকে 'নেগেটিভ প্রিন্টের' মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। যা একান্তভাবে নায়ক ও ঐ বৃদ্ধার পারস্পরিক সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতায় বিবৃত।

আজ অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধ'রে চলচ্চিত্রশিল্প তার নানান রীতি ও গঠনে

বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের আত্মবিকাশে অতি নিকট আত্মীয়ের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে আসছে। শুধুমাত্র সময় কাটানো বা ক্লান্তি অপনোদনের আনন্দকর মাধ্যম নয়—চলচ্চিত্র আজ একক—দ্বৈত—বহুর মিলিত সত্তার প্রতিমা রচনায় ব্রতী। একের নিঃসঙ্গতা দ্বৈতের মিলিত সঙ্গ ও বহুর মুখরিত আনন্দকে চলচ্চিত্র আজ তার স্বকীয় সাধনা ও আবিষ্কারের রীতিগত প্রয়োগে চিরস্মরণীয় ক'রে যাচ্ছে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা তাই, চলচ্চিত্র একদিন তার আঙ্গিক প্রকরণের নিষ্ঠায় মানুষের মনস্তাত্ত্বিক স্বপ্নলোকের উৎসে প্রবেশাধিকার পাবে।

চলচ্চিত্র ঃ অন্যরূপ রূপান্তর

এই মুহূর্তের 'আমি', অর্থাৎ অদ্যকার আমি, নিশ্চিতরূপে আগামীকাল পরিবর্তিত হব। আর এই নিত্য রূপান্তরের ধ্রুব সূত্রের জন্যেই আমার মন, আমার আকাঙ্ক্ষা সবকিছু শিল্পসৃষ্টির মধ্যে 'অনস্তিত্বের' স্বাদ গ্রহণে একান্তই অভিলাষী। বলা বাহুল্য যে 'অনস্তিত্ব' অর্থে অভাবিত, অযাচিত কোনো বস্তুরূপের সম্যক বিদ্যমানতাতেই আমার মন আগ্রহী নয়। পরন্তু দর্শকের নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় আমি সর্বদাই চলমান দৃশ্যশিল্পের মধ্যে যখনই অসঙ্গতি খুঁজে পাই তখনই শুরু হয় আমার মানস যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা অনস্বীকার্য ভাবেই মৎকথিত উক্ত চলমান দৃশ্যশিল্পকে সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব অনুধ্যানে সাজাবার অনুষঙ্গে আবির্ভূত হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এ সৃষ্টি যন্ত্রণাকে আমি কোনোমতেই ছেড়ে যেতে পারি না। যে কোন স্রষ্টার ছবি দেখাকালীন আমি যেহেতু উক্ত স্রষ্টার সৃষ্ট স্থান-কাল-পাত্র পরিবেশের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে একীভূত হই, যেহেতু আমার তাৎক্ষণিক মন ঐ চলচ্চিত্রকারের ভাবনার বৃত্তে মিশে একাকার হয়ে যায়, এবং যেহেতু আমি আমার ঐ স্বল্পকালীন সময়ের জন্যে আমার দৈহিক বাস্তবতাকে বিস্মরণীর পারে রেখে, উক্ত চলমান দৃশ্যসংস্থাপনের সার্বিকতায় ডুবে যেতে পারি—তাই আমার গ্রহণের স্বাদবৈচিত্র্যে ঐ আলোচ্য চলচ্চিত্রটি যদি কোথাও কোনো ব্যতিক্রম ঘটায়, কোনো অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে, তা তৎক্ষণাৎ আমাকে তীব্রভাবে আঘাত করে, আমি ব্যথিত হই। কিন্তু প্রশ্ন কেন? বস্তুতঃ যে কোনো মানুষের মন, তা ক্ষণমাত্র হলেও, যে কোনো শিল্পসৃষ্টিকে আস্বাদনের জন্যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকে। আর এই ক্ষণিক উৎফুল্লতার জন্যে সাধারণ মানুষকে সব সময় যে শিল্প আনন্দলোকের প্রক্রিয়ার তাবৎ অভিধার সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয় তাও নয়। কেননা, যে কোনো শ্রেষ্ঠ সৌরভময় সুদর্শন ফুলকে যেমন আপামর মানুষ ভালোবাসে, মুগ্ধ চোখে অবলোকন করে—তেমনি যে কোনো সার্থক, চূড়ান্ত বিপর্যয়কারী শিল্প সৃষ্টি মানুষকে তার কাছে টানবেই। তবে সৃষ্টি সমীক্ষায় একটি প্রশ্নই থেকে যায়—অর্থাৎ সার্থক-অসার্থকের সীমারেখার প্রদর্শক কে বা কারা অথবা কোন্ নির্দিষ্ট শিল্প শাস্ত্র? সেখানে সমাধান এইটুকুই

যে, কোনো শিল্পসৃষ্টি তা যে বিষয়ের অনুষঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হোক না কেন, শিল্পের চূড়ান্ত আনন্দলোকের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার তীব্রতা, নিবিড়তা নিয়ে যাত্রা করেছে কিনা তা অনুধাবন করতে হবে। আর একটা কথা এই যে, সব শিল্প সৃষ্টিকেই অতীত থেকে বর্তমানে, অধুনা থেকে অনাগত সময়ের প্রেক্ষাপটে স্বকীয় প্রতিলিপি দর্শনের জন্যে স্রষ্টাকে ছাড়পত্র দিতে হবে। যে ছবিটি আজ নির্মমভাবে সমালোচনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দর্শকের না নেওয়ার আঘাতে জর্জরিত হ'ল—হয়তো পরবর্তী সময়ের কোঠায় সেই ছবিটিই যুগপৎভাবে সমালোচক ও দর্শকের হর্ষোৎফুল্লে তার গ্লানির রক্ত ক্ষরণ মোচন করতে সফলকাম হবে। এবং এখানে একান্তভাবেই মনে রাখতে হবে যে আমিও, দীর্ঘবিলম্বিত ছন্দে সেই সংঘটিত কাল থেকে 'অধুনা' পার হ'য়ে অনাগতের দেহসীমায় দ্রষ্টা তথা একনিষ্ঠ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করতে চলেছি। অর্থাৎ একটি চলচ্চিত্রের নন্দনগত তন্নিষ্ঠতা দর্শকরূপে এই 'আমি'র চৈতন্যপ্রবাহে, আমার বোধের স্বাধিকারে সেই পরিমাণেই স্থিত হবে, যে পরিমাণ গ্রহণক্ষমতা, আনন্দশক্তি ও অবলোকন সামর্থ্য মানুষরূপে আমার মধ্যে বিদ্যমান, তার সংযোগে। কিন্তু মানুষে মানুষে যে পার্থক্য, তা কিসের ভিত্তিতে হয়েছে তাও বিচার্য—যেহেতু "The difference between men is in their principle of association—তাই স্বাভাবিকভাবেই Some men classify objects by color and size and others accidents of appearance, other by intrinsic likeness, or by the relation of cause and effect. The progress of the intellect is to the clearer vision of causes, which neglects surface differences."১

'আমি' অর্থাৎ আজকের চলচ্চিত্রের অগণিতদর্শকবৃন্দের একজন, যখন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে নিরীক্ষণ করি উপবিষ্টা এক বৃদ্ধাকে একটি বালক ও বালিকা ছুটে এসে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার মৃতদেহের পতন ও তার নিত্যসঙ্গী পেতলের ঘটির শব্দ করতে করতে ওপর থেকে নীচু স্থানে পড়ে যাওয়া (পথের পাঁচালী) অথবা যখন অবলোকন করি, বোনের চরম আত্মহত্যার পরবর্তী সময়ে, নতুন জীবনের সন্ধানে, নতুন বাঁচার স্বপ্নে, বোনেরই শিশু পুত্রের হাত ধরে একটা মানুষ দিগন্তের আড়ালে মিলিয়ে যায়, (সুবর্ণ রেখা) তখন উভয়ভাবেই যথাক্রমে চরম বেদনা ও দৃঢ় আস্বাদে মন পরিপ্লুত হয়। প্রথমাংশের বেদনা যেমন তীব্র যেমন ঘনপিনদ্ধ জ্বালাময়ী—দ্বিতীয়াংশের দুঃস্বপ্ন ও

দুর্যোগ অতিক্রান্ত শুভের চিহ্ন তেমনি আকাঙ্ক্ষিত।

ওপরে কথিত দুটি ছবির দুটি খণ্ডাংশের বিষয়বস্তুর রূপায়ণে আমি স্বয়ং স্রষ্টার ভূমিকায় কোন্ পরিণতিতে নিয়ে যেতাম—তা প্রেক্ষাগৃহেই উক্ত চলমান দৃশ্যাংশ দেখার বিস্ময়তা অপসারিত হলেই অনুভব করতাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমার এই অনুভবের মূলে কোন্ আত্যন্তিকতা ক্রিয়াশীল। দর্শকবৃন্দের চিরাচরিত বাতায়ন ছেড়ে আমার মন কেন স্বতন্ত্রসত্তায় এই ধরনের বিচিত্র নান্দনিক পর্যায়ক্রমে অপসৃত হ'তে চায়—তার কারণ অনুসন্ধানে, সাংগঠনিক শিল্প আধারে মানুষরূপে আমার মৌল প্রেরণার অনুসন্ধিৎসা কী, তার গভীরে অবতরণ করতে হবে। দর্শকের নির্দিষ্ট ভূমিকায় একটি ছবির পরিণতি কতটা সুসঙ্গত, কতটা সুষ্ঠুতর হ'ল বা হবে, তার ধারণা বা ঔচিত্য আমি আমার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই একমাত্র অনুধাবন করতে পারি। একটা ছবি শেষ হবার পরমুহূর্তেই, আমার চৈতন্য প্রবাহে, "আমি যদি স্রষ্টা হতাম"—এর অনুরূপ ধারণায় উক্ত ছবির কোনো দৃশ্য বা একাধিক দৃশ্যাংশ কিভাবে রূপাবয়ব পেত তা পরিচালকের শিরোনামায়ই আমার মধ্যে সংক্রামিত হয়।

প্রখ্যাত রুশ অভিনেতা চেরকাশভ ছায়াচিত্রে শিল্পী ও একনিষ্ঠ দ্রষ্টার সম্পর্ককে শিল্পীর শিল্পকর্মের উৎকর্ষতার পরাকাষ্ঠা বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর কথায় "Close contact with the audience is a help to the actor in projecting his art."২ এবং শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে এই হৃদ্যতাটুকু গ'ড়ে ওঠায় দর্শকরূপে এই 'আমি'র একটা মুখ্য প্রয়োজনীয়তা আছে, যে প্রয়োজন নির্বিশেষে প্রত্যেক দর্শকের সনাতন 'আমিত্ব'কে ভেঙে চুরমার ক'রে চলমান দৃশ্যশিল্পের শিল্পীর তন্নিষ্ঠ কার্যকারণ-অন্বিত জীবনবোধে মেলাতে উন্মুখ। যে কোনো দর্শকই যেমন তার নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্য থেকে, তেমনি চলমান শিল্পীও চলমান দৃশ্যশিল্পের লৌকিক উপস্থিতির (Filmic Appearance) গণ্ডীর মধ্য থেকে একই কথাই বলতে পারেন—

"আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।"

অন্যান্য শিল্পাঙ্গিকে যেমন স্রষ্টা তাঁর ইচ্ছামত যে কোন বস্তুরূপকে মনোরম, অথবা কদর্যরূপে আঁকতে পারেন, চলচ্চিত্রের স্রষ্টার সবক্ষেত্রে এই সুবিধে বিদ্যমান নয়। কারণ চলচ্চিত্র বিশেষভাবেই সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার একটি

জটিল সামষ্টিক রূপ। এই শিল্পে স্রষ্টার চেতনার রঙে পান্না চুনিকে ইচ্ছেমত রাঙানোর যুক্তিযুক্ততা অত্যন্ত ক্ষীণ। 'ওই দৃশ্যাংশটি এইরকম' অথবা 'এই দৃশ্যপরিণতিটা ওই ধরনের হলে সুন্দর হত' ইত্যাদি পর্যায়ের বাক্যোক্তি যখন কোনো দর্শকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—তখন সেগুলি যে পরিচালকের সত্তায় ঐ দর্শকের 'আমিত্ব' থেকেই উদ্ভূত হয় তা সতত বোঝা যায়। বস্তুতঃ শিল্প তাৎপর্যের অন্বীক্ষণে যে কোনো দ্রষ্টাই তাঁর স্বকীয়তা, তাঁর intuition ও দৃষ্টিগ্রাহ্য সহজাত প্রবণতা অনুসারে এই লৌকিক বিশ্বের সমস্ত বস্তুর অবভাসকে আত্মস্থ করতে সক্ষম—সেখানে ব্যবহারিক সূত্রে ঐ দ্রষ্টাকে স্রষ্টার শিরোপা গ্রহণ করতেই হবে এমন বিধান নেই।

১। Essays- R. W. Emmerson-Carlhin House Neuyork P-9

২। Notes of A Soviet Actor—N. Cherkasov-P-195

সিনেমার ভাষা ও শিল্পতত্ত্ব: উপসংহার

এই শতাব্দীর ষাট দশকের প্রারম্ভে প্রাচ্যের একটি চরম উন্নতদেশে একটি ছবি তৈরী হ'ল। ছবির নির্মানকাল ১৯৬৯ এবং দেশটি হ'ল জাপান সবাক চলচ্চিত্র যখন বিশ্বের শিল্পেতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, যখন প্রতীচ্যের অসংখ্য ছবির রীতি ও প্রকরণে কোটি কোটি শিল্পরসিকের বোধ ও বুদ্ধি চলচ্চিত্রের নন্দন নিয়ে ভীষণরকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—সেই সময় সূর্যালোকিত দেশের এক শিল্পী এক অভিনব কাণ্ড ক'রে বসলেন। তিনি 'দি আইল্যাণ্ড' নামে একটি ছবি তৈরী করলেন যাতে একটিও সংলাপ নেই। আপাতভাবে ছবিটি নির্বাক কিন্তু শব্দহীন নয়। সেকালের নির্বাক ছবির সঙ্গে একে মিলিয়ে ভাবলে ভুল হবে। পরিচালক কেনেটো শিন্‌ডো বস্তুতঃ এ ছবিতে এক নোতুন সিনেমার ভাষার জন্ম দিলেন: I was thinking to express the fight of farmers with the earth some day. But the silent fight of farmers with the earth seemed to me to be unable to talk enough even I could talk skillfully. I was caught with the word 'silent'. I thought about a drama without dialogues....I return back to the old days when the theory of montage was discussed, and from this point of view I observed the film. I am not sure what kind of grammer is necessary for making a cinematographic poem. I could master this theory of grammer. However, this is an experiment. ছবিটির নির্মান ইতিহাসের মুখবন্ধস্বরূপ পরিচালকের এই ব্যাখ্যা সিনেমার ভাষা সম্পর্কে আমাদের নোতুন করে চিন্তার জগতে পৌঁছে দেয়। সিনেমার ঠিক ঠিক ভাষাটি কি ও কেমন তার প্রকৃত ব্যাখ্যা আজও আবিষ্কৃত হয় নি। তাছাড়া সিনেমা শিল্পটি এখনও শতবার্ষিকীতে পৌঁছয়নি। প্রতীচ্যের বহু মনস্বী সমালোচক ও চলচ্চিত্রের নন্দনবিদ্‌রা নানা স্থানে নানা ভাবে এ শিল্পের ব্যাকরণ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মানুষে মানুষে পার্থক্যের মতোই সেই সব কথাগুলো নানা রূপ লাভ করে আছে।

সিনেমার জন্মলগ্নেও যেমন, একালেও তেমনি শিল্পটির ভাষা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আর ভাষা প্রসঙ্গে রীতির প্রসঙ্গটাও জড়িয়ে রয়েছে। 'আইল্যাণ্ড' ছবির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরিচালক শিন্ডোর বিবরণটা তাই বিশেষ তাৎপর্যে আমাদের সিনেমার ভাষা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। এই ছবিতে কেবল সংগীত আর শব্দ ছিল: স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের দুই ছেলে মোট এই চারটি প্রাণীর দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালক অসাধারণ নৈপুণ্যে চলচ্চিত্রের পর্দায় রূপায়িত করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে ছবিটির মৌল বক্তব্য থেকেই এর শিল্পরীতিটা গড়ে উঠেছিল, তাই সংলাপের প্রয়োজন পড়েনি। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে বসবাসকারী চারটি প্রাণী কি ভাবে কঠোর পরিশ্রমে মাটির সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার যুদ্ধ করতো তারই কাব্যিক প্রতিভাস এ ছবির উপজীব্য। ছবির স্রষ্টা একটা পরিভাষা ব্যবহার করেছেন Cinemato-'graphic poem' অর্থাৎ অনেকটা সেলুলয়েডের কবিতা। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আইজেনস্টাইন সিনেমার শিল্পব্যাকরণ ও এসথেটিক ব্যাখ্যায় বহুবার চলচ্চিত্রের শিল্পরীতির সঙ্গে কবিতার প্রাকরণিক সাদৃশ্য উল্লেখ করেছিলেন। এমন কি মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' থেকে শুরু করে পুশকিন, মায়োকোভস্কি কীট্স প্রভৃতি কবির রচনায় হুবহু চলচ্চিত্রীয় রীতির অনুবর্তন লক্ষ্য করেছেন। শুধু তাই নয়, সার্থক পরিচালকের অন্যতম প্রধান গুণ রূপে তিনি স্রষ্টার কাব্য-প্রকরণ ও টেকনিক-সচেতনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু তবু সিনেমা 'কবিতা' নয়, অন্যজাতীয় একটা কিছু। বহু উৎকৃষ্ট ছবির সাংগঠনিক রীতিতে কবিতার নিঃশব্দ আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়, এমন কি বহু কবির কাব্য কৌশলে সিনেমার মণ্টাজের সম্পদও নিহিত থাকে, স্রষ্টা যাকে ক্যামেরার মাধ্যমে রূপায়িত করতে পারেন কিন্তু ক্যামেরা ব্যাপারটাই সিনেমাশিল্পের অভিনবত্ব এনেছে। কথায়, শব্দে, ছন্দে, গানেও যা ব্যক্ত করা সব সময় সম্ভব হয় না, ক্যামেরা তাকেই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলে প্রকাশ করতে পারে। বিশ্বপ্রকৃতির চলমান তাৎপর্যকে প্রকৃত ভাবে 'লুঠ' করে নেওয়ার এই বিশেষ সুবিধাই চলচ্চিত্রের ভাষার কেন্দ্রে বিরাজ করছে। এর সঙ্গে সহযোগী সখারূপে সিনেমাকে মহত্তর সম্ভাবনায় যেটি নিয়ে গেছে তা হল শব্দ। শব্দের শ্রুতিকল্প ও ধ্বনিকল্প এ দুটোই সিনেমার ভাষার দিগন্তকে অনন্ত করেছে। কবি লেখেন:

"এখানে জীবন নেই, মরণ সমক্ষে থাকে তকাতে
কোনো ভেদাভেদ নেই যৌবনে ও দু'হাতে

পাখিনীর মায়া নেই

শিকারীর ছায়া নেই''

আছে কেবল গ্লানি, যন্ত্রণা আর দাসত্বের কবিতা। ছাড়া পাবারও কোনো উপায় নেই। বৈচিত্র্যহীন ক্রিয়াকর্মের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। কবিতার অংশটা পড়তে মন্দ লাগে না, কিন্তু এ জাতীয় কিছু অনুভূতি আছে যা চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে রোমান পোলানস্কির ক্ষুদ্রচিত্র 'The Fat one and the Thin One'-এর একটি দৃশ্য স্মরণ করা যাক। এখানেও কবিতাটির মতো দাসত্বজীবনের জড়তা ও বন্ধনমুক্তির প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকে পরিচালক 'রোগা লোকটির' আচরণের মধ্য দিয়ে দেখাচ্ছেন। বিপুল মোটা একটি লোকের দাসত্ব করতে করতে রোগা লোকটি যখন তার ঘরে আসে কয়েক মুহূর্তের জন্য, তখন তার উঁচু জানলা দিয়ে দূরের আকাশ আর পৃথিবীটাকে বড বেশী করে মনে পড়ে। কিন্তু বেরোবার পথ নেই। আকাশটা এখানে চারদেয়ালে আপাদমস্তক ঢাকা। তাই সময় সময় সে জানলা দিয়ে দূর সমুদ্রের দিকে, আকাশের দিকে, বন্ধন মুক্ত জীবনের আনন্দে পালিয়ে যেতে চায়। এ দৃশ্যে ক্যামেরা কেবল লোকটির মাথা ছাড়িয়ে জানলার ভেতর দিয়ে দূরের জগৎটাকে দৃশ্যে ধরে। ক্রমে লোকটির দেখার বাসনা ও দূরের দৃশ্যক্রম অতুলনীয় ব্যঞ্জনা এনে দেয়। একটি শটেই পুরো বক্তব্যটা ফুটে ওঠে। আসলে সিনেমার ভাষাটাই হল এই। সংহত দৃশ্যক্রমে, শব্দ, সংগীত আলোকচিত্রে গড়ে তোলা মুহূর্তগুলিই চলচ্চিত্রে মানবজীবনের একটা পূর্ণ বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম।

ইতালীয় পরিচালক গিল্লো পন্টিকার্ভোর বৈপ্লবিক ছবি 'কুইমাদা'র নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে এমন বহু দৃশ্য যা কোনো ভাবেই অন্য কোনো শিল্পরূপে ব্যক্ত হ'ত না। একটি দৃশ্য আছে যেখানে 'কুইমাদা'র স্থানীয় জননেতা হাউজী ও যুদ্ধনিয়ন্ত্রক উইলিয়াম ওয়াকার এই দুটি চরিত্র তাদের প্রাথমিক বিজয়োল্লাসের পর সাক্ষাৎ করছেন। দৃশ্যের ঘটনাস্থল সমুদ্রতীরস্থ বেলাভূমি, দুপ্রান্তের অশ্বপৃষ্ঠে দু'জন পরস্পরকে দেখে মিলিত হতে আসছেন। হাউজীর অনুগত অসংখ্য বিপ্লবী, আর উইলিয়ামের পিছনে ছুটে আসা স্থানীয় অধিবাসী। দু'দলের মিলন পটভূমিতে সূর্যালোকিত উত্তাল সমুদ্র। ক্যামেরা এখানে ঐ বিপুল জনতার দ্রুতচলার ছন্দে সমান ভাবে ক্রিয়াশীল। এখানে ক্যামেরার ট্রাকিং এক অনবদ্য মুহূর্ত গড়ে তুলেছে। পিছনের উদ্দাম সমুদ্রের ফেনোচ্ছ্বাসের

মুখোমুখী মানুষগুলোর হর্ষধ্বনি একমাত্র ক্যামেরা আর শ্রুতিকল্পেই ব্যক্ত হওয়া সম্ভব। অবশ্য বলতে বাধা নেই যে, ছবিটির এই দৃশ্যক্রমটি দেখতে দেখতে দর্শকের কাব্যিক অনুভূতির জাগরণ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তবু কবিতাধর্মী হয়েও এটি সিনেমার স্বকীয় ভাষায় অনবদ্য। চলচ্চিত্র যেহেতু বহু শিল্পের মিশ্রণে জন্ম নিয়েছে, তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই কবিতার চিত্রকল্পের লক্ষণ এ শিল্পে কোনো বিপ্রতীপ ব্যাপার ঘটায় না।

একালের দর্শকের কাছে, একটা ব্যাপার অন্তত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সিনেমার ভাষা নিয়ত পরিবর্তনের মুখে। কোনো নিশ্চিত প্রত্যয়ে এ শিল্প এখনও স্থির নয়। তার একমাত্র কারণ যে বিশ্বের সবকটি বড় বড় শিল্পরীতি সিনেমার ভিত গড়ে দিয়েছে। সকলের মিলিত সামঞ্জস্যে সিনেমা এমন এক আধুনিকরূপ নিয়ে বেড়ে উঠছে যে ঠিক কোন্ স্তরে গিয়ে এর পরিক্রমা শেষ হবে এই মুহূর্তে সেটি আন্দাজ করা দুরূহ। প্রাচ্য দেশের দুই বিশ্বরেণ্য চলচ্চিত্র স্রষ্টা: আকিরা কুরোসাওয়া ও সত্যজিৎ রায় এঁরা একই মহাদেশীয় শিল্পী হলেও শিল্পরীতিতে ও ভাষার প্রকরণে এঁদের দুজনের কাজে কতো তফাৎ। আসলে দুই ভিন্ন ব্যক্তি চেতনার অনুষঙ্গেই এঁদের শিল্পভাষা দুটো ভিন্ন পথে পরিক্রমা করেছে। অথচ সিনেমার মৌলিকভাষা এঁদের দুজনের কাছেই একই তাৎপর্যে গ্রহণীয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত শিল্প মানসিকতাকে আশ্রয় করেই মানুষ থেকে মানুষে সিনেমার ভাষা কেমন আশ্চর্যভাবে পাল্টে যাচ্ছে। ধুলোর কুণ্ডলীতে ঢাকা পড়ে যাওয়া জমিদারের প্রিয় হাতী সত্যজিতের কাছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতীকে ব্যঞ্জিত। এক অনুপম দক্ষতায় তিনি এই মুহূর্তটি গড়ে তোলেন। এ ছবির সর্বত্রই, সত্যজিতের ক্যামেরা যেন মন্থর, শ্লথ গতিতে অচঞ্চল, ব্যক্তি জীবনের ট্র্যাজেডিকে রূপদান করেছে। বস্তুতঃ জলসাঘরের সর্বত্রই এই ধীর প্রশমিত ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ যেন ঐ বিশেষ সমাজের স্থানু চরিত্রটাকে ধরে ফেলেছে। অন্যত্র কুয়াশাকাটা ভোরের মাঠে দুরন্ত গতিতে ক্যামেরা চালিয়ে কুরোসাওয়া যখন সামুরাই যোদ্ধাদের প্রচণ্ড গতির অস্ত্রচালনাকে দৃশ্যায়িত করেন তখন সেটিও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের অংগ হিসেবেই স্বীকৃত হয়, এটিও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ভাষা। চলচ্চিত্রের ভাষা যেহেতু প্রাথমিক শর্তে ক্যামেরা নির্ভর তাই ক্যামেরা উপস্থাপন, কোন্ নির্বাচন ক্যামেরার গতি এবং থেমে থাকা—এসবই সিনেমার ভাষার নিরিখে ভাবতে হবে। আসলে প্রধান এবং অন্যতম উপাদান হলেও সিনেমার ভাষার বিবেচনায় ক্যামেরা

ছাড়াও আরো কতকগুলো উপকরণ ও ব্যাপার আছে যেগুলো ভাষার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এসে পড়েই। বিগত যুগের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার পুদভ্‌কিন্‌ চলচ্চিত্রের ভাষা ও কৌশলরূপে সম্পাদনার ওপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর কাছে সম্পাদকের টেবিলই ছিল সিনেমার ভাষা তৈরীর প্রকৃষ্ট অস্ত্র। তিনি মনে করতেন একটি ছবির সবকিছু কলা কৌশল সর্বপ্রকার ভাষাভঙ্গি সম্পাদকের কাঁচির ওপর নির্ভরশীল একটা দৃশ্যের পরিণতি কোথা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, একটি দৃশ্যপর্যায়ের ধারাবাহিক ক্রম কোথায় গিয়ে শেষ হ'ল, অসংখ্য দৃশ্যের পারম্পর্যে গড়ে ওঠা একটা দীর্ঘ ঘটনা কিভাবে একটা সামগ্রিক শিল্পরূপ নির্মাণ করেছে, তার প্রতিই দর্শকদের বিশ্বস্ত করায় পুদভ্‌কিন্‌ সিনেমার ভাষাকে স্থান দিয়েছিলেন।

ষাটের দশকে এসে সিনেমার ভাষা আশ্চর্য ভাবে নোতুন রূপ নিল। এই পর্বের শিল্পীরা, রেনে গদার ক্রফো এঁরা পুরোনো রীতিটাকে ভেঙে সিনেমার ভাষার সীমাহীন সম্ভাব্যতার সন্ধান দিলেন। রেনের ছবিতে বিগত যুগের মন্তাজ, ক্লোজ-আপ, পুদভ্‌কিন কথিত সম্পাদনার চেয়ে সময়ের ফিজিক্যাল, ও সাবজেকটিভ ব্যবহার নোতুন সংজ্ঞায় চিহ্নিত হ'ল। জাগতিক সময়ের চলমানতাকে রেনে নিজস্ব বুদ্ধি ও বিশ্লেষণে সিনেমার ভাষার অঙ্গীভূত করে নিলেন। তাঁর ধারণায় এ বিশ্বের সব শিল্পই সময়ের ভাঙ্‌চুরের ওপর ভর করে আছে। শুরু হ'ল সিনেমা-ভাষার নোতুন অনুসন্ধান। 'হিরোশিমা মন আমুর', 'দি ওয়ার ইজ ওভার' জ্যাতেম জ্যতেম', 'লাস্ট ইয়ার এ্যাট মারিয়ানবাদ'—এই সব ছবিতেই রেনে সময়কে ত্রিকালের ব্যাপ্তিতে গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর ছবির ঘটনা গ্রন্থনে ও ক্যামেরার চলমানতায় একটা অদ্ভুত রহস্য জড়িয়ে আছে। আমরা আমাদের চর্মচক্ষে বাস্তবে যে ঘটনার সাক্ষী হই সেটাই একমাত্র কথা নয়, সেটাকে অতিক্রম করে একটা নিহিত সত্য এই ভূমিতে বিরাজ করছে, এই রকম একটা ভাবকে রেনে তাঁর ছবির প্রতিপাদ্য বলে গ্রহণ করেছেন। তাই তথাকথিত শিল্পভাষা তাঁর কাছে ততোটা প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। আইজেনষ্টাইন বা পুদভ্‌কিন সিনেমার মন্তাজ সিকোয়েন্স বা কাটিং-এর ক্ষেত্রে যে Logical coherence-এর ইঙ্গিত করেছিলেন রেনের শিল্প ভাষায় তার কোনো বিশেষ স্বীকৃতি নেই। দৃশ্য থেকে দৃশান্তরে যাওয়ার ব্যাপারে ঘটনা থেকে বিভিন্ন ঘটনায় উপনীত হওয়ায় বা একটি চরিত্রের সংলাপ থেকে হঠাৎ একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাওয়ার ব্যাপারে রেনে সিনেমার ভাষায় নোতুন

গতি দান করলেন।

সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের ভাষার আলোচনায় pictorial beauty-কে পরিহার করার কথা বলেছিলেন অবশ্য যদিও তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালীর' কোনো কোনো জায়গায় চিত্রধর্মীতা অলক্ষিত নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের চূড়ান্ত সফলতায় তাঁর পরের দিকের সবকটি ছবিতেই চলচ্চিত্রের প্রকৃত রীতিটা রক্ষিত হয়েছে। রীতির দিক থেকে অনেকে আন্তনিওনির সঙ্গে সত্যজিতের একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু উভয়ের চলচ্চিত্র ভাষায় ভিন্নতা রয়ে গেছে। এটাই খুব স্বাভাবিক। আসলে চলচ্চিত্রে মুহূর্ত সৃষ্টি করার ব্যাপারে এই দুই শিল্পী অনেকটা একই পন্থায় কাজ করেন। অর্থাৎ সময়ের ব্যবহারটা এঁদের দুজনের ছবিতেই অনেকটা সমধর্মী। কিন্তু এটা হ'ল স্টাইলের দিক; সিনেমার ভাষা এঁদের দুজনের হাতে দুরকম। আর সিনেমার ভাষার আলোচনায় একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখা ভীষণ দরকার যে কেবল ক্যামেরার কৌণিক উপস্থাপনা, সচলতা বা অচলতাই ভাষার ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যাপার নয়, অন্যতম প্রধান উপাদান মাত্র। সুতরাং ক্যামেরা ছাড়াও শব্দ ও নৈঃশব্দ, শ্রুতি ও সংগীত, সংলাপ ও সংলাপহীনতা এই সব মিলেমিশে সিনেমার ভাষার দেহ নির্মাণ করেছে। শব্দ ও নৈঃশব্দ যে সিনেমার ভাষার উৎকর্ষে কতো নিপুণ ভাবে কাজে লাগানো যায় তার অন্যতম নিদর্শন আন্তনিওনির 'লাভেন্তুরা' ও 'ব্লো-আপ' ছবি। 'লাভেন্তুরা'র নায়িকা হঠাৎ একটি দ্বীপ থেকে হারিয়ে যাওয়ার পরবর্তী খণ্ড মুহূর্তগুলিকে পরিচালক অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে গড়েছেন। এখানে তিনি নির্জন দ্বীপে কতকগুলি মানুষের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজনের দীর্ঘ অনুপস্থিতিকে শব্দ ও শব্দহীনতার তারতম্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কথিত আছে যে আন্তনিওনি ছবির এই বিশেষ পর্যায়ের শ্রুতিকল্প ও ধ্বনিকল্প (Sound effect and Sound Montage) সৃষ্টির জন্য ছ'খানি টেপ রেকর্ডারের সাহায্য নিয়েছিলেন। শব্দ ও নৈঃশব্দ, ক্যামেরার গৃহীত দৃশ্য ও সিনেমার প্রয়োগ কৌশলে বার্গম্যানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ' ছবির একটি বিশিষ্ট দৃশ্যক্রম সিনেমার ভাষার অনবদ্য উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। দৃশ্যটির বিবরণ মোটামুটি এই: ছবির মূল চরিত্র আইজ্যাকবর্গ গাড়ীতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। মূল সিকোয়েন্সটা যখন পর্দায় দেখানো সুরু হচ্ছে তখন নেপথ্যে (off voice) বর্গের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে: "I fell asleep---I was pursued by dreams and images which seemed extremely real and were very humiliating

to me" এইখানে জনৈক তরুণ পথযাত্রীর গীটারের শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মেঘ ডাকার শব্দ হচ্ছে। এখানে লেকের একটা long shot আছে এবং তারপর বৃষ্টির ছাটে অস্পষ্ট গাড়ীর কাঁচের মধ্য দিয়ে অদূরের রাস্তাটাকে গাড়ীর ওয়াইপারের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, এবং সামনে বর্গ ও মারিয়ানাকে দেখতে পাওয়া যায়। এই সময় হঠাৎ একটা close-up-এ বর্গের মাথাটা ফ্রেমের মধ্যে দেখা যায়। এ দৃশ্যটা একদল দাঁড়কাকের চিৎকার করে উড়ে যাওয়ার অনুসরণে গৃহীত হয়েছে। আর এই মুহূর্ত থেকেই বর্গের স্বপ্নের শুরু। এই দৃশ্যটিই আবার আর একটি দৃশ্যের সহযোগে গড়ে উঠেছে যেখানে close-up-এর মাধ্যমে স্ট্রবেরীফল ভর্তি একটা ঝুড়ি দেখা গেছে এবং ক্যামেরা পিছনে সরে এসে বর্তমান বয়সের বর্গকে দেখিয়েছে, আর তার সঙ্গে রয়েছে তার পূর্বতন বান্ধবী সারা, সে যেন বর্গের স্মৃতির মতোই তরুণ। এখানে বর্গ ও সারার মধ্যে যে কথা বার্তা হয়েছে তা চিত্রনাট্যের লিখিত সংলাপের অনুসরনেই গড়ে উঠেছে। এবং তা গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ ও ক্যামেরার কাটিং-এ গৃহীত। আমরা দেখি সারার কাঁধে বর্গের হাত এবং বর্গের কাঁধে সারার হাত—এইভাবে তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে খুব সহজে এবং এক্ষেত্রে তাদের এই সম্পর্ককে স্বপ্নের কোনো কৌশলের ব্যত্যয়ের (distortion) মাধ্যমে দেখানো হয়নি, পরন্তু দেখানো হয়েছে বিভিন্ন সময়ের নৈকট্যে তাদের স্তরভেদের মধ্যে দিয়ে। এবং স্বপ্নের সারা চরিত্র ও বর্তমানের সারা চরিত্রের সঙ্গে কোনো ভাবে যুক্ত নয়, যে সারাকে বর্গ তার গাড়ীতে লিফ্‌ট দিয়েছে। এই জাতীয় কিছু সিনেমা ভাষা আছে যার অতুলনীয় মন্ময়তা কেবল বর্ণনা করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সত্যজিৎবাবু গদারের সিনেমা ভাষা প্রসঙ্গে ঠিক অনুরূপ কথা বলেছিলেন, তাঁরমতে: 'Indeed, it would be right to say that Godard has devised a totally new genre for the cinema. This genre cannot be defined, it can only be described. ১৯৭১-এর ৮ই অক্টোবর 'ফিল্মফেয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত মহামূল্যবান রচনার অন্য আর একটি জায়গায় শ্রীরায় খুব সুন্দর ভাবে উক্তি করেছেন যে সিনেমার ভাষার ক্রমোন্নতি গ্রিফিথ থেকে গদারে এসে এক অসাধারণ নবত্ব লাভ করেছে, এবং এই অভিনব ক্রমবিকাশে সময় লেগেছে মোট ষাট বছর যেখানে ইংরেজী সাহিত্যের ভাষা প্রকল্পনা চসার থেকে জেমস্ জয়েস পর্যন্ত আসতে সময় নিয়েছে দীর্ঘ ছ'শো বছর। সিনেমা ভাষায় এই অভাবনীয় দ্রুত

উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের দান অনেকটাই কাজ করেছে। বিশ থেকে চল্লিশ দশক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত পুদভ্কিন্ ও আইজেনস্টাইনের সিনেমাভাষা, ১৯৪০-এ নির্মিত ওরসন ওয়েলসের 'সিটিজেন কেনের' চলচ্চিত্র ভাষা, ষাটের দশকে গদারের অত্যাশ্চর্য cinema language ও গ্রিফিথের বিশিষ্ট আবিষ্কার close-up এর বিচিত্র সমাহারে সিনেমার রূপও রীতি এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বারে এসে উপনীত হয়েছে। একালের সিনেমার ফর্মকে ভাঙার যে চূড়ান্ত নৈপুণ্য আমরা গদারের ছবিতে লক্ষ্য করি তার মূলে আছে চলচ্চিত্রকারদের নিয়ত পরীক্ষমান গভীর অনুসন্ধান। একালের ছবিতে টেলিভিশন-সাক্ষাৎকার, কোটেশন, ক্রিজের যথেচ্ছ ব্যবহার, অপটিক্যাল কৌশল, সংবাদ-বিচিত্রা, একই ছবিতে অন্য ছবির দৃশ্যাংশকে জুড়ে দেওয়া, সাদাকালোয় নির্মিত ছবিতে হঠাৎ অদ্ভুত এক রঙের ব্যবহার, ইত্যাদি সব নানা ব্যাপার মিলেমিশে সিনেমার ভাষা এমন এক জটিল প্রক্রিয়ায় পৌঁছে গেছে যে, খুব সহজে ছবি থেকে চলচ্চিত্রের নির্দিষ্ট ভাষা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসার উপায় নেই। জানা গেছে গদার নাকি তাঁর এক বিশিষ্ট ছবিতে বেশ কিছু সময় ধরে ছবির নায়ক নায়িকাকে মাটিতে শায়িত অবস্থায় শৃংখলিতভাবে দেখিয়েছেন। তারা দুজনের হাত ধরে আছে। আর এই সিকোয়েন্সটিতে নাকি ক্যামেরা এক মুহূর্তের জন্যও নড়েনি। অর্থাৎ অনড়, অটল এক বিশেষ ভূমি সংস্থানে উপস্থাপিত ক্যামেরার এই দৃশ্যগ্রহণ যে কি মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে সেটি খুব ভাবার বিষয়। আসলে গদার এমনই এক শিল্পী যিনি তাঁর প্রতিটি ছবিতেই চলচ্চিত্রের ভাষা সম্পর্কে নোতুন উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। একালে উপনীত হয়ে তাঁর এখন মনে হচ্ছে যে বিগত যুগের সিনেমার ফর্মটাকে ভেঙে ফেলার দরকার। তাছাড়া পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত কাস্তিতত্ত্বও তাঁর মনঃপূত হচ্ছে না, তাই তিনি প্রতি ছবিতেই নোতুন ব্যাকরণের সন্ধান করেছেন। সিনেমার ভাষার ক্ষেত্রে গদারের এই সক্রিয় অনুসন্ধানের মূলাটা কত গভীর বা অগভীর, তাৎপর্যময় বা অর্থহীন তার প্রমাণ কিন্তু এখনই মিলবে না। তার জন্যে সিনেমা শিল্পকে আরো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

"Careful selection of lenses of varying focal length lends added drama and artistry to creative cinematography." চলচ্চিত্র আঙ্গিক বিষয়ক কোনো বিদেশী পত্রিকায় মুদ্রিত এই বিজ্ঞাপনের প্রতি মনোনিবেশ করলে বোঝা যাবে যে সিনেমার ভাষার ক্ষেত্রে কেবল স্রষ্টার উপলব্ধি নয়, বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য নয়, যান্ত্রিক প্রয়োগ কুশলতারও একটা

বহু রকমের ভূমিকা আছে। ছবি করার সময় সেগুলো উত্তমভাবে জেনে ও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করে মননের মাধ্যমে প্রয়োগ করলে তবে একটা ছবির উৎকর্ষ বেড়ে ওঠে। রবার্ট ওয়াইজ ও জারোমে রোবিনস্ পরিচালিত 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরী' ছবিতে ডানিয়েন ক্যাপ আশ্চর্য সৃষ্টিশীলতায় ওয়াইড এ্যাঙ্গেল লেন্সের ব্যবহার করেছিলেন যা ছবির পারিপার্শ্বিকতাকে অতিরঞ্জিত করতে সাহায্য করেছিল এবং ক্যাপ কোনো কোনো স্থানে সেমি টেলিফটো লেন্সও কাজে লাগিয়েছিলেন যা ছবির কাহিনীর অন্তঃপ্রবাহিত মনস্তাত্ত্বিক থীমটাকে সুষ্ঠভাবে ব্যক্ত করে। বলাবাহুল্য যে এই প্রয়োগিক ব্যাপারটা অবশ্যই পরিচালকদ্বয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তত্ত্ব আলোচনার দৃষ্টি দিয়ে যদি বলি সিনেমার ভাষা হল সেই, যেখানে director's subjective interpretation of the objective views ই প্রধান, তাহলে এখানে ভাষা সম্বন্ধে আরো একটু ভাবার অবসর আছে। জন শ্লেসিংগার পরিচালিত 'মিড নাইট কাউবয়' ছবির শেষ দৃশ্যে যখন সহনায়কের মৃতদেহটা বাসের সীটে এলিয়ে আছে, বাসটি মিয়ামির রাস্তায় ঢুকে পড়েছে, মিয়ামির সমস্ত সৌন্দর্য বিপুল কারুণ্যে পর্দা জুড়ে ছড়িয়ে গেছে; মিয়ামিতে আসার দীর্ঘদিনের অভিলাষ সহনায়কের পূর্ণ হয় নি। অবশেষে মিয়ামিতে পৌছবার মিনিট কয়েক আগেই তার অন্তিম মুহূর্ত তার জীবন থেকে তার প্রার্থনাকে কেড়ে নিয়েছে। বাসের সহযাত্রীদের অদ্ভুত কৌতূহলের মধ্য দিয়ে সুপার-ইম্পোজে মিয়ামির সৌন্দর্য আকুলতা বসতবাড়ী, বৃক্ষসকল সিনেমার সহজাত প্রতীক রচনা করেছে। সিনেমার এই ভাষায় কোনো বিশেষ প্রয়োগিক জটিলতা নেই অথচ কত সহজ ও স্বচ্ছন্দ আঙ্গিকে এ দৃশ্য অনবদ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

আসলে কাল থেকে কালে শিল্পের ভাষা মানুষের হাতে হাতে কেবলি রূপান্তরিত হচ্ছে। গতকালের শিল্পনিরিখ যেমন আজকে এসে একনিমেষে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে একালের ভাষায় পুরানো দিনের নির্মিতি আবার নোতুন সংজ্ঞায় চিহ্নিত হচ্ছে। আইজেনস্টাইনের 'ওডেসা' দৃশ্য পর্যায়ের ভাষাগত ব্যঞ্জনা সিনেমার ইতিহাসে 'মীথ' হয়ে গেছে। একালের স্রষ্টা প্রয়োজনমতো তাকে স্মরণ করতে পারেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের নিত্য প্রতিযোগিতা ও স্রষ্টার নিত্য উদ্ভাবনী সৃজনশীলতার পারস্পরিক অন্বয়ে সিনেমার ভাষা একালের দর্শককে কোথায় নিয়ে যাবে চলচ্চিত্রবিদদের অসীম কৌতূহলই তার প্রধান উপজীব্য।

চলচ্চিত্র ও সমধর্মী শিল্প উপলব্ধির জন্য অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থসূচী

1. Adams P. Sitmay—Visionary Film.
2. Alexander Nicholas Vardac—Stage to Screen.
3. Andre Bazin—What is Cinema.
4. Arther Knight—The Liveliest Art.
5. Bernard F. Dick—Anatomy of Film.
6. C. Dey Lewis—The Poetic Imagination.
7. Christian Metz—Film Language
8. Donald E. Staples (Ed)—The American Cinema.
9. Daniel Talbot (Ed)—Film : An Anthology.
10. David A. Cook—A History of Narrative Film.
11. David Lavender—The Penguin Book of American West.
12. Ernest Lindgreen—The Art of the Film.
13. E. H. Gombrich—Art and Illusion.
14. Erich Rhode—A History of the Cinema From its Origin to 1970.
15. E. M. Foster—Aspects of Novel.
16. Eric Bentley (Ed)—Theory of the Modern Stage.
17. Graham Green—The Pleasure Dome.
18. George Bluestone—Novels into Film.
19. Gerald Mast (Ed)—Movies in Our Midst.

20—Gerald Mast & M. Cohen (Ed)—Film Theory and Criticism.

21. Garth Jowett—Movies as Mass Communication.
22. Geoffrey wagner—The Novel and the Cinema.
23. Herbert Blau—Blooded Thought.
24. Herbert Read—The Meaning of Art.
25. Harry M. Geduld (Ed)—Film Makers on Film Making.
26. Ivor Montagu—The Film World.
27. J. Dudley Andrew—The Major Film Theories,
28. John Howard Lawson—The Theory and Technique of Play and Screan Writings.
29. John Howard Lawson—Film : The Creative Process,
30. James Manaco—How to Read a Film.
31. John Coughie (Ed)—Theories of Authorship,
32. Joris Ivens—The Camera and I.

33. John Russel Taylor—Cinema Eye, Cinema Ear.
34. John Ward—Alain Resnais or the theme of time.
35. Jenni Calder—There Must Be A Lone Ranger.
36. Jim Kitses—The Horizon West.
37. Jean Pierre Berricolli & Joseph Giboldi (Ed)—Interrelation of Literature.
38. Kelvin Brownlow—The Parades Gone by.
39. Larry May—Screening out the Past.
40. Margureite Duras—Hiroshima Mon Amour.
41. Michael chanan—The Dream that kicks.
42. Parker Tyler—The Three Faces of the Film.
43. Paul Rotha—Documentary Film.
44. Penelope Houston—The contemporary Cinema.
45. Peter wollen—Signs and Meaning in the Cinema.
46, Pauline Kael—Kiss Kiss Bang Bang.
47. Peter Graham—The New Wave.
48. Peire Lephron—The Italian Cinema.
49. Philip French—Westerns.
50. Rudolf Arnheim—The Art of the Film.
51. Ramond Durgnat—Durgnat on Film.
52. Ralf Stephenson and J. R. Debrix—The Cinema as Art.
53. Robert C. Toll—The Entertainment Machine.
54. Roy Armes—Film and Reality.
55. Robert Richardson—Literature and Film.
56. Roger Marvell—Film.
57. Sergei Eisenstein—Film Form/Film Sense.
58. Siegfried Kracauer—Theory of Film.
59. Stanley Kauffmann—A World on Film.
60. Satyajit Roy—Our Films their Films.
61. Susan Sonta —Against Interpretation and other Essays.
62. T. J. Ross—Film and the Liberal Arts.
63. V. F. Perkins—Film as Film.
64. V. I. Pudovkin—Film Technique and Film Acting.
65. William T. Pilkinton & Don Graham—Western Movies.
66. Wolf Rilla—The writer and the Screen